পৃথিবীর ইতিহাস



দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। রমাকৃষ্ণ মৈত্র



বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা বারো



প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য চিত্র
খালেদ চৌধুরী

মানচিত্র
অর্ধেন্দু দত্ত

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দাম আট টাকা

প্রশান্ত সান্যাল

ও

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

মুখবন্ধ

কিছুদিন ধরে বাংলা সাহিত্যে একটি শুভ-লক্ষণ দেখা দিয়েছে—বাংলা সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিচিত্র ভূমিতে পদচারণায় অভ্যস্ত হচ্ছে। তথ্য আহরণ, বিচার, বিশ্লেষণ, যুক্তিশৃঙ্খলায় তত্ত্ব ও সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বাড়ছে; পাঠকের মন ও কল্পনায়, ভাব ও ভাবনায় বুদ্ধিনিষ্ঠার প্রভাব সংক্রামিত হচ্ছে। এর খুব প্রয়োজনও ছিল। উনিশ শতকের বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যসমৃদ্ধির মূলে ছিল এই তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তি-ও-বুদ্ধিনিষ্ঠা; বাংলা ভাষাও তার ফলে অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আজ সে-কথা আবার আমাদের মনে পড়ছে, এবং বাংলা ভাষায় পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুবিপুল ঐশ্বর্য পরিবেশনের প্রয়াস বিস্তারিত ভাবে চলছে, এ-কথা ভাবতেও ভাল লাগে। বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ, ইতিহাস পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হয়ে এ-প্রয়াসের পথ সুগম করেছেন যার ফলে এখন সাধারণ ব্যবসায়ী প্রকাশকেরাও এ-ধরনের বই প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছেন, মননশীল লেখকরা এগিয়ে আসছেন তাঁদের যত্নলব্ধ জ্ঞান সাধারণের হাতে তুলে দিতে। আর, পাঠকেরাও যে সাগ্রহে এ-প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে তথ্যসমৃদ্ধ মননশীল গ্রন্থের চাহিদা থেকে।

দর্শন ও মনস্তত্ত্বের একান্ত বুদ্ধিনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন দেবীপ্রসাদ; ক্রমশ তিনি অনুরাগী হলেন ইতিহাস ও সমাজ-তত্ত্বে, নৃতত্ত্বে ও প্রাণিবিজ্ঞানে। তাঁর অনুশীলনের বিস্তার প্রায় সর্বব্যাপী। বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি তাঁর লব্ধজ্ঞান, অধীত বিদ্যা পরিবেশন করে যাচ্ছেন ক্রমাগত, এবং তা সুবোধ্য সরল বাংলা ভাষায়—শিশু-ও কিশোর-মন থেকে শুরু করে প্রৌঢ়

মনের সমৃদ্ধির জন্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কঠিন কথা সহজ করে বলা খুব সহজ কাজ নয়; বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান এবং ভাষা ব্যবহারের রীতি-নীতি খুব সুআয়ত্ত না থাকলে তা সম্ভব নয়। এই দুই ব্যাপারেই দেবীপ্রসাদের অধিকার বিস্তৃত ও গভীর। যে-প্রয়াসে তিনি ব্যাপৃত, তা অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর লেখা বইগুলো আমাদের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের পাঠ্য হলে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হবে, তারা যুক্তি-ও-তথ্যনিষ্ঠ হবে, এ-সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

"পৃথিবীর ইতিহাস" মানব-সভ্যতার ইতিহাস। সে-ইতিহাস এমন সমগ্রতায় অথচ এত সংক্ষেপে এবং সহজ সরলতায় বাংলা ভাষায় বলবার চেষ্টা এর আগে কখনও হয় নি। টুকরো টুকরো ভাবে হয়েছে, এবং তা উনিশ শতকে, যখন বিজ্ঞান আজকের মত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি; সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস এতটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে দেবীপ্রসাদ ও রমাকৃষ্ণ পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস দেখছেন। এ-দেখা এবং উনিশ শতকের দেখায় পার্থক্য গভীর। সে-পার্থক্য কত গভীর তা দুর্গাদাস লাহিড়ী মশায়ের "পৃথিবীর ইতিহাস" ও দেবীপ্রসাদ ও রমাকৃষ্ণর "পৃথিবীর ইতিহাস" পাশাপাশি রাখলেই ধরা পড়বে। বলবার ধরনের, ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যটাও তাহলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই দুই গ্রন্থের মাঝখানে একটি যুগ বিস্তৃত।

এই গ্রন্থ আমাদের যুগের পরিচয় বহন করছে, এবং সে-পরিচয় বুদ্ধির মুক্তির সহায়ক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৫৬। } **নীহাররঞ্জন রায়**

সূচীপত্র

সহায়ক পাঠসূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ :

J. JEANS—*The Mysterious Universe*. *Chap. I.*
L. M. LEVIN (EDITOR)—*Book of Popular Science, Vol. I.*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

M. F. GUYER—*Animal Biology. Chap. 12-16.*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

A. NOVIKOFF—*Climbing Our Family Tree.*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

G. THOMSON—*First Philosophers. Chap. I.*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

V. GORDON CHILDE—*Story of Tools.*
V. GORDON CHILDE—*Progress & Archaeology.*
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA—*Ancient India Vol. 3.*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

H. L. MORGAN—*Ancient Society.*
G. THOMSON—*Studies in Ancient Greek Society.*
R. BRIFFAULT—*The Mothers.*

সপ্তম পরিচ্ছেদ :

V. GORDON CHILDE—*Man Makes Himself.*
V. GORDON CHILDE—*What Happened in History.*
B. HROZNY—*Ancient History of Western Asia, India & Crete.*

অষ্টম পরিচ্ছেদ :

V. GORDON CHILDE—*Man Makes Himself.*
V. GORDON CHILDE—*What Happened in History.*
B. HROZNY—*Ancient History of Western Asia, India, & Crete.*
S. PIGGOT—*Prehistoric India.*

নবম পরিচ্ছেদ :

V. GORDON CHILDE—*Man Makes Himself.*
সমরেন্দ্রনাথ সেন—বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম খণ্ড)

দশম পরিচ্ছেদ :

V. GORDON CHILDE—*What Happened in History.*
H. R. HALL—*The Ancient History of The Near East.*
B. HROZNY—*Ancient History of Western Asia, India & Crete.*

একাদশ পরিচ্ছেদ :

H. R. HALL—*The Ancient History of the Near East.*
B. HROZNY—*Ancient History of Western Asia, India & Crete.*
J. H. BREASTED—*A History of Ancient Egyptians.*
DAVY & MORET—*From Tribe to Empire.*

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ :

S. PIGGOT—*Prehistoric India.*
R. E. M. WHEELER—*Harappa : 1946.*
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA—*Ancient India.*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ :

B. HROZNY—*Ancient History of Western Asia. India & Crete.*
V. GORDON CHILDE—*What Happened in History.*
O. R. GURNEY—*The Hittites.*
SETON LLOYD—*Early Anatolia.*

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ :

J. NEEDHAM—*Science & Civilisation in China, Vol. I.*
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA—"*China.*"

পৃথিবীর ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর জন্মকথা

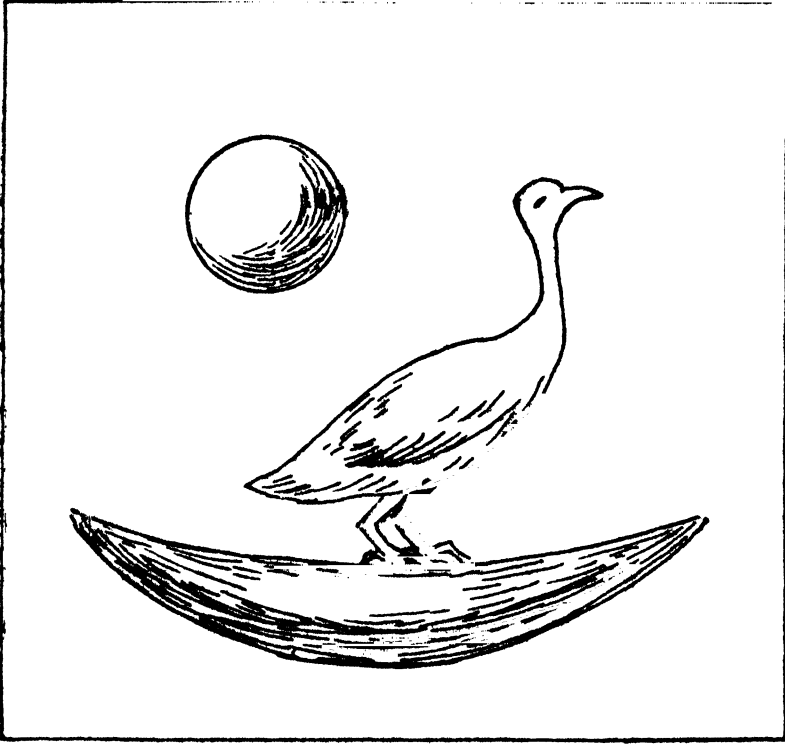
সূর্য আর পৃথিবী

রাত পোয়াতে-না-পোয়াতে স্বর্গের রাজহাঁস আকাশের গায়ে একটি সোনার ডিম পাড়ে। ডিমটি ফুটে যে-বাচ্চা বেরোয় সেই আমাদের সূর্য। এই ভাবে প্রতিদিনই সকালে একটি করে সোনার সূর্যের জন্ম, রাত্রির অন্ধকারে প্রতিদিনই তার মৃত্যু। পরদিন সকালে স্বর্গের সেই রাজহাঁস আর-একটি সোনার ডিম পাড়বে, ডিম ফুটে বেরুবে আর-একটি নতুন সূর্য···

কাদের কল্পনা? কতোদিন আগেকার কল্পনা?

হাজার কয়েক বছর আগে মিশরের পুরোহিতেরা বুঝি এই ভাবেই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের রহস্য বোঝবার চেষ্টা করেছিলো। আর তখনকার কালে তারাই নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী!

গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানুষের জ্ঞান কী অসম্ভবই না বেড়ে গিয়েছে! আজকের দিনে ইস্কুলের কচি কচি ছেলেমেয়েরাও সেকালের ওই সবচেয়ে বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের কথা শুনলে খিলখিল করে হেসে উঠবে। কেননা, ওরা জানে ভোর আকাশে আমরা ওই যে সোনার থালার মতো জিনিসটিকে উঠে আসতে দেখি ওটি আসলে হলো প্রকাণ্ড বড়ো একটি আগুনের গোলা—এতো বড়ো যে তার মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীর মতো তেরো-লক্ষ-ন-হাজারটি পৃথিবীর জায়গা হতে পারে।

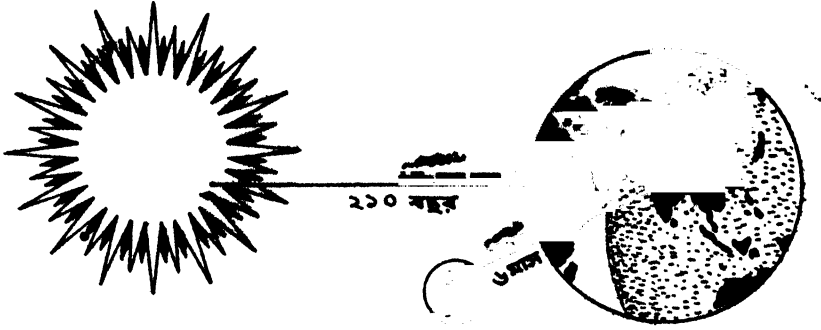


সূর্যোদয় : প্রাচীন মিশরের কল্পনা

তবুও আকাশে সূর্যকে দেখতে অতোটুকু মনে হয়, কেননা সূর্য রয়েছে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে—প্রায় ন-কোটি-তিরিশ-লক্ষ মাইল দূরে। তার মানে, ট্রেনে চেপে পৃথিবী থেকে সূর্যে যাবার যদি কোনো ব্যবস্থা করা যেতো আর সে-ট্রেন যদি দিনরাত অবিরাম ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটতে পারতো—তাহলে পৃথিবী ছেড়ে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় লাগতো প্রায় আড়াই শো বছর।

সূর্য থেকে পৃথিবীর জন্ম

কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্য যতো দূরেই থাকুক না কেন, বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, এ কথা না মেনে উপায় নেই যে কোনো

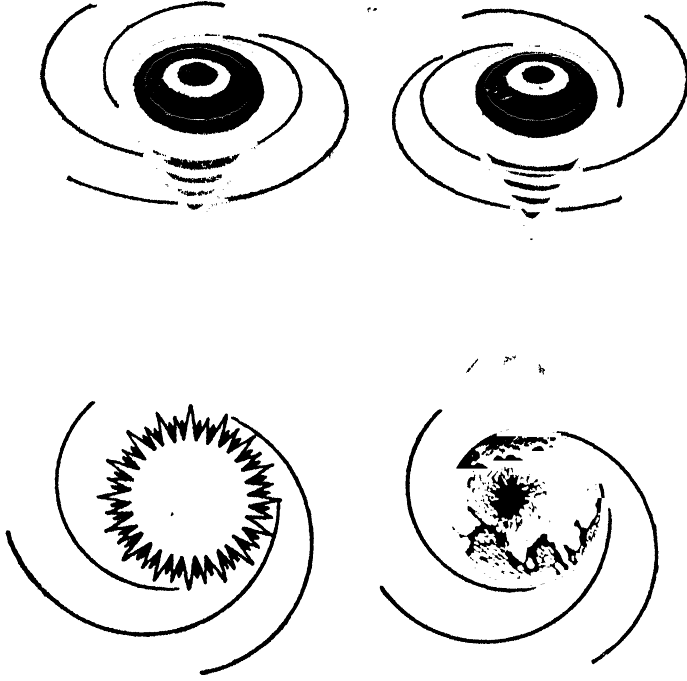


ঘণ্টায় অবিরাম ৬০ মাইল বেগে ছুটলে পৃথিবী থেকে সূর্যে যেতে
২১০ বছর আর চাঁদে যেতে প্রায় ৬ মাস সময় লাগবে

এককালে ওই সূর্য থেকেই পৃথিবীর জন্ম হয়েছিলো। সে যে কতোকাল আগেকার ঘটনা হতে পারে, তার আলোচনা একটু পরে তোলা যাবে। আগে দেখা যাক, বৈজ্ঞানিকেরা কেন এই রকমের একটা কথাই সত্যি বলে মনে করছেন।

ওঁরা বলছেন, সূর্য আর পৃথিবীর ব্যাপারে অনেক বিষয়ে মিলের দিকে নজর রাখা দরকার।

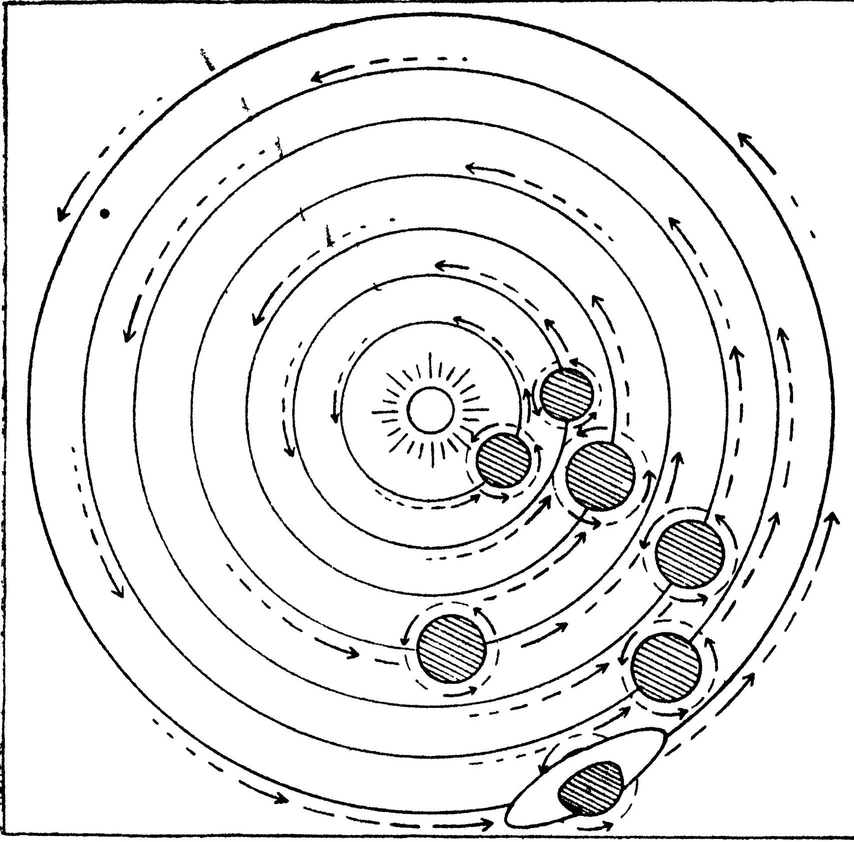
প্রথমত, সূর্যও লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে, পৃথিবীও লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। লাট্টু যখন ঘোরে তখন তার আলটা নিচের দিকে থাকে, মণিটা বরাবরই মাথার দিকে—ঘোরে শুধু তার গায়ের দিকগুলো বা পাশের দিকগুলো। কিন্তু এই ঘোরবার দিক দু রকমের হতে পারে—এখানে উলটো-মুখ-বরাবর ঘুরন্ত দুটো লাট্টুর ছবি এঁকে দেওয়া গেলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সূর্য আর পৃথিবী যে-ঘুরপাক খাচ্ছে তাও কি এই রকম উলটো-দিক-বরাবর নাকি? তা নয়। পৃথিবী ঘুরপাক খাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুব-বরাবর ভাবে, আর সূর্যও ঠিক তাই।



উপরে উলটো-মুখ-বরাবর ঘুরন্ত দুটো লাট্টু; কিন্তু নিচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে সূর্য আর পৃথিবী দুইই ঘুরছে একদিক-বরাবর

দ্বিতীয়ত, পৃথিবী শুধুই লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে না, সূর্যকে প্রায় ন-কোটি-তিরিশ-লক্ষ মাইল দূরে রেখে প্রদক্ষিণও করছে। আর, এইভাবে প্রদক্ষিণ করবার সময়েও, পৃথিবী ছুটে চলেছে পশ্চিম থেকে পুব-মুখ-বরাবরই—অর্থাৎ কিনা, যে মুখে সূর্য আর পৃথিবী দুজনেই লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে সেই-মুখ-বরাবরই।

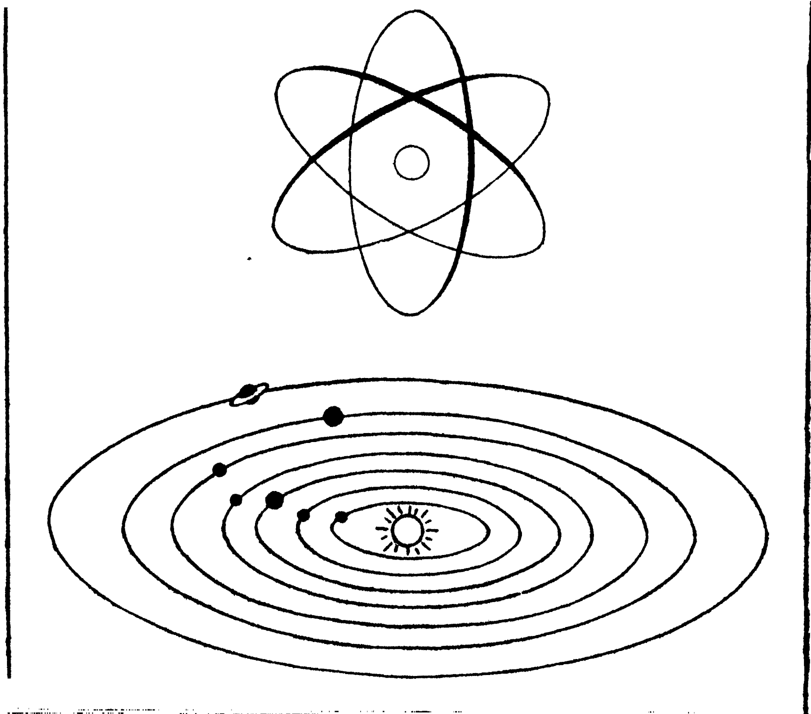
তৃতীয়ত, পৃথিবী একা নয়। পৃথিবী ছাড়াও সূর্যের আরো আটটি গ্রহ আছে, পৃথিবীর তুলনায় তাদের কোনোটি বেশি বড়ো কোনোটি বেশি ছোটো, কোনোটি সূর্যের বেশি কাছে, কোনোটি সূর্য থেকে বেশি দূরে। এই গ্রহগুলির কোনোটিও স্থির নয় এবং এগুলির



সূর্য আর গ্রহদের গতিপথ এবং ঘোরবার দিকেব
মধ্যে কী আশ্চর্য মিল

গতির মধ্যে খুব আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটিই লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে আর প্রত্যেকটিরই লাট্টু-ঘোরার দিকটা সূর্যের মতো বা পৃথিবীর মতো,—অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পুব-বরাবর। তাছাড়া, প্রত্যেকটিই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, এবং শুধুই যে প্রত্যেকটির ওই প্রদক্ষিণ-পথের চেহারায় মিল আছে তাই নয়, প্রত্যেকটিই সূর্যের চারপাশে ঘুরে চলেছে পশ্চিম থেকে পুব মুখে।

আরো লক্ষ্য করবার বিষয় হলো, বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, প্রতিটি গ্রহই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে একই তল বা 'প্লেন'-এ। তার মানে কী? যদি কল্পনা করা যায়, একটা প্রকাণ্ড চাদর আকাশের উপরে টান করে ধরা হয়েছে আর সে-চাদরের মাঝখানে সূর্যকে রেখে পৃথিবী তারই উপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে ঘুরছে, 'তাহলে দেখা যাবে বাকি আটটি গ্রহের কেউই চাদরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে না, অর্থাৎ কিনা তারাও সকলেই পৃথিবীর মতো চাদরটার উপর দিয়ে গড়াতে-গড়াতেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। একই তল বা 'প্লেন-এ ঘোরা আর আলাদা



এই দুটির মধ্যে উপরের ছবিতে বিভিন্ন 'তল' বা প্লেন-এ ঘোরার নমুনা; নিচের ছবিতে একই তলে ঘোরার নমুনা

আলাদা 'তল'-এ ঘোরা বলতে কী বোঝায় তার দু রকম ছবি এঁকে দেওয়া হলো।

চতুর্থত, সৌরজগতে মোটের উপর তিরিশটি চাঁদ বা উপগ্রহের খবর পাওয়া গিয়েছে, তারা প্রদক্ষিণ করছে যে যার গ্রহকে। এবং এদের বেশির ভাগের বেলাতেও (যদিও সকলের বেলাতেই নয়) প্রদক্ষিণ-পথের দিকটা পশ্চিম থেকে পুব-বরাবর—অর্থাৎ কিনা যে-মুখে সূর্যও লাট্টুর মতো ঘুরছে, গ্রহরাও লাট্টুর মতো ঘুরছে আর যে-মুখে সমস্ত গ্রহই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে।

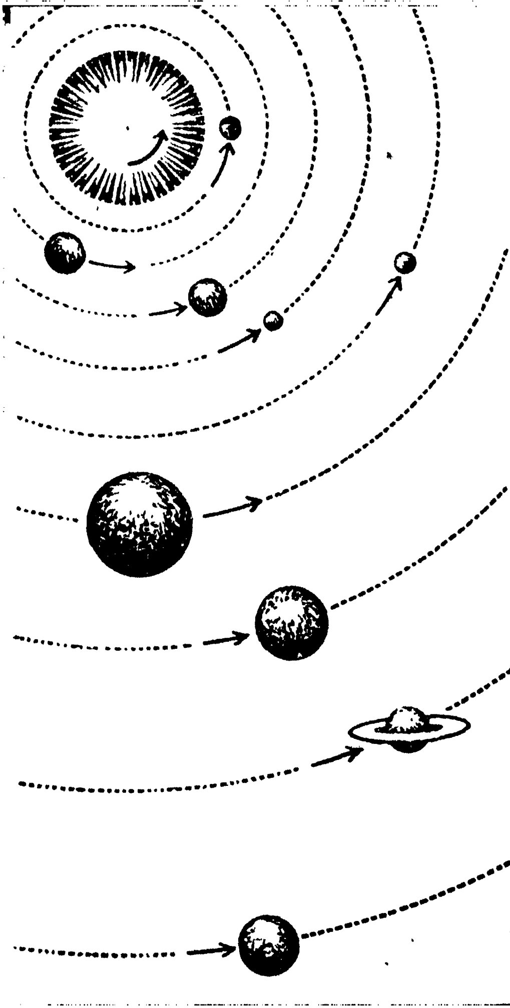
তাছাড়া, এ কথা তো রয়েছেই যে গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্যের যে-পরিবার, তার মধ্যে কখনই ছাড়াছাড়ি হয় না। অন্যান্য নক্ষত্রদের মতোই সূর্যও প্রচণ্ড বেগে আকাশের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে, কিন্তু ছুটে চলেছে স-পরিবারে অর্থাৎ নিজের গ্রহ-উপগ্রহের ঝাঁকটিকে নিয়ে।

সৌর-জগতের মধ্যে এতো যে মিল, এর তো একটা ব্যাখ্যা থাকা চাই। যদি কল্পনা করা হয়, সূর্য আর গ্রহ-উপগ্রহরা আকাশের আলাদা-আলাদা জায়গায় আলাদা-আলাদা ভাবে জন্মেছিলো—তাহলে সে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্রথমত, তারা আলাদা জায়গায় আলাদা ভাবে জন্মালে এ-রকম একটা ঝাঁক বাঁধলো কেমন করে? দ্বিতীয়ত, যদিই বা কোনোমতে ঝাঁক বেঁধে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে এতো আশ্চর্য মিল কী করে সম্ভব হলো? বৈজ্ঞানিকেরা তাই বলছেন, এ-কথা মানতেই হবে যে সূর্য থেকেই এককালে গ্রহ-উপগ্রহগুলির জন্ম হয়েছিলো, কিংবা অন্তত, এই গ্রহ-উপগ্রহগুলির জন্মকথার সঙ্গে সূর্যের জন্মকথার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য।

পৃথিবী কী করে জন্মালো?

তাহলে পৃথিবীর জন্মকথাটা আলাদা ভাবে ভাবা চলবে না। সেইসঙ্গেই অন্যান্য গ্রহের জন্মকথাও ভেবে দেখতে হবে। বৈজ্ঞানিকরা সেই ভাবেই ভাববার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু এ-নিয়ে এখনো সব বৈজ্ঞানিকই একমত হতে পারেন নি। এখানে কয়েকজনের মত উল্লেখ করবো।

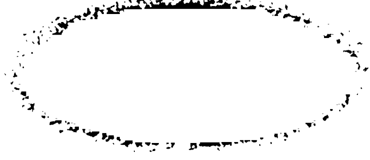


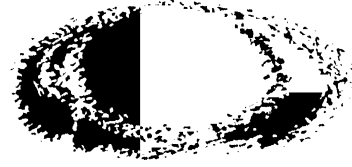
ইম্যানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) ছিলেন জার্মানির একজন মস্ত-বড়ো দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকও। ১৭৫৫ সালে তিনি সৌরজগতের জন্ম সম্বন্ধে একটি মত প্রকাশ করেন। সে-মত অনুসারে, এক আদিম নীহারিকা থেকেই সৌরজগতের জন্ম হয়েছিলো—সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা-পিণ্ড, গ্রহাণুপুঞ্জ, সব-কিছুরই। কাণ্টের এই মতটি নিয়ে তখনকার কালের পণ্ডিতেরা খুব বেশি উৎসাহ দেখান নি। কিন্তু কিছুদিন পরে প্রায় একই রকম একটা মত প্রকাশ করলেন আর-

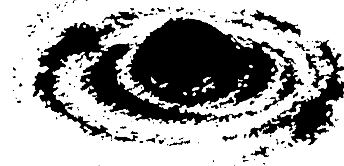
একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম লাপ্‌লাস্ (১৭৪৯-১৮৪৭)। আর লাপ্‌লাসের মত প্রকাশিত হবার পর বৈজ্ঞানিক মহলে খুবই সাড়া পড়ে গেলো। সবাই মনে করলেন, এই মতটাই ঠিক। এমনকি ইস্কুলের ছেলেমেয়ে-দেরও এই মতটাই পড়াতে শুরু করা হলো।

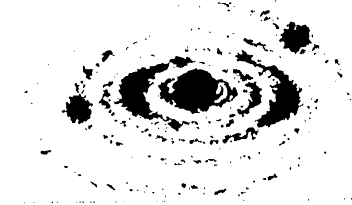
লাপ্‌লাসের মতটা কী রকম?

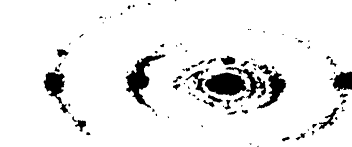
তাঁর মতেও, এক আদিম নীহারিকা থেকেই এই সৌর-জগৎ সৃষ্টি হয়েছিলো। সে-নীহারিকা এলো কোথা থেকে? লাপ্‌লাস্ মনে করলেন, কোনো এক আদিম কালে আকাশের বুকে কোনো এক নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হয়েছিলো—অর্থাৎ কিনা, নক্ষত্রটি ফেটে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। জ্যোতির্বিদেরা দূরবীন দিয়ে আকাশে এ-রকম নক্ষত্র

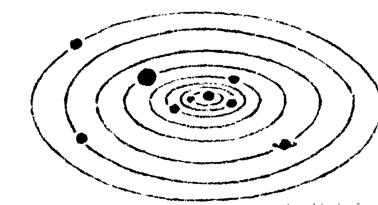












পরপর ছবি দিয়ে লাপ্‌লাসের মতটা আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে→ →

বিস্ফোরণ হামেশাই দেখে থাকেন। লাপ্‌লাস্ মনে করলেন, সেই আদিম কালে নক্ষত্রটি ফেটে গিয়ে কোটি-কোটি মাইল দীর্ঘ এক জ্বলন্ত গ্যাসপুঞ্জে পরিণত হয়েছিলো আর সেই জ্বলন্ত গ্যাসপুঞ্জ থেকেই জন্ম হয়েছে আমাদের সৌরজগতের। কী করে? তাঁর মতে, ওই গ্যাসপুঞ্জ আকাশে ঘুরতে-ঘুরতে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো আর সংকুচিত হতে লাগলো তার আয়তন। আঁক কষলে বুঝতে পারা যায়, এইভাবে আয়তন ছোটো হবার দরুন তার ঘূর্ণিবেগও দ্রুত থেকে দ্রুততর হবার কথা। আর ঘূর্ণিবেগ দ্রুত হবার দরুনই তার থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যেতে লাগলো জ্বলন্ত গ্যাসের কয়েকটা চাকতি। লাপ্‌লাসের মতে, ওই চাকতিগুলো ঘুরপাক খেতে-খেতে ঘুরপাক খেতে-খেতে ক্রমশ এক-একটা গ্যাসের গোলায় পরিণত হতে লাগলো আর গ্যাসের গোলাগুলো ঘুরতে ঘুরতে ঠাণ্ডা আর জমাট হয়ে শেষ পর্যন্ত পরিণত হতে লাগলো গ্রহতে। উপগ্রহগুলি জন্মালো কী করে? লাপ্‌লাস্ মনে করলেন, নীহারিকা থেকে ঠিকরে-আসা গ্যাসের চাকতিগুলি থেকে ছিটকে বেরিয়েছিলো আরো ছোটো-ছোটো কিছু-কিছু চাকতি আর সেগুলি থেকেই শেষ পর্যন্ত উপগ্রহগুলির জন্ম।

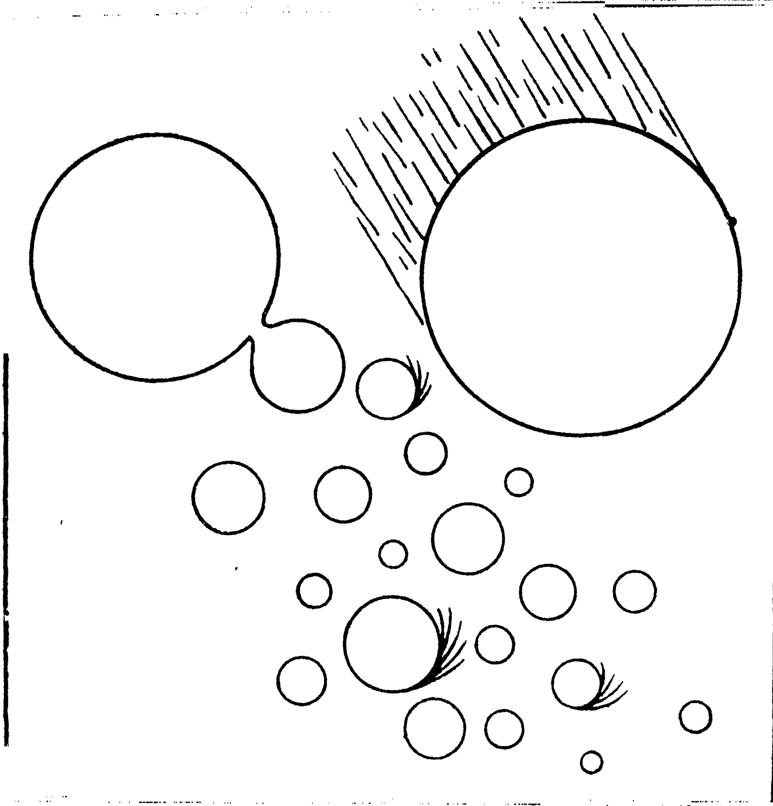
লাপ্‌লাসের এই মতটাই ঠিক নাকি?

আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, এর বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠে। প্রথমত, অঙ্ক কষলে বোঝা যায় কোটি-কোটি মাইল মাপের একটা গ্যাসের পুঞ্জ যদি আকাশে বনবন করে ঘুরতে থাকে তাহলে তা থেকে গ্যাসের চাকতি ঠিকরে বেরুবার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, যদিই বা মানা যায়, কোনো এক অদ্ভুত আর অজ্ঞাত কারণের দরুন কোনো এককালে ওই রকম গ্যাসের চাকতি সত্যিই ঠিকরে বেরিয়েছিলো, তবুও একথা স্বীকার করা কঠিন যে সেই চাকতিগুলো

ঘুরপাক খেয়ে গ্যাসের গোলায়, আর শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হতে-হতে শক্ত গ্রহতে, পরিণত হয়েছে। কেননা, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, ও-রকম চাকতির পক্ষে ক্রমশ আরো ছোটো-ছোটো চাকতিতে ভাঙতে-ভাঙতে শেষ পর্যন্ত মহাকাশের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার কথাই। তৃতীয়ত, লাপ্‌লাসের মত অনুসারে, সেই আদি-নীহারিকার মাঝখানের অংশটি থেকেই আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র,—অর্থাৎ সূর্য,—সৃষ্টি হবার কথা। যদি তাই হয় তাহলে সূর্যের ঘূর্ণিবেগ গ্রহদের ঘূর্ণিবেগের চেয়ে ঢের বেশি হওয়া উচিত। অথচ, আসলে দেখা যাচ্ছে, ওই লাট্টুর মতো ঘোরবার ব্যাপারে সূর্য বেশির ভাগ গ্রহের চেয়ে মন্থর।

১৯০০ সাল নাগাদ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বৈজ্ঞানিক সৌরজগতের জন্ম নিয়ে আর-একটি মত প্রকাশ করলেন। সে-দুজনের নাম হলো, মৌলটন আর চেম্বারলিন। তাঁদের মতটা কী রকম?

আকাশে সূর্যের মতো আরো অনেক নক্ষত্র আছে আর তারাও সূর্যের মতোই প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে। মহাকাশটা এতো বড়ো যে এতো সহস্র নক্ষত্রের এমন অবিরাম ছুটে-চলা সত্ত্বেও দুটি নক্ষত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু কম হলেও, সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়। বৈজ্ঞানিক দুজন বললেন, হয়তো দু-তিন শো কোটি বছর আগে আকাশের অন্য কোনো নক্ষত্র ছুটে চলতে-চলতে আমাদের সূর্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলো —এমনকি, দুয়ের মধ্যে হয়তো সত্যিই একটা সংঘর্ষ বেধেছিলো। আমরা জানি, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে চাঁদের টানে সমুদ্রে জোয়ার আসে। তেমনি, অপর নক্ষত্রটি খুব কাছে এসে পড়ার দরুন সূর্য বলে আমাদের এই জ্বলন্ত গ্যাসের গোলাটিতেও নিশ্চয়ই জোয়ারের ঢেউ উঠেছিলো—সে-ঢেউ যে সত্যিই কী প্রকাণ্ড তা

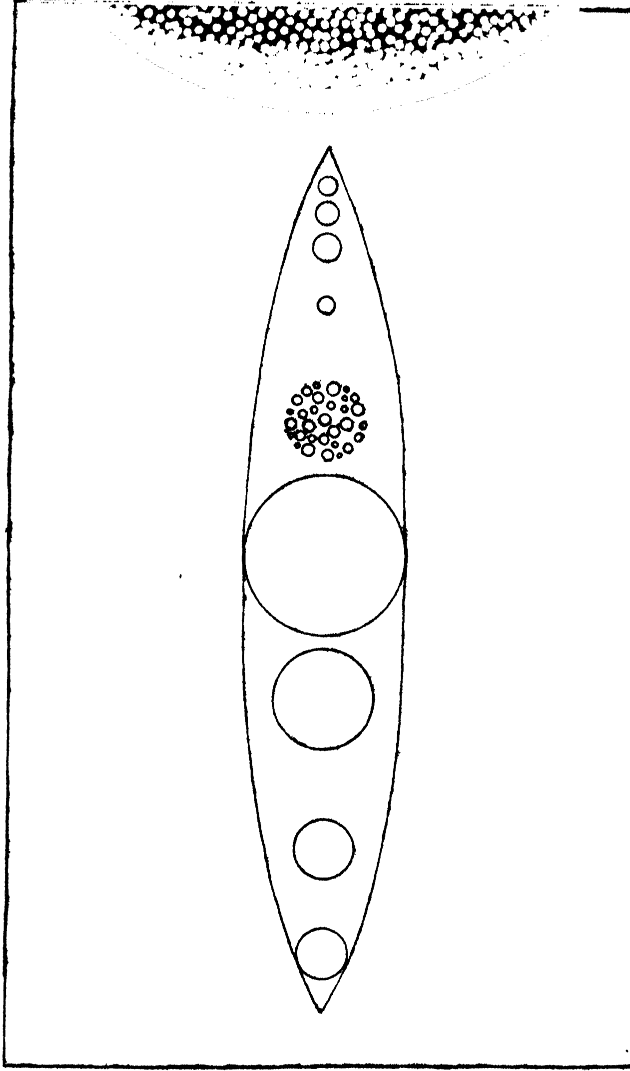


কল্পনা করবার শক্তি আমাদের কারুরই নেই। সূর্যের সে-ঢেউ থেকে শেষ পর্যন্ত একটা অংশ যেন ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলো আর সেটা ভেঙে গিয়ে অনেকগুলো ছোটো-ছোটো টুকরোয় ভাগ হয়ে গেলো। তারপর, আগন্তুক নক্ষত্রটি সূর্যকে ছেড়ে আকাশের অন্য দিকে চলে গেলো ; হয়তো যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলো সূর্য থেকে ঠিকরে-আসা কয়েকটি টুকরোও। সে-নক্ষত্র চলে যাবার পর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো সূর্যের বুকের ওপরকার জোয়ারের ঢেউ। এদিকে সূর্য থেকে ঠিকরে-আসা গ্যাসের পুঞ্জগুলো ঘুরতে লাগলো সূর্যেরই চারপাশে। ঘুরতে-ঘুরতে গ্যাস ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগলো আর ঠাণ্ডা হতে-হতে পরিণত হলো প্রথমটায় সম্ভবত

তরল আর তারপর ক্রমশ কঠিন পদার্থে। এই পদার্থের নাম দেওয়া হয় গ্রহ-কণা। অনেক গ্রহ-কণা একসঙ্গে মিলে একটি করে গ্রহ তৈরি করেছে। যে-গ্রহকণাগুলি এইভাবে গ্রহের মধ্যে মিলিত হতে পারে নি সেগুলি নিশ্চয়ই খাপছাড়া ভাবে আকাশের মধ্যে ঘুরছে—সম্ভবত সেগুলিকেই আজ আমরা উল্কা বলে চিনি।

জীন্‌স্ আর জেফরিস্ বলে দুজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ওই নক্ষত্র-সংঘর্ষের মতটাই খানিকটা শুধরে নিতে চেয়েছেন। মৌলটন আর চেম্বারলিনের মতের সঙ্গে এঁদের মতের একটা প্রধান তফাত হলো, এঁরা ওই গ্রহকণাগুলির কথাটা মানতে রাজি নন। অর্থাৎ, সূর্য থেকে ঠিকরে-আসা গ্যাসের পুঞ্জ থেকে আগে কতকগুলি গ্রহকণা সৃষ্টি হয়েছিলো আর তারপর সেই গ্রহকণাগুলি থেকেই গ্রহ সৃষ্টি হলো—এমনতরো কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তার বদলে, এঁরা বলছেন, আগন্তুক নক্ষত্রটির আকর্ষণে সূর্য থেকে প্রকাণ্ড লম্বা একটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলো—চুরোটের যে-রকম পেটটা মোটা আর পাশ দুটো সরু হয়, এই লম্বা গ্যাসের টুকরোটির চেহারাও অনেকটা সেই রকমের ছিলো। তারপর সেটা কয়েকটি ছোটো-ছোটো টুকরোয় ভেঙে যায়; ছোটো-ছোটো টুকরোগুলিই ঘুরতে-ঘুরতে আর ঠাণ্ডা হতে-হতে শেষ পর্যন্ত আমাদের গ্রহতে পরিণত হয়েছে। চুরোটের মতো গড়নের লম্বা গ্যাসের টুকরোর দুটি প্রান্ত থেকে যে-গ্রহগুলির জন্ম সেগুলি স্বভাবতই আকারে অনেক ছোটো; আর তাই সূর্যের সব-কাছের গ্রহের আর সব-দূরের গ্রহের মাপজোপ চুরোটের পেট-মোটা অংশ থেকে তৈরি মাঝখানের গ্রহের চেয়ে অনেক কম।

তাছাড়াও, জীন্‌স্ আর জেফরিসের এই মতটি দিয়ে সৌর-জগতের আরো নানান রকম জটিল লক্ষণেরও ব্যাখ্যা দেওয়া গেলো। তাই, এ-মত প্রকাশ হবার পর বৈজ্ঞানিক মহলে এর দারুণ



সমাদর হলো। অনেকেই বললেন, এতোদিন পরে সৌরজগতের সৃষ্টিসংক্রান্ত একটা নির্ভুল মতবাদ পাওয়া গেলো। কিন্তু তারপর, খুব সম্প্রতি, বৈজ্ঞানিকেরা আবার এই মতটি সম্বন্ধেও নানা-রকম সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। কেননা, দেখা যাচ্ছে, এ-মতকে সত্যি বলে মানলে সৌরজগতের আরো কতকগুলি

ব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যেমন, এ-মত যদি ঠিক হয় তাহলে সূর্যের ঘূর্ণিবেগ গ্রহদের ঘূর্ণিবেগের চেয়ে অনেক বেশি হবার কথা। অথচ, আমরা আগেই দেখেছি, আসলে তা নয়।

তাই আজকের দিনেও বৈজ্ঞানিক-মহলে সৌরজগতের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণার বিরাম নেই। নানান বৈজ্ঞানিক নানান ভাবে এ-রহস্যের একটা কিনারা করতে চাইছেন। তার মধ্যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের স্মিট বলে একজন বৈজ্ঞানিক যে-মতটা দিচ্ছেন অনেকের মতে সেটাই হয়তো নির্ভুল বলে প্রমাণিত হবে। স্মিট দেখাতে চাইছেন, কাণ্ট আর লাপ্‌লাসের নীহারিকা-বাদটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কাজের কথা নয়। আবার, সেই সঙ্গেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ওই যে আকাশে-ছুটে-আসা এক নক্ষত্রের কথা বলছেন, সেটাও যথেষ্ট জরুরি। স্মিট-এর মতে, সূর্য বলে নক্ষত্রটি এককালে আকাশে ছুটতে-ছুটতে এক নীহারিকার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলো আর তাকে ভেদ করে যাবার সময় তারই খানিকটা অংশ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো—সে-নীহারিকার অংশটি থেকেই শেষ পর্যন্ত সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

সৌরজগতের সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা এখনো অনেক গবেষণা করছেন। এবং গত কয়েক শো বছরের মধ্যে যে-রকম দ্রুতগতিতে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে তার কথা ভাবলে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি, সৌরজগতের সৃষ্টি-রহস্যের একটা সম্পূর্ণ নির্ভুল সমাধান পাবার জন্যে আমাদের খুব বেশিদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে না।

জ্বলন্ত গ্যাস-পুঞ্জ থেকে সমুদ্র, নদী, পাহাড়

ঠিক যে কী ভাবে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিলো, এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এখনো সম্পূর্ণ একমত হতে না পারলেও একটা বিষয়ে

কিন্তু মতের কোনো অমিল নেই : আমাদের এই পৃথিবীর চেহারাটা চিরকালই এ-রকম সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ছিলো না।

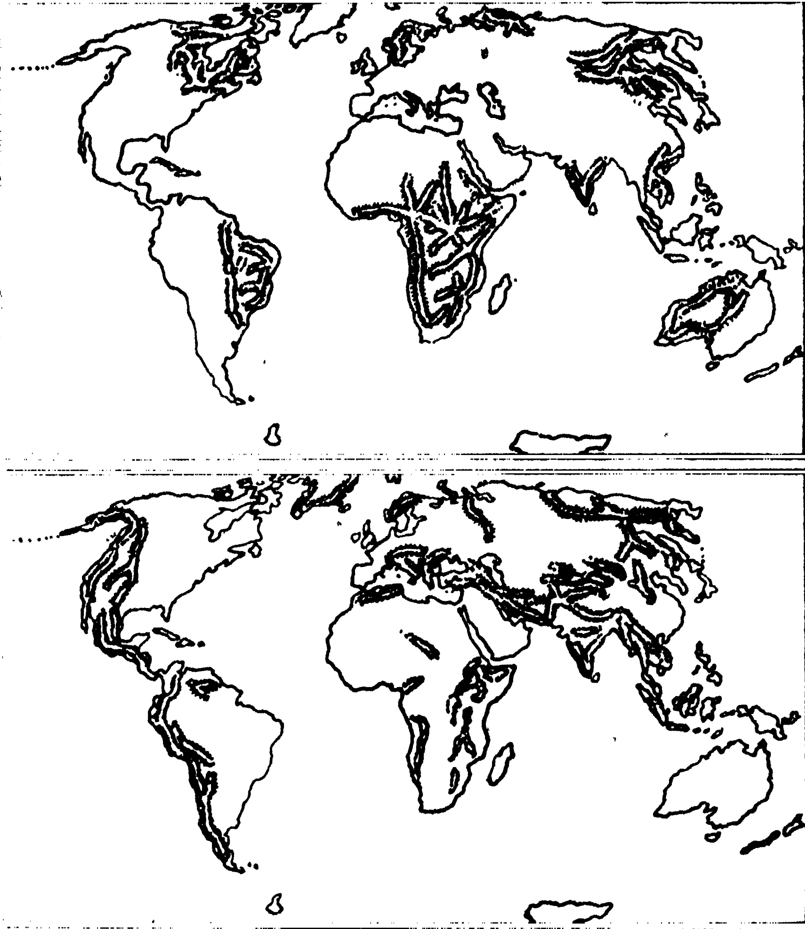
প্রথম অবস্থায় পৃথিবী একটা জ্বলন্ত গ্যাসের পুঞ্জই। তার থেকে তেজ বেরিয়ে যেতে-যেতে পৃথিবী ক্রমশই ঠাণ্ডা হয়েছে। গ্যাস ঠাণ্ডা হলে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড থেকেও ক্রমশ নিশ্চয়ই এক তরল পৃথিবীর জন্ম হলো। এই রকম তরল অবস্থায় পরিণত হতে পৃথিবীর পক্ষে কতোদিন সময় লাগা সম্ভব? খুব বেশি নয়। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, মাত্র কয়েক শো বছরের মধ্যেই এই রূপান্তর হবার কথা। তারপর, পৃথিবী আরো ঠাণ্ডা হতে লাগলো। গরম দুধের উপরে হাওয়া দিলে যে-রকম সর পড়ে অনেকটা সেইভাবেই ঠাণ্ডা হতে-হতে তরল পৃথিবীর বাইরের দিকটা ক্রমশ শক্ত হয়ে এলো। এইভাবে তরল পৃথিবীর উপরে একটা শক্ত খোলসের মতো জমতে কতোদিন সময় লাগা সম্ভব? হিসেব করে দেখা হয়েছে তাও খুব বেশি দিন নয়, মাত্র হাজার কয়েক বছরের ব্যাপার হবে। তখনো কিন্তু পৃথিবীর এই কঠিন গা-টা তেতে আগুন হয়ে রয়েছে, তার উপরে এক ফোঁটা জল পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যাবে। তাই তখনো পৃথিবীতে নদী নেই, হ্রদ নেই, সমুদ্র নেই—শুধু রুক্ষ পাহাড় আর পাথর। আর প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পৃথিবীর এই রুক্ষ গাটা যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। কিন্তু পৃথিবীর গাটা খুব বেশিদিন ও-রকম গনগনে গরম হয়ে থাকবার কথা নয়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে তারপর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ঠাণ্ডা হতে-হতে পৃথিবীর উপর-কার ওই খোলসটির নিজস্ব উত্তাপ বলতে প্রায় সবটুকু খোয়া গেলো। তখন থেকে পৃথিবীর এই উপর দিকের স্তরটিতে উত্তাপ বলতে যেটুকু তার প্রায় সবটাই সূর্য-কিরণের কাছ থেকে ধার-করা।

এর আগে পর্যন্ত যে-বায়ুমণ্ডল দিয়ে পৃথিবী মোড়া ছিলো তা ঘন মেঘের মতো বাষ্পের পুঞ্জ। পৃথিবী আরো একটু ঠাণ্ডা হবার পর সেই মেঘ ফুটন্ত জলের বৃষ্টিধারা হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে এলো। ফলে, রুক্ষ পৃথিবীর বুকে দেখা দিলো সমুদ্র, নদী, হ্রদ। নদীগুলো পাহাড় ধুয়ে, শিলাভূমি ক্ষইয়ে, পলিমাটি বয়ে নিয়ে চললো সমুদ্রের মধ্যে। সমুদ্রের মধ্যে পলিমাটি জমতে লাগলো—একটা স্তরের উপর আর-একটা স্তর, তার উপর আর-একটা। ক্রমশ নিচের স্তরের পলিমাটি উপরের স্তরের প্রচণ্ড চাপের চোটে কঠিন শিলায় পরিণত হলো। আর এইভাবে ক্রমশ সমুদ্রের বুকের মধ্যে পলিমাটি থেকে থাক-থাক পাথরের স্তর গড়ে উঠতে লাগলো। এইভাবে পলিমাটি থেকে জন্মানো পাথরকে বলে পাললিক শিলা। এই পাললিক শিলাগুলির কাছ থেকে আমরা আজ পৃথিবীর আদ্যিকালের অনেক কাহিনীই উদ্ধার করতে পারি। সে-সব কথায় একটু পরেই ফেরা যাবে। তার আগে আমরা আর কয়েকটি কথা সেরে নেবো।

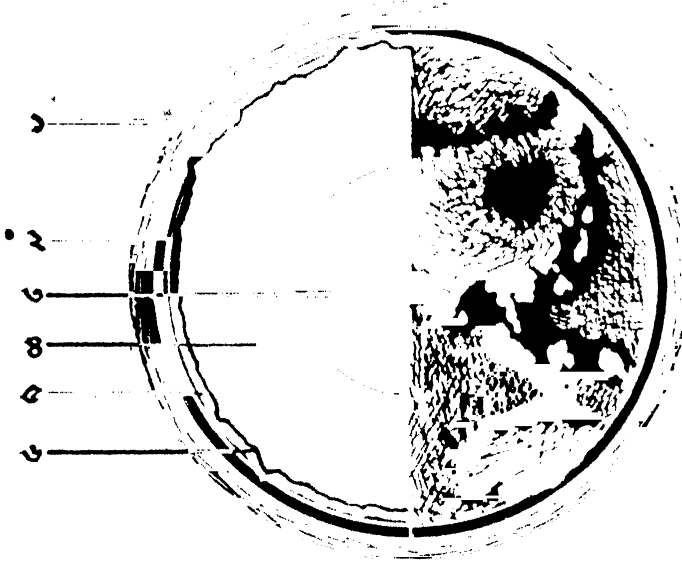
সেই আদিম যুগ থেকে শুরু করে পৃথিবীর বুকের উপরে একটা অবিরাম ভাঙা-গড়া চলেছে ; আজ যেখানে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় লক্ষ বছর আগে সেখানে হয়তো অতল সমুদ্র ছিলো, আজ যেখানে অতল সমুদ্র লক্ষ বছর পরে সেখানে হয়তো আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় দেখা দেবে। প্রধানত তিনভাবে এই অদল-বদল ঘটে চলেছে।

প্রথমত, ঠাণ্ডা হতে-হতে পৃথিবীর শুধু বাইরের খোলসটুকুই শক্ত হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর একবারে ভিতরকার অংশটা এখনো প্রচণ্ড গরম—কী রকম গরম তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাই সম্ভব নয়। ভেতরকার সেই প্রচণ্ড উত্তাপের চাপে পৃথিবীর উপরকার শক্ত খোলসটি এখানে ওখানে ঠেলা খেয়ে চড়চড় করে উঁচু হয়ে যায়, কখনো বা পৃথিবীর উপরকার কঠিন খোলসকে ভেদ

করে ভিতরকার তরল ফুটন্ত পদার্থ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। তারই নাম আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীর বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরিই কিন্তু সমুদ্রের তলায়। তার কারণ পৃথিবীর গায়ের বেশির ভাগ অংশই



উপরের ছবিতে কয়েক কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর মানচিত্র। নিচের ছবিতে আধুনিক পৃথিবীর মানচিত্র। উঁচু পাহাড় বোঝাবার জন্যে মোটালাইন ব্যবহার করা হয়েছে। উপরের ছবিতে হিমালয়েরই চিহ্ন নেই!



পৃথিবীর একটা পাশ যেন কেটে দেখা হচ্ছে ভিতরে কী আছে না-আছে। পরের পর কয়েকটি স্তরের কথা: সবচেয়ে ভিতরে (ছবির ৩নং) অসহ্য গরম গলা পদার্থ, তার ব্যাস ৪০০০ মাইল। তার পর ২০০০ মাইল পুরু ব্যারিস্ফিয়ারের স্তর (৪নং)। তারপর পাতলা ধাতুর স্তর (৬নং)। তারপর মাইল ২৫-৩০ পুরু পাথরের স্তর (৫নং)। তারপর গড়ে ২½ মাইল পুরু জলের স্তর (২নং)। তারপর ২০০ মাইল পুরু বায়ুমণ্ডল (১নং)।

সমুদ্র-ঢাকা। সমুদ্রের মধ্যে লুকোনো এই আগ্নেয়গিরিগুলির দরুন কোথাও কোথাও সমুদ্রের নিচের পাথরের স্তর মাথা চাড়া দিয়ে, সমুদ্র ভেদ করে, পাহাড় হিসেবে উঠে আসে।

দ্বিতীয়ত, বৃষ্টির জল নদী হয়ে বয়ে যাবার সময় পৃথিবীর উপরকার পাহাড়-পর্বত আর উঁচু উঁচু জায়গাকে ক্ষইয়ে-ক্ষইয়ে দেয়।

তৃতীয়ত, নদীগুলি অবিরাম সমুদ্রের মধ্যে পলিমাটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর সমুদ্রের ভিতরে এই পলিমাটি জমতে-জমতে স্তরের পর স্তর পাললিক শিলা তৈরি হচ্ছে। এইভাবে পাললিক শিলার স্তর জমতে-জমতেই যেন ধাপে ধাপে পাহাড় গড়ে উঠবে।

তাহলে, নদী যে বয়ে চলেছে তার পিছনে রয়েছে পাহাড় ধ্বংস হবার ইতিহাস আর তার সামনে রয়েছে নতুন পাহাড় সৃষ্টির সম্ভাবনা। একদিকে ধ্বংস আর একদিকে সৃষ্টি—পৃথিবীর বুকের উপরে পরিবর্তনের বিরাম নেই।

হিসেব করে দেখা গিয়েছে গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র প্রতি বছর প্রায় ১০২০৬০০০০০০ মন পলিমাটি সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জমা করছে। তাহলে, একথা কল্পনা করা কঠিন নয় যে এইভাবে পলিমাটি জমতে-জমতেই এককালে হিমালয়ের মতো আর-একটি পাহাড়ের সূচনা হবে আর তারপর হয়তো পৃথিবীর ভেতরকার প্রচণ্ড উত্তাপের চাপে একদিন সে-পাহাড় চড়চড় করে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে উঠবে। ততোদিনে হয়তো আজকের এই গগনচুম্বী হিমালয় বৃষ্টিতে আর নদীর স্রোতে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে!

আবার হিমালয় পাহাড়ের সাড়ে-ষোলো হাজার ফুট উঁচু চুড়োতেও সামুদ্রিক জীবের চিহ্ন (ফসিল) খুঁজে পাওয়া গিয়েছে! তার মানে আজ যেখানে ওই হিমালয় পাহাড়ের অমন উঁচু চুড়ো, সেখানে এককালে ছিলো এক অতল সমুদ্র আর কোনো এক ভুলে-যাওয়া উঁচু পাহাড় ক্ষইয়ে ভুলে-যাওয়া নদীরা সে-সমুদ্রের মধ্যে পাললিক পাহাড়ের উপাদান বয়ে আনতো।

পৃথিবীর বয়েস কতো হলো?

পৃথিবীর বুকের ওপর এই সব অদলবদলের বর্ণনায় আমরা দু-চার লক্ষ বছরের কথা, কিংবা এমনকি দু-চার কোটি বছরের কথাও, বড্ড অনায়াসে ব্যবহার করে থাকি—যেন কোনো এক ষাট বছরের বৃদ্ধের জীবনে এ-সব নেহাত দু-চার মাসের ব্যাপার! পৃথিবীর বয়েস এতো হয়েছে যে তার কাহিনী বলবার সময়ে আমরা

এতো অনায়াসে অতো বড়ো বড়ো যুগের কথা উল্লেখ করতে পারি।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, পৃথিবীর বয়েস খুব কমপক্ষে দেড় শো কোটি বছর তো হবেই। এমনকি, তিন শো কোটি বছরও হতে পারে।

কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণের কথাটা তুলতে হলে আগে আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু কথা আলোচনা করতে হবে।

পৃথিবীর নানান জায়গার পাহাড় থেকে ইউরেনিয়াম বলে একরকমের পদার্থ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এ-রকম পদার্থকে বলেন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, কেননা এ-জাতীয় পদার্থ থেকে তেজ বেরিয়ে যায়। তেজ বেরুবার কারণ হলো, এ-জাতীয় পদার্থের পরমাণু ক্রমাগতই ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে গিয়ে তার ভিতর থেকে আল্‌ফা-পার্টিক্যল্‌ বা বিটা-পার্টিক্যল্‌ বলে কণা ঠিকরে বেরিয়ে যায় আর এইভাবে ও-জাতীয় কণা ঠিকরে বেরুবার দরুন তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর মধ্যে জমানো খানিকটা তেজ বা শক্তি মুক্তি পায়। বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর ওজন আলোচনা করবার সময় হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে ১ ধরেন; সেই হিসেব অনুসারে আল্‌ফা-পার্টিক্যল-এর ওজন ৪ অর্থাৎ কিনা হাইড্রোজেন পরমাণুর চারগুণ। আর, ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন হলো ২৩৮— অর্থাৎ কিনা, হাইড্রোজেন পরমাণুর দু-শো-আটত্রিশ গুণ। তাহলে ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে আল্‌ফা-পার্টিক্যল্‌ বেরিয়ে যেতে থাকলে তার ওজন কমবে। কী হারে কমবে? ২৩৮ থেকে চার করে-করে কমবে: ২৩৪, ২৩০, ২২৬, ২২২, ২১৮, ২১৪, ২১০, ২০৬। পরমাণুর ওজন যেমন কমবে তেমনি আবার পরমাণুর স্বরূপটাও বদলে যাবে—ইউরেনিয়াম থেকে তৈরি হবে নতুন পদার্থ। আমাদের আলোচনার পক্ষে এখানে ওই যে ২২৬ আর

২০৬ পরমাণু-ওজন-যুক্ত পদার্থ দুটি তৈরি হয়, ও দুটির কথাই সবচেয়ে জরুরি। ২২৬-ওজনের পদার্থটির নাম রেডিয়াম, ২০৬-ওজনের পদার্থটি হলো সীসে—কিন্তু সাধারণ সীসে নয়। কেননা, সাধারণ সীসের পরমাণুর ওজন হলো ২০৭·২। আল্‌ফা-পার্টিক্যল বেরিয়ে যেতে-যেতে ইউরেনিয়াম শেষ পর্যন্ত যে-সীসেয় পরিণত হয় তার সঙ্গে সাধারণ সীসের শুধু এই ওজনের দিক থেকেই তফাত ; বাকি সব দিক থেকে তার সঙ্গে সাধারণ সীসের একেবারে হুবহু মিল। ইউরেনিয়াম থেকে এইভাবে আল্‌ফা-পার্টিক্যল বেরিয়ে যেতে-যেতে তা ২০৬ পরমাণু-ওজনের সীসেয় পরিণত হবার পর আর তেজস্ক্রিয় থাকে না।

প্রথমত লক্ষ্য করা দরকার, রেডিয়াম ভেঙে যাওয়ার, অর্থাৎ রেডিয়াম থেকে আল্‌ফা-পার্টিক্যল বেরিয়ে যাওয়ার, হারটা বাঁধা-ধরা : প্রতি বছর যে-কোনো এক-টুকরো রেডিয়ামের ২২৮০ ভাগের একভাগ করে ভেঙে যায়। তার মানে, রেডিয়ামের ওই টুকরোটির পরমায়ু মাত্র ২২৮০ বছর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রকৃতি থেকে আমরা যখনই খানিকটা ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করি তখনই দেখতে পাই তার মধ্যে একটা বাঁধাধরা নির্দিষ্ট অংশ হলো রেডিয়াম : একটি করে রেডিয়াম-পরমাণুর অনুপাতে দশ-কোটি করে ইউরেনিয়াম পরমাণু থাকবে। এ-হিসেব একেবারে বাঁধাধরা—কোথাওই এর এতোটুকু নড়চড় হয় না। তাহলে প্রশ্ন হলো, রেডিয়ামের পরমায়ু অতো কম হলেও ইউরেনিয়ামের মধ্যে তা কী করে এমন বাঁধাধরা অনুপাতে থাকতে পারে ? এ-প্রশ্নের একমাত্র জবাব হলো, ইউরেনিয়ামের পরমাণুও নিশ্চয়ই এমন হারে ভেঙে চলে যাতে ওই রেডিয়ামের ক্ষয় পূরণ হয়ে যায়। এ-ছাড়া ইউরেনিয়ামের মধ্যে ওই নির্দিষ্ট অনুপাতে রেডিয়ামের অস্তিত্বর আর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। এর থেকে আমরা ইউরেনিয়ামের

পরমাণু ভাঙনের হারটাও অনুমান করতে পারবো। ইউরেনিয়মের পরমাণু ঠিক কোন হারে ভেঙে চললে তার মধ্যে ওই ভাবে রেডিয়ামের ক্ষয় পূরণ হতে পারে? হিসেব করলে দেখা যায়, তার জন্যে প্রতি বছর ইউরেনিয়ামের প্রতি ৬৪০০০০০০০০গুলি পরমাণুর মধ্যে একটি করে পরমাণু ভেঙে যাওয়া প্রয়োজন।

আমরা একটু আগেই দেখেছি, ইউরেনিয়াম ভেঙে চলার এই যে-পদ্ধতি এর চরম পরিণাম হলো ওই ২০৬ পরমাণু-ওজনের সীসে। তাহলে একটুকরো ইউরেনিয়মের কতোটা করে অংশ প্রতি বছর এই সীসেতে পরিণত হবে? প্রতি ৬৪০০০০০০০০-টি পরমাণুর মধ্যে একটি করে; কেননা এই হারেই ইউরেনিয়াম ভেঙে চলেছে। এখন, ইউরেনিয়ামের পরমাণু-ওজন হলো ২৩৮, আর ওই সীসের পরমাণু-ওজন হলো ২০৬। তাহলে, ওজনের দিক থেকে ইউরেনিয়ামের কতোখানি করে অংশ ওই সীসেতে পরিণত হবার কথা?

$$\frac{৬৪০ \text{ কোটি} \times ২৩৮}{২০৬} = ৭৪০ \text{ কোটি}।$$

এবার দেখা যাক, এই হিসেবটি মনে রেখে কী করে একটা পাথরের বয়েস বের করা যেতে পারে। ধরা যাক, আমি পাহাড় কেটে একটুকরো ইউরেনিয়াম উদ্ধার করলাম আর পরীক্ষা করে দেখলাম তার মধ্যে ওজনের দিক থেকে প্রতি একভাগ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে মিশে রয়েছে 'A' ভাগ সীসে। যদি তাই হয়, তাহলে এই ইউরেনিয়াম টুকরোটির বয়স হয়েছে ৭৪০ কোটি × A বছর।

পৃথিবীর নানা জায়গার আর নানা-রকম পাথরের স্তর থেকে পাওয়া ইউরেনিয়ামের নমুনা পরীক্ষা করে আর মোটামুটি উপরের ওই হিসেব-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত

করছেন, পৃথিবীর পাহাড়গুলোর বয়েস দেড় শো কোটি থেকে তিন শো কোটি বছরের মধ্যে হবে।

পাললিক পাহাড়ের জবানবন্দী

এই যে অন্তত দেড় শো কোটি বছরের পুরোনো ইতিহাস—এর আভাস পাওয়া যাবে কেমন করে? বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, তার একটা উপায় হলো পাহাড়গুলিকে পরীক্ষা করা। তাই আমরা এবার পাহাড়ের জবানবন্দী শুনবো।

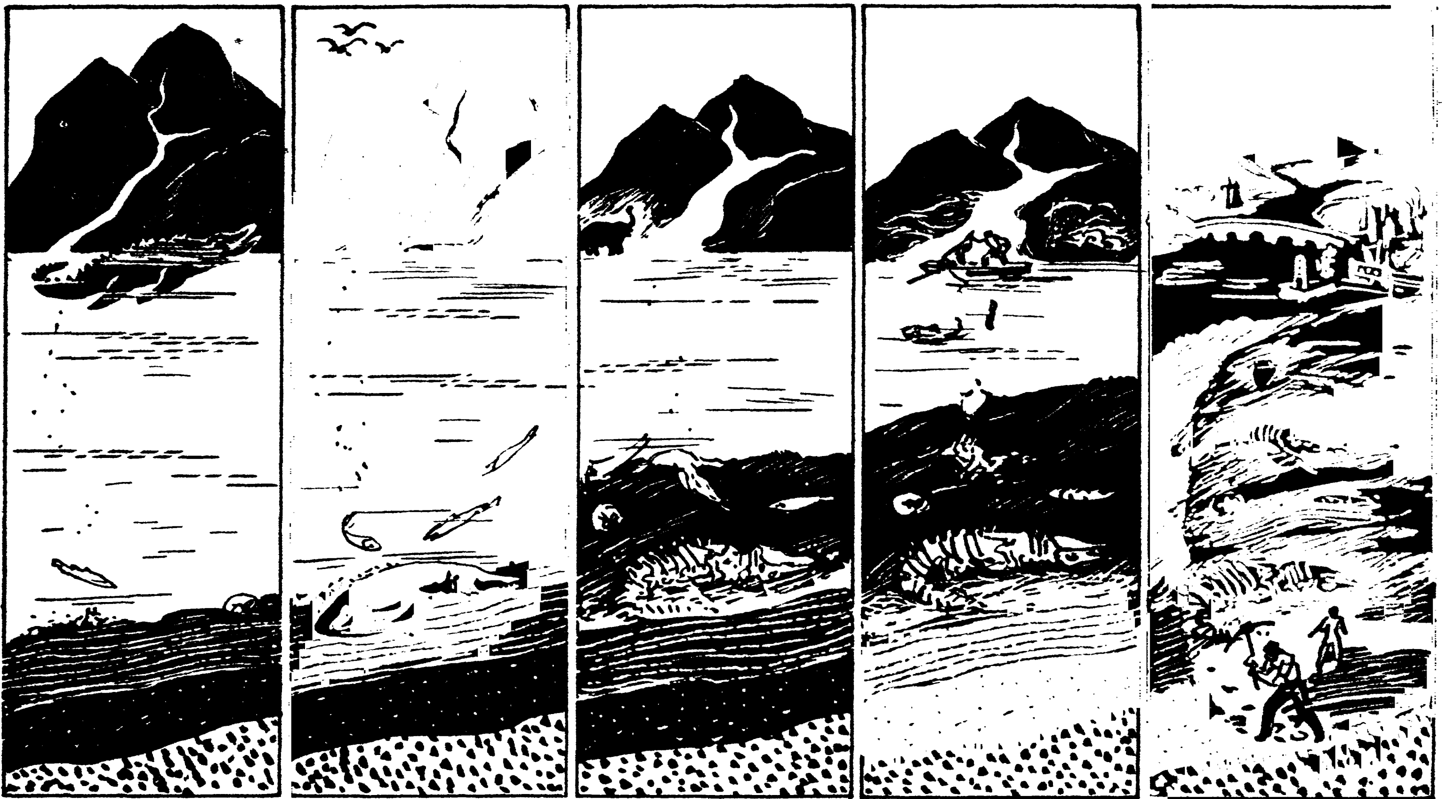
পাহাড় প্রধানত তিন রকমের। কিন্তু এই তিন রকমের মধ্যে আমাদের আলোচনায় সবচেয়ে জরুরি হলো, পাললিক পাহাড়দের কথা। তার কারণ শুধু এই নয় যে পাললিক পাহাড়দের কাছ থেকেই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক খবর পাওয়া সম্ভব; তাছাড়াও মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর বেশির ভাগ পাহাড় বলতে এরাই—অর্থাৎ, পাললিক পাহাড়ই।

পাললিক পাহাড় কী রকম? যেন উপর-উপর থাক-থাক পাথরের স্তর সাজানো রয়েছে। এ-রকম পাহাড় তৈরি হয় কী করে? সে-কথার আভাস আমরা একটু আগেই দিয়েছি। বৃষ্টির জল নদী হয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে, ছুটে চলবার সময় পুরোনো পাহাড় ক্ষইয়ে সমতল জমি ধুয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে মাটি, বালি, পাথরের গুঁড়ো—আরো অনেক কিছু। নদীর স্রোতের সঙ্গে এগুলি গিয়ে পড়ছে সমুদ্রের মধ্যে আর থিতিয়ে বসছে সমুদ্রের একেবারে তলায়। এইভাবে সমুদ্রের তলায় নদীরা যেন পলিমাটির একটা পুরু চাদর বিছিয়ে দিলো, আর তারপর ক্রমশ তার উপরে জমতে লাগলো আর-একটা পুরু চাদর, তার উপরে আর-একটা। ক্রমশ নিচের চাদরের উপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ায় সেটি জমে শক্ত পাথর হয়ে গেলো, তারপর ক্রমশ তার উপরকার স্তরটিও পাথর

হলো, তারপর তার উপরকার স্তরটিও। এইভাবে, সমুদ্রের বুকের মধ্যে একটির উপর আর-একটি পাথরের চাদর বিছিয়ে গেলো। তারপর হয়তো কোনো এক সময়ে সমুদ্রের নিচের আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড ঠেলা খেয়ে ওই থাক-থাক-করে সাজানো পাথরের স্তর চড়চড় করে মাথা উঁচু করলো সমুদ্র ছেড়ে আকাশের দিকে। এইভাবে মাথা উঁচু করবার সময় পাথরের চাদরগুলিতে নিশ্চয়ই অনেক ওলট-পালট হয়ে যায়, সেগুলি নানান ভাবে ভেঙেচুরে এলোমেলো হয়ে যায় : কোথাও বা দেখা যায় সব-নিচের স্তরের পাথরের চাঁই সব-উপরের স্তরে চলে এসেছে, কোথাও বা দেখা যায় যে-চাদর এককালে সমান ভাবে পাতা ছিলো তা ঠেলা খেয়ে খাড়া আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে।

এই পাললিক পাহাড়ের স্তরগুলির মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক জিনিস বলতে,—ফসিল। ফসিল মানে কী? ফসিল কী করে তৈরি হয়? ফসিলগুলি পরীক্ষা করে পৃথিবীর পুরোনো খবর হিসেবে কী জানা যায়?

পাহাড়ের মধ্যে উদ্ভিদ আর প্রাণিজগতের যে-কোনো রকম চিহ্নকে ফসিল বলে। কোথাও হয়তো প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে নরম জমির উপরে পোকা-মাকড় বা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর পায়ের ছাপ কিংবা গাছের পাতার ছাপ পড়েছিলো; নরম জমিটা ক্রমশ শক্ত পাথরে পরিণত হবার পরও নানান কারণে ওই ছাপগুলি নষ্ট হয়ে যায় নি, শক্ত পাথরের বুকে স্থায়ী চিহ্ন হিসেবে টিকে থেকেছে। এ-সব ছাপগুলিকে বলবো, ফসিল। আবার, কোথাও হয়তো শামুক-গুগলি, গাছ-পাতা আর জন্তুজানোয়ারের কঙ্কাল গিয়ে জমেছিলো নরম পলিমাটির মধ্যে। কালক্রমে এই নরম পলিমাটি কঠিন পাথরে পরিণত হবার পর ওই গাছগাছড়া বা প্রাণীর দেহাবশেষগুলি বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু পাথরের বুকে টিকে থেকেছে তাদের দেহাবশেষের



পাললিক পাহাড় জন্মাবার ইতিহাস। এরই থাকে থাকে আগেকাব কালেব প্রাণীদের যে-চিহ্ন তাকেই বলে 'ফসিল'



পাললিক পাহাড়ের স্তর : অনেক ওলট-পালট হয়ে যায়

ছাঁচ—সেই ছাঁচ পরীক্ষা করে আজ আমরা বুঝতে পারি আদিম যুগের শামুকটা গাছের ডালটা বা জানোয়ারের কঙ্কালটা ঠিক কী রকম দেখতে ছিলো। কোথাও আবার গাছকে গাছই বা পুরো প্রাণীটাই বা প্রাণীর কঙ্কালটাই পলিমাটির সঙ্গে বদলাতে-বদলাতে আগাগোড়াই পাথর হয়ে গিয়েছে। কোথাও পাললিক পাথরের মধ্যে প্রাচীন জন্তুজানোয়ারের দাঁত বা হাড় সুরক্ষিত অবস্থায় টিকে গিয়েছে। এমনকি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোনো কোনো দৃষ্টান্তের বেলায়, প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের মাংস পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া

গিয়েছে : যেমন, তুষারময় সাইবেরিয়া থেকে হাজার হাজার বছর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক হাতি বা ম্যামথের মাংস এমন তাজা অবস্থায় পাওয়া গেলো যে আধুনিক কালের মানুষ তা রীতিমতো ভক্ষণ করেছে।

এই হলো ফসিল—পুরোনো পাহাড়ের মধ্যে পুরোনো কালের উদ্ভিদ আর প্রাণিজগতের নানা রকম চিহ্ন। স্বভাবতই, এ-জাতীয় ফসিলগুলি পরীক্ষা করে আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবী সম্বন্ধে নানা রকম খবর সংগ্রহ করছেন। আমরা একটু পরেই দেখবো, কয়েক কোটি বছর ধরে বদলাতে-বদলাতে পৃথিবীর আদিম জীব থেকে কী করে আধুনিক যুগের গাছ-গাছড়া আর জীবজন্তুর আবির্ভাব হয়েছে সে-বিষয়ে এই ফসিল-গুলির কাছ থেকেই আমরা কতো সংবাদ পেয়ে থাকি।

পাললিক পাহাড়ের নানান স্তর

একের পর এক বা উপর-উপর পলিমাটির স্তর জমতে-জমতেই গড়ে উঠেছে পাললিক পাহাড়। স্বভাবতই, পাললিক পাহাড়ের এই সব স্তরের মধ্যে সব-নিচের স্তরটির বয়েস সবচেয়ে বেশি।

পাললিক পাহাড়ের এই সব-প্রাচীন স্তরগুলির উপর অন্যান্য স্তর জমতে থাকার দরুন স্বভাবতই এর ইতিহাস একেবারে চাপা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু আগ্নেয়গিরির চাপে কোথাও কোথাও এই নিচের স্তর উপরের স্তরগুলিকে ঠেলে-হটিয়ে পৃথিবীর একেবারে বাইরের দিকে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোথাও আবার, বৃষ্টিতে, নদীর স্রোতে আরো নানান কারণে উপরের স্তরগুলি ক্ষয়ে যেতে-যেতে বেরিয়ে এসেছে সব-নিচের স্তর। বৈজ্ঞানিকেরা তাই এই আদিম স্তরের শিলাকেও পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন। পরীক্ষা করে তাঁরা বলছেন, এর মধ্যে জীবন্ত জিনিসের কোনো

রকম পরিচয় বা ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'আ-জোইক' (Azoic) বা নিষ্প্রাণ শিলার স্তর। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেছেন, তারপর বাকি সবগুলি স্তরের শিলা জমতে মোটের উপর যতোখানি সময় লেগেছিলো তার চেয়েও ঢের বেশি সময় ধরে শুধু ওই নিষ্প্রাণ স্তরের শিলাই পৃথিবীতে ছিলো।

এই নিষ্প্রাণ স্তরের উপরের স্তরটিতেই প্রথম প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সে-পরিচয় অত্যন্ত প্রাকৃত, অতি আদিম ধরনের: অ্যালজি বলে আদিম উদ্ভিদ কিংবা নরম মাটির বুকে আদিম পোকা চলার দাগ। তাই এই স্তরটির নাম দেওয়া হয় 'প্রোটেরোজোইক' শিলার স্তর। পৃথিবীর ইতিহাসে এই স্তরের শিলার কাহিনীও অতি দীর্ঘ যুগের।

তার উপরের স্তরে রকমারি উদ্ভিদ আর রকমারি প্রাণীর ফসিল পাওয়া যাচ্ছে, কাঁকড়া, পোকা, সমুদ্রের উদ্ভিদ আর তারপর এমন কি ডাঙার উদ্ভিদ আর ডাঙার প্রাণীরও। এই স্তরটির নাম দেওয়া হয় প্যালিওজোইক শিলার স্তর—অর্থাৎ কিনা, প্রাচীন যুগের প্রাণের পরিচায়ক স্তর। অবশ্যই, এই প্যালিওজোইক শিলার স্তরটি নিচু থেকে উঁচু পর্যন্ত আগাগোড়াই এক রকমের নয়; উপর উপর—অতএব পরের পর—অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ছোটো স্তর মিলে ওই পুরো প্যালিওজোইক স্তর। ফলে, ওই অপেক্ষাকৃত ছোটো-ছোটো নানান স্তরেরও বয়েস নানা রকম। তাই এই সব বিভিন্ন স্তরের মধ্যে খুঁজে-পাওয়া ফসিলও সবই যে একই যুগের প্রাণীদের পরিচয় বহন করছে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

তার উপরের স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে মেসোজোইক শিলার স্তর—অর্থাৎ কিনা, জীবজগতের মধ্যযুগের ইতিহাসটা এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। জীবজগতের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়—সে অধ্যায় কোটি দশেক বছরের কাহিনী-মাত্র—এই

স্তরটির ফসিলের মধ্যে টিকে রয়েছে। কোন ধরনের ফসিল? সে সব হলো অতিকায় জানোয়ার আর অতিকায় পাখি আর অতিকায় উদ্ভিদদের কথা। পুরানো পৃথিবীর ইতিহাসে এই যুগটির কাহিনী বড়ো রোমাঞ্চকর। আমরা কিছু পরেই সে-কাহিনীর অবতারণা করবো।

মেসোজোইক স্তরের পর সেনোজোইক শিলার স্তর—অর্থাৎ কিনা, এই স্তরের শিলার মধ্যে জীবজগতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কাহিনী ফসিল হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই যুগ বলতেও মাত্র দু-চার বছর বা মাত্র দু-চার শো বছরেরই কথা নয়। এও হলো অনেক কোটি বছরের কাহিনী।

তাহলে, পাললিক শিলার কাহিনীর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে জীবজগতের কাহিনীও। এবার আমরা শিলার কথা ছেড়ে প্রাণিজগতের কথা শুরু করবো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমবিকাশ মানে কী?

একটি রহস্যজনক বিজ্ঞাপন

"মাছটির ছবি ভালো করে দেখুন। এ-মাছ আপনাকে ভাগ্যবান করে দিতে পারে। ওর অদ্ভুত লেজজোড়া আর পাখনাগুলির দিকে নজর রাখতে হবে। এ-পর্যন্ত বিজ্ঞানের জন্য মাত্র একটি এই মাছ পাওয়া গিয়েছে, সেটি লম্বায় পাঁচ ফুট। এ-জাতীয় মাছ আরো দেখা গিয়েছে। আপনি যদি এ-রকম একটা মাছ ধরতে পারেন বা জোগাড় করতে পারেন তাহলে **সেটিকে কাটাকুটি করবেন না, বা চেঁছে-ছুলে সাফ করবেন না**; তার বদলে সঙ্গে সঙ্গে মাছটিকে বরফ-ঘরে পুরে ফেলবার চেষ্টা করুন, কিংবা, কোনো দায়িত্বশীল অফিসারের জিম্মায় মাছটি পৌঁছে দিন আর তাঁকে বলুন, কালক্ষেপ না করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় টেলিগ্রাফে খবর পাঠাতে: অধ্যাপক জে. এল্. বি. স্মিথ, রোড্স্ বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রেহাম্স্ টাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা। এ মাছের প্রথম দুটি নমুনার প্রতিটির জন্যে একশো পাউণ্ড (অর্থাৎ, প্রায় সওয়া হাজার টাকা) করে পুরস্কার দেওয়া হবে। সে বিষয়ে রোডস্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিজ্ঞান সংসদ গ্যারাণ্টি দিচ্ছে। আপনি যদি দুটির বেশি এই মাছ পান তাহলে সবকটিকেই সযত্নে রাখবেন; বিজ্ঞানের জন্যে প্রত্যেকটিই বিশেষ মূল্যবান এবং প্রত্যেকটির জন্যেই আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।"

যাতে কারুর পক্ষেই বিজ্ঞাপনটি বুঝতে অসুবিধে না হয় সেইজন্যে মাছের ছবির সঙ্গে তিন তিনটে ভাষায় এই কথাগুলি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিলো। তিন ভাষাতেই এক কথা : ছবির নমুনা মিলিয়ে মাছ ধরে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে।

এ রকম রহস্যজনক একটা বিজ্ঞাপন কেন ?

আজ থেকে প্রায় আঠারো বছর আগেকার কথা। ১৯৩৮ সাল। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ব্যবসাদারের জালে ভারি অদ্ভুত একটা মাছ উঠেছিলো। নীল স্টিলের মতো তার গায়ের রঙ। মাছটা লম্বায় পাঁচ ফুট। ওটির যে এতোখানি কদর হবে ব্যবসাদার-মশাই তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি ; পারলে নিশ্চয়ই সযত্নে তাকে বরফের মধ্যে রাখবার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু তখন কারুর মাথাতেই সে কথা আসেনি। ফলে মাছটা গলে-পচে প্রায় পাঁক হয়ে যাবার যোগাড় হলো : যখন বৈজ্ঞানিকদের নজরে এলো তখন তার অবশিষ্ট বলতে খানকতক হাড় আর মাত্র ছালটুকু চেনা যাচ্ছে। কিন্তু তাই দেখেই তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! জেলেদের কাছে শোনা গেলো, এ-রকম মাছ নাকি আরো দেখা গিয়েছে। তাই শুনে তাঁরা খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়ে দিলেন।

বিজ্ঞাপনটার কোনো ফল ফললো নাকি ? এ-রকম মাছ কি আর পাওয়া গিয়েছে ? গিয়েছে ; কিন্তু তা অনেকদিন পরে। ১৯৫২ সালে। কোথায় পাওয়া গেলো ? আফ্রিকারই মাদাগাস্কার দ্বীপের কাছে। এই দ্বিতীয় মাছটি যখন বৈজ্ঞানিকদের নজরে এলো তখন তার অবস্থা প্রথমটির মতো শোচনীয় নয়। তাই তাকে আরো ভালো করে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছিলো।

আরো ধরা পড়েছে। ৪ঠা মে ১৯৫৬ তারিখে মাদাগাস্কারের সংবাদে প্রকাশ, একটি ওই জাতের স্ত্রী-মাছ ধরা পড়েছে—এর

আগের যে-দুটি তারা উভয়েই পুরুষ। এই মাছকে পরীক্ষা করবার জন্য একটি সামরিক বিমানে করে টানারিভেতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কী মাছ ওটা? রুই-কাতলা বা কই-মাগুর ধরনের কোনো রকম চেনা মাছ মোটেই নয়। একে বলে কোয়েলাকান্থ: ১৯৩৮ সালে ওই যে প্রথম কোয়েলাকান্থ-টিকে পাওয়া গিয়েছিলো তার নাম দেওয়া হয়েছে লাতিমারিয়া সালুম্‌নে। ১৯৫২ সালে যে দ্বিতীয় কোয়েলাকান্থকে পাওয়া গেলো তার নাম দেওয়া হলো ম্যালেনিয়া আঁজুয়ানে।

সমুদ্রের জলে যেন জীবন্ত ফসিল!

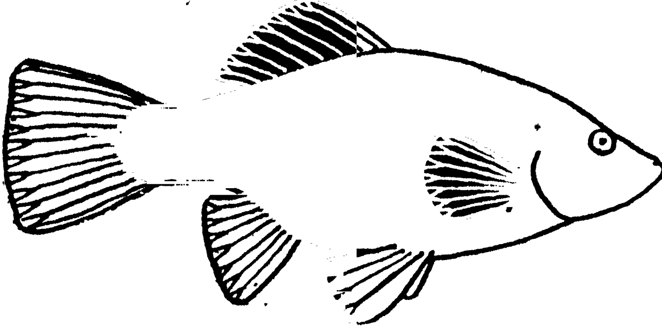
১৯৩৮ সালের ওই পচা-গলা মাছটার অবশিষ্ট হাড় আর ছালটুকু পরীক্ষা করেই বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পেরেছিলেন এ-মাছ যেমন-তেমন মাছ নয়—খাঁটি কোয়েলাকান্থ। আর সমুদ্রের মধ্যে আজো যে কোয়েলাকান্থ বেঁচে থাকতে পারে বৈজ্ঞানিকদের কাছে সে-কথা যেন এক পরম বিস্ময়। কেননা, তাঁদের হিসেব অনুসারে এই মাছ হলো নিদেন-পক্ষে পাঁচ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর বাসিন্দা—প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগেই পৃথিবী থেকে কোয়েলাকান্থ বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা। তাই জীবন্ত কোয়েলাকান্থ-এর খবর তাঁদের কাছে পরমাশ্চর্য তো হবেই!

তার মানে, কোয়েলাকান্থ-এর খবর তাঁরা আগে থাকতেই জানতেন। কী করে জানতেন? আর, কোন হিসাবের উপর নির্ভর করে তাঁরা আগে থাকতেই ধরে রেখেছিলেন যে এরা পাঁচ কোটি বছর আগেকার প্রাণী? তাঁদের কাছে এ-সব ব্যাপারের প্রমাণ ছিলো। কী রকম প্রমাণ? তার নাম ফসিল—পাললিক পাহাড়ের স্তরেস্তরে প্রাচীন প্রাণীদের প্রস্তর-চিহ্ন। পাললিক পাহাড়গুলি যেন পৃথিবীর আদিম যুগের ইতিহাসকে বুকের মধ্যে

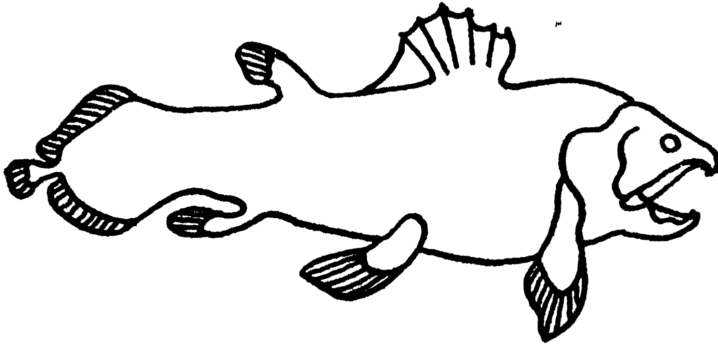
লুকিয়ে রেখেছে—পাথরের ভাষায় লেখা। সেই ইতিহাস থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা আগে থাকতে জানতে পেরেছিলেন যে এককালে সমুদ্রের মধ্যে ওই কোয়েলাকান্থদের বাস ছিলো। কিন্তু সে-আজ প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগেকার কথা। আর তাই, ১৯৩৮ সালে ওই পচা-ধ্বসা প্রাণীটিকে পরীক্ষা করে তাঁরা অমন অবাক হয়ে গেলেন—এ যেন সমুদ্রের বুকের মধ্যে এক জীবন্ত ফসিল, পাঁচ কোটি বছর আগেকার পৃথিবী থেকে আজকের পৃথিবীতে চলে এসেছে!

মাছ কিন্তু মাছ নয়

এই কোয়েলাকান্থ-এর রহস্যটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। বুঝতে পারলে, প্রাণিজগতের ইতিহাসের অনেক খবর পেয়ে যাবো।



আজকালকার সাধারণ মাছ



কোয়েলাকান্থ

প্রথমত মাছ বলতে আমরা আজকাল যে রকম প্রাণী বুঝি, কোয়েলাকান্থ হুবহু সেই রকমটি নয়। নানান তফাত আছে। আজকালকার মাছের উপর দিকে একটি পাখনা, কোয়েলাকান্থ-এর পিঠে দুটো পাখনা। নিচের দিকে অবশ্য আজকালকার মাছেরও দুটো পাখনা, কোয়েলাকান্থ-এরও দুটো পাখনা; কিন্তু কোয়েলাকান্থ-এর পাখনাগুলো শরীরের উপর ঢিবি-ঢিবি উঁচু জায়গায় বসানো, ঢিবির তলায় হাড় আছে। আজকালকার মাছদের পাখনার নিচে ঢিবি জায়গা আর তার তলায় হাড়—এ-সব নেই। তাছাড়া আরো একটা তফাত হলো, কোয়েলাকান্থ-এর দেহে আর-একটি অঙ্গ আছে, যাকে কিনা এক রকম আদিম ফুসফুসের চিহ্ন-ই বলা যায়। এরকম ফুসফুস ধরনের কোনো অঙ্গের পরিচয় আধুনিক মাছদের শরীরে নেই।

এই সব তফাতগুলোর কথা খুবই জরুরি। এগুলো থেকেই বুঝতে পারা যায় যে কোয়েলাকান্থ হলো এমন এক যুগের প্রাণী—বা, এমন এক যুগের প্রাণীদের বংশধর—যে-যুগ বরাবর কিনা পৃথিবীর বুকে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। পরমাশ্চর্য ঘটনাটি হলো, পৃথিবীতে জলচর ছাড়াও উভচর,—এবং উভচরের পর ক্রমশ স্থলচর—প্রাণীর আবির্ভাব। এসব কথা কেন বুঝতে পারা যায় ? একটু বড়ো করে ব্যাখ্যা করতে হবে।

জলচর, উভচর আর স্থলচর

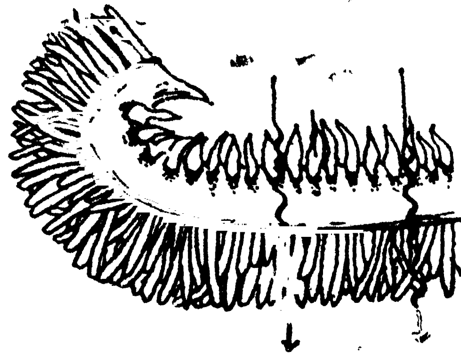
প্রথমত, ফুসফুসের কথাটাই ভেবে দেখা যাক।

একটা মাছকে জল থেকে তুলে ডাঙায় ছেড়ে দিলে কী হবে ? খাবি খেতে-খেতে মাছটা মরে যাবে। কিন্তু কেন ? আমরা—মানুষেরা—তো দিব্বি ডাঙায় বেঁচে থাকি। আর শুধু মানুষই বা কেন ? আরো কতো রকম পশুপাখিই তো ডাঙায় বেঁচে থাকে—

ডাঙায় ছেড়ে দিলে খাবি খেতে-খেতে মরে যায় না! তা যায় না। তার কারণ, এইসব পশুপাখিদের শরীরের মধ্যে ফুসফুস বলে একটি অঙ্গ আছে—মাছেদের শরীরের মধ্যে ফুসফুস নেই। ফুসফুস দিয়ে কী হয়? হাওয়া থেকে অক্সিজেন যোগাড় করা হয়। অক্সিজেন না পেলে কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। আমরা শ্বাস নি—অর্থাৎ কিনা পৃথিবী থেকে বুক ভরে হাওয়া টেনে নি; এই হাওয়ার মধ্যে অক্সিজেন আছে আর আমাদের বুকের মধ্যে আছে হাওয়া থেকে অক্সিজেন ছেঁকে নেবার একটি যন্ত্র—তারই নাম ফুসফুস। মাছদের ফুসফুস নেই। মাছরা তাই হাওয়া থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে না। ডাঙায় তুললে মরে যায়।

কিন্তু জলের মধ্যে থাকবার সময়ে মাছরা তো মরে না! কী করে বাঁচে? অক্সিজেন ছাড়াই চলে নাকি? নিশ্চয়ই নয়। আসলে, জলের মধ্যে থাকবার সময় ওরা অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে বলেই বেঁচে থাকে। কিন্তু কী করে ওরা জলের মধ্যে থাকার সময় এই অক্সিজেন সংগ্রহ করে? কানকো দিয়ে। মাছদের মাথার দু পাশে দুটি কানকো আছে। এই কানকো দুটি ভারি অদ্ভুত অঙ্গ। জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়াবার সময় মাছেরা ক্রমাগতই হাঁ করে-করে মুখের মধ্যে জল পুরে নেয় আর এই জল তাদের মাথার দুপাশের কানকো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। আর এমনই আশ্চর্য অঙ্গ এই কানকো যে এর মধ্যে দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার সময় জলের সঙ্গে মেশানো অক্সিজেনটুকু মাছদের শরীরের জন্যে যেন ছেঁকে আলাদা হয়ে যায়।

মাছরা জলচর—ওরা জলে বাঁচে, কেননা ওদের কানকো আছে। আমরা হলাম স্থলচর—আমরা ডাঙায় বাঁচি, কেননা আমাদের ফুসফুস আছে। এছাড়াও আমরা আর-এক রকম প্রাণী



মাছের কানকো

দেখি—তারা জলেও বাঁচে স্থলেও বাঁচে, তাদের বলে উভচর। যেমন আজকালকার ব্যাঙ ; যেমন আজকালকার স্যালামান্ডার।

কিন্তু আমরা যদি কোনোমতে কয়েক কোটি বছর আগেকার পৃথিবীটিকে দেখতে পেতাম তাহলে স্থলচর বলে কোনো প্রাণীই আমাদের চোখে পড়তো না। আমরা যদি তার চেয়েও আরো আগেকার পৃথিবীতে চলে যেতে পারতাম তাহলে এমনকি উভচর বলেও কেউ আমাদের চোখে পড়তো না। তার মানে, তখনকার পৃথিবীতে প্রাণী বলতে শুধুমাত্র জলচরই। আর তাই তখনকার পৃথিবীতে কোনো প্রাণীর শরীরেই ফুসফুস বলে ওই অঙ্গটির চিহ্ন নেই!

কিন্তু পৃথিবীর অবস্থাটা বরাবরই এক রকমের নয়। পাঁচ-সাত কোটি বছর আগে এমন কাণ্ড ঘটতে শুরু করলো যে ফুসফুস বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কানকোর উপর নির্ভর করে বাঁচাই দুর্ঘট হয়ে দাঁড়ালো। কী হলো? পৃথিবীর আবহাওয়াটা ভয়ানক অশান্ত হয়ে উঠলো। যখন অনাবৃষ্টি তখন এমনই সাংঘাতিক অনাবৃষ্টি যে সমুদ্রও বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। ফলে অনাবৃষ্টির সময়ে জলচরের দল পালে পালে মরতে শুরু করলো।

প্রাণীরা কিন্তু অমন সহজে মরতে চায় না। বাঁচবার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম করে। অর্থাৎ কিনা, জীবজগতের এমনই নিয়ম যে প্রাণীরা অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যে-করে-হোক নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। সবাই অবশ্য তা পারে না। যারা পারে না তারা মরে যায়। কিন্তু কোনো কোনো দল প্রাণী তা পারে। যারা পারে তারা কী করে পারে? নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে বাঁচবার জন্যে তাদের শরীরে এমনকি নতুন অঙ্গ গজাতে শুরু করে। আর শেষ পর্যন্ত এই নতুন অঙ্গের জোরেই তারা বেঁচে যায়।

এইভাবেই সেই আদিম যুগে অনাবৃষ্টির সংকটের সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে একদল জলচর প্রাণীর দেহে পরিবর্তন দেখা দিতে লাগলো। কী রকমের পরিবর্তন? নানান রকম। প্রথমত, তাদের দেহে ফুসফুস বলে একটি নতুন অঙ্গ গজাতে শুরু করলো। এ-ফুসফুস নিশ্চয়ই আজকালকার স্থলচর প্রাণীদের আধুনিক ফুসফুসের মতো নয়; তবুও তা এক রকম আদিম ফুসফুসই। তাছাড়া প্রথমটায় ফুসফুস গজাবার সঙ্গে সঙ্গে যে কানকো উপে গেলো তাও নয়; কানকোও রইলো, ফুসফুসও হলো। অর্থাৎ কিনা অনাবৃষ্টির ফলে সমুদ্র শুকিয়ে গেলেও বাঁচবার একটা ব্যবস্থা রইলো—শুকনো জমিতে ওই ফুসফুসের সাহায্যেই অক্সিজেন সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু আরো তো সমস্যা আছে। জলের মধ্যে না হয় পাখানা নেড়ে-নেড়ে ঘোরাফেরা করা যায়; কিন্তু জলের জীবন ছেড়ে আসবার জন্যে পা লাগে, কিংবা পাখির ডানা লাগে। তাহলে, সেই আদিম যুগের মাছদের শরীর বদলাতে বদলাতে শুধুমাত্র ফুসফুস গড়ে উঠলেই চলবে না: মাছদের পেটের দিকের পাখনা বদলে পা কিংবা পিঠের দিকের পাখনা বদলে পাখির ডানা গজানো দরকার।

ফুসফুস। পা। ডানা। শেষ পর্যন্ত সবই দেখা দিলো। কিন্তু দু-চার বছরের মধ্যেই নয়। এমনকি, দু-চার শো বছরের মধ্যেও নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে বংশের পর বংশ উত্তীর্ণ হয়ে সেই আদিম মাছদের শরীর বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত তারা এমন জীবজন্তু হয়ে গেলো যাদের দেহে আর কানকো নেই—কানকোর বদলে ফুসফুস। আর তাদের শরীরে গজালো মাছের পাখনার বদলে ডাঙায় চলবার দুজোড়া করে পা—কোনো কোনো দলের আবার দুজোড়াই পা নয়, একজোড়া পা আর একজোড়া পিঠের ডানা।

এরাই হলো পরের যুগের স্থলচর প্রাণী।

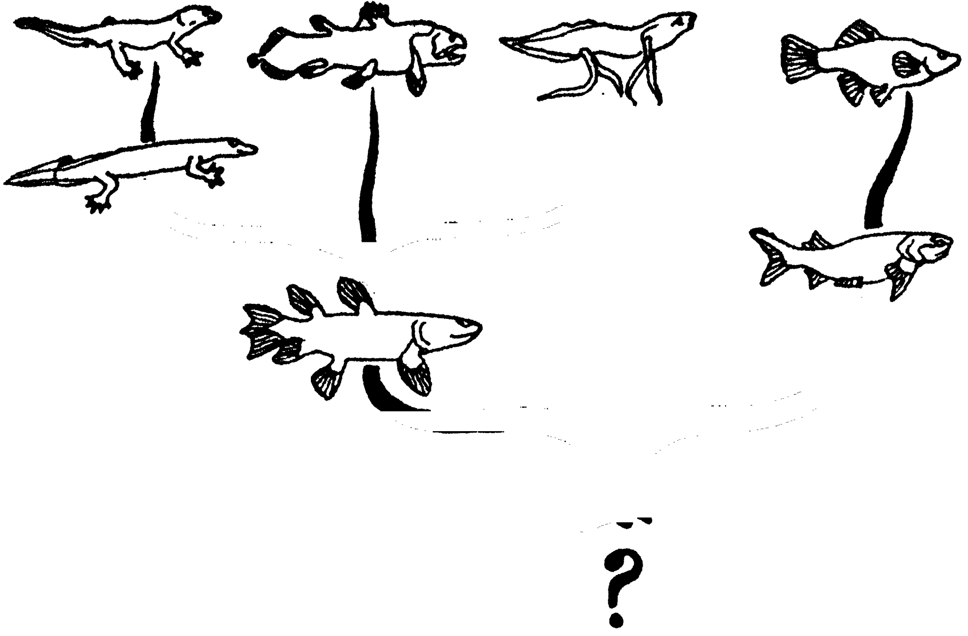
কিন্তু এইখানে আর-একটা কথা মনে রাখতে হবে। আদিম যুগের জলচর প্রাণী বদলাতে-বদলাতে একবারে একলাফে স্থলচর-প্রাণী হয়ে যায় নি। মাঝখানে আর-একটা স্তর আছে। তারই নাম উভচর। উভচর দশায় জলেও বাঁচা সম্ভব, কিন্তু শুধুমাত্র জলের উপর নির্ভর করেই বাঁচা নয়।

এইবারে আমরা ওই কোয়েলাকান্থ-এর রহস্যটা ভালো করে বুঝতে পারবো।

কোয়েলাকান্থ-এর রহস্য

কোয়েলাকান্থ-এর রহস্য বুঝতে হলে কয়েক কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর অবস্থাটা মনে রাখতে হবে—সেই যখন জলচর প্রাণীদেরই কোনো কোনো বংশধরের দল বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে, ক্রমশ উভচর প্রাণীতে পরিণত হতে চলেছে।

ওই বদলের ইতিহাসকে সহজ করে আর ছোটোর মধ্যে বোঝবার আশায় এইখানে একটা ছবি দেওয়া গেলো; ছবিটাকে ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে।



সব-নিচে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে মাছদের সব-পুরোনো পূর্বপুরুষ বোঝানো হয়েছে; চেহারা কেমন ছিলো কে জানে! তারই বংশধরদের মধ্যে ডানদিকে যে শাখা বেরুলো শেষ পর্যন্ত তারই শেষে আধুনিক মাছ। বাঁদিকে ঢিবি-পাখনা-ওয়ালা মাছ আর তার তিন রকম বংশধর: (১) স্যালামাণ্ডার ও উভচর, (২) কোয়েলাকান্থ, (৩) আফ্রিকার ফুসফুস-মাছ।

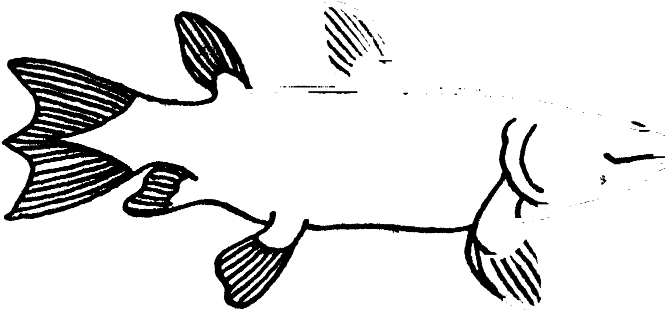
আগে ছিলো এক রকম আদিম জলচর প্রাণী; আজকালকার মাছ আর পরের যুগের সমস্ত উভচরই এদের বংশধর। তাদের চেহারা কী রকমের ছিলো তা আর ছবিতে আঁকবার চেষ্টা করা হয়নি; তার বদলে শুধু একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে।

তারপর, ছবিতে দেখানো হয়েছে, সেই আদিম জলচরদের বংশধরেরাই কী ভাবে ছুটি আলাদা পথে, আলাদা-আলাদা ভাবে বদলাতে-বদলাতে,—আলাদা-আলাদা রকমের প্রাণীতে পরিণত

হয়েছে। কী রকম আলাদা-আলাদা পথ? ছবিতে প্রধানত দু রকম পথ দেখানো হয়েছে :

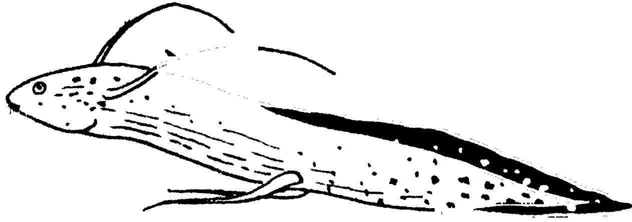
এক : একদিকের পরিবর্তনের ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে আজকালকার সাধারণ মাছ—অর্থাৎ আধুনিক মাছ। আধুনিক মাছ অবশ্য সবই একরকমের নয়; কিন্তু সমস্ত আধুনিক মাছেরই মোটের উপর একটি বিষয়ে মিল আছে। এরা আজো নিছক জলচর। এদের দেহে ফুসফুস বলে অঙ্গ নেই। কানকোর সাহায্যে জলের সঙ্গে মেশানো অক্সিজেনটুকু ছেঁকে নিয়েই এরা প্রাণধারণ করে। আর তাইজন্যেই, ডাঙায় ছেড়ে দিলে এরা খাবি খেতে-খেতে মরে যায়।

দুই : দ্বিতীয় পথের পরিবর্তনটা আরো জটিল। এই দ্বিতীয় পথটিতে পরিবর্তনের ফলে প্রথম স্তরে যে-মাছের ছবি আঁকা হয়েছে ইংরেজীতে তাদের বলে লোব্-ফিন্ড্ ফিশ—কেননা, তাদের পাখনাগুলো শরীরের উপরকার ঢিবি-মতো উঁচু-উঁচু জায়গার উপর বসানো, শরীরের এইরকম ঢিবি-মতো উঁচু জায়গাকেই ইংরেজীতে বলে লোব্। এই ঢিবিগুলির মধ্যে হাড় গজাবার পরিচয় আছে—ওই ঢিবি-পাখনাগুলিই বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত আদিম যুগের উভচর প্রাণীদের পা হয়ে



আদিম ঢিবি-পাখনা-ওয়ালা মাছ—ইংরেজিতে বলে lobe-finned fish.

গিয়েছিলো। এই ঢিবি-পাখনা-ওয়ালা মাছদের শরীরে আর একটি আশ্চর্য অঙ্গ হলো আদিম ফুসফুস। কানকোও রইলো, আদিম ফুসফুসও দেখা দিলো। ফলে, তাদের বংশধর যে-উভচরের দল তাদের পক্ষে জল আর স্থল দু জায়গাতেই বাঁচা সম্ভবপর হলো। ছবিতে দেখানো হয়েছে ওই ঢিবি-পাখনা-ওয়ালা মাছদের বংশধরেরা একদিকে কী ভাবে উভচর প্রাণীতে পরিণত হলো। তাছাড়াও, ওই ঢিবি-পাখনা-ওয়ালা মাছদের আরো দুরকম বংশধরের ছবি ওইখানে দেওয়া হলো। এক রকমের বংশধর আমাদের ওই কোয়েলাকান্থ। আর-এক রকম বংশধর হলো আফ্রিকায় পাওয়া এক অদ্ভুত ধরনের মাছ : এদের শরীরে ফুসফুস রয়েছে, তাছাড়া এদের পাখনাগুলোও অনেকখানি বদলে গিয়েছে!



ফুসফুস-ওয়ালা মাছ—আজো আফ্রিকায় পাওয়া যায়

আফ্রিকায় পাওয়া এই ফুসফুস-ওয়ালা মাছগুলি সত্যিই বড়ো আশ্চর্য প্রাণী। এদের কানকোও আছে, ফুসফুসও আছে—এরা দুভাবেই শরীরের জন্য অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। আর এদিক থেকে বোঝা যায় এরা হলো আদিম যুগের উভচরদের খুব নিকট-আত্মীয় ধরনের। তার মানে, এদের আসল স্থানটা হওয়া উচিত ছিলো অনেক বছর আগেকার পৃথিবীতেই; কিন্তু যে-ভাবেই হোক, এরা আজকের পৃথিবীতেও টিকে রয়েছে।

এদিক থেকে কিন্তু আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো আমাদের ওই কোয়েলাকান্থ। পরের যুগের উভচরেরা যে-আদিম ঢিবি-পাখনা-

ওয়ালা মাছের বংশধর তার সঙ্গে কোয়েলাকান্থ-এর মিল যে কতো-খানি তা ওই ছবি থেকেই বোঝা যায়। তার মানে, ওই কোয়েলাকান্থ-এর আসল স্থান হলো উভচর আবির্ভাব হবার অনেক অনেক আগেকার পৃথিবীতেই। আর উভচরের আবির্ভাব কি আজকের কথা ? বহু কোটি বছর আগেকার কথা। আর তাই, তার চেয়েও আরো অনেক বছর আগেকার প্রাণী হলো আমাদের ওই কোয়েলাকান্থ !

তাহলে, আজকের দিনের পৃথিবীতেও দু-একটা ওই কোয়েলা-কান্থ-এর পরিচয় পেলে বৈজ্ঞানিকেরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবেন না কেন ?

ক্রমবিকাশের কথা

কোয়েলাকান্থ-এর রহস্য বোঝাতে গিয়ে অনেক কথাই বলতে হলো। কথাগুলো হয়তো বড়ো বেশি সহজ করেই বললাম। কিন্তু সত্যিই অমন সহজ কথা নয়। এ-নিয়ে ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

একটা কথা ভেবে দেখা যাক। আমরা বললাম, অনেক কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণী বলতে শুধুই জলচর—স্থলচর নেই, এমনকি উভচরও নেই। ওই জলচর প্রাণীদের কোনো কোনো বংশধরেরাই অনেক যুগ ধরে বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে, ক্রমশ উভচর প্রাণীতে পরিণত হলো। তারপর, সেই উভচর প্রাণীদেরই কোনো কোনো বংশধরেরা অনেক যুগ ধরে বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে স্থলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এ-সব কথার তাৎপর্য বড়ো গভীর নয় কি ?

ধরা যাক, আজকালকার পশুপাখির কথা। কতো রকমেরই না পাখি, কতো রকমেরই না পশু আজকের পৃথিবীতে আমাদের

চোখে পড়ে। কয়েক কোটি বছর আগেকার পৃথিবীতে এদের কারুরই কোনো চিহ্ন ছিলো না। মানুষ ছিলো নাকি? নিশ্চয়ই নয়। মানুষ তো একরকমের স্থলচর প্রাণীই। স্থলচরদের মধ্যে এই মানুষ হলো নেহাতই কম-বয়সী বা আধুনিক প্রাণী—তার মানে, অন্য স্থলচরদের তুলনায় মানুষ দেখা দিয়েছে অনেক পরে।

তার মানে, আজকের দিনে পৃথিবীতে আমরা যে এতো রকমের জীবজন্তু পশুপাখি দেখতে পাচ্ছি, আগেকার পৃথিবীতে এদের কারুরই পরিচয় ছিলো না। এর বদলে ছিলো একেবারে অন্য-ধরনের সব প্রাণী, তারও আগে আরো অন্য ধরনের প্রাণী। আমরা যদি কোনোমতে পাঁচ-সাত কোটি বছর আগেকার পৃথিবীটিকে দেখতে পেতাম তাহলে সে-পৃথিবীতে আমাদের চেনাজানা—অর্থাৎ কিনা আধুনিক পৃথিবীর—কোনো একরকম জীবজন্তুর চেহারাও আমরা খুঁজে পেতুম না। তার বদলে সে-পৃথিবীতে একেবারে অদ্ভুত ধরনের অচেনা প্রাণীদের বাস! আরো পিছন দিকে যেতে পারলে আরো অচেনা প্রাণী, তারও পিছন দিকে যেতে পারলে তার চেয়েও অচেনা।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার শুধু ওইটুকুই নয়। এর চেয়ে ঢের বড়ো বিস্ময়ের কথা রয়েছে। আজকের দিনের এই যে-সব এতো রকমের প্রাণী, এগুলি সবই হলো আগেকার কালের অন্য রকম প্রাণীদের বংশধর। ধরা যাক, আজকের দিনের পাখি। এ-পাখি পৃথিবীতে কী করে এলো? বাইরে থেকে উড়ে আসেনি। তার বদলে এ-পাখি হলো আগেকার কালের অন্য কোনো রকম প্রাণীর বংশধর। সেই অন্য রকম প্রাণীটি কে? আরো আগেকার কোনো রকম প্রাণীর বংশধর। আজকালকার পাখির পূর্বপুরুষকে খুঁজে পাবার জন্যে আমরা যদি ক্রমাগতই পিছু হটতে-হটতে আদিম যুগের দিকে ফিরে যেতে পারি তাহলে কয়েক কোটি বছর

পার হয়ে আমরা পৌঁছে যাবো ওই ঢিবি-পাখনা-ওয়ালা মাছদের যুগে। তার মানে, ওই রকম অদ্ভুত মাছই হলো আজকালকার পাখির পূর্বপুরুষ—তার সেই পিঠের উপরকার পাখনা জোড়া বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত আজকালকার পাখির ডানা হয়ে গিয়েছে, তার পেটের দিকের পাখনা জোড়া বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত আজকালকার পাখির পা হয়ে গিয়েছে! আরো বিস্ময়ের কথা হলো এই যে আমাদের নিজেদের,—অর্থাৎ মানুষদের,—পূর্ব-পুরুষকে খোঁজ করবার আশায় আমরা যদি এইভাবেই পিছু হটতে থাকি তাহলেও ওই কয়েক কোটি বছর পেরিয়ে গিয়ে খুঁজে পাবো ঠিক একই প্রাণীকে। সেই ঢিবি-পাখনা-ওয়ালা মাছই আজ-কালকার পাখির মতো আজকালকার মানুষদেরও আদিম পূর্বপুরুষ —তাদের পিঠের দিকের পাখনা-জোড়া বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত আজকালকার মানুষদের হাত হয়ে গিয়েছে, তাদের পেটের দিকের পাখনা-জোড়া বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত আজকালকার মানুষের পা হয়ে গিয়েছে।

তাহলে এদিক থেকে আজকালকার পাখি আর আজকালকার মানুষ—দুয়ের মধ্যে একটা খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে! অথচ, আজকের দিনে কোথায় পাখি আর কোথায় মানুষ—দুয়ের মধ্যে কোথায়ই বা মিল? এমনিতে তো কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মিল আছে। একটু পরে সেই মিলের কথা বলবো।

আপাতত, পূর্বপুরুষদের কথাটা দেখা যাক। আজকালকার পাখি আর আজকালকার মানুষ—দুইই হলো সেই আদিম যুগের ঢিবি-পাখনা-ওয়ালা মাছের বংশধর। কিন্তু পূর্বপুরুষদেরও পূর্ব-পুরুষ থাকে। তাহলে, ওই অদ্ভুত আদিম মাছদের পূর্বপুরুষ কে?

আরো আদিম এক রকমের প্রাণী। তার পূর্বপুরুষ? আরো আরো আদিম এক রকমের প্রাণী। এইভাবে পূর্বপুরুষদের সন্ধানে আমরা যদি আরো অনেক অনেক কোটি বছর পেছিয়ে যেতে পারি তাহলে এক জায়গায় পৌঁছে আমরা এমন এক অদ্ভুত জিনিসের পরিচয় পাবো যাকে না বলা যায় উদ্ভিদ না প্রাণী—অর্থাৎ যা থেকেই কিনা একাধারে গাছগাছড়া আর জীবজন্তু দুয়েরই আবির্ভাব হয়েছে। তার মানে, খুবই আদিম যুগের কথা ভাবতে পারলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের সঙ্গে—অর্থাৎ, মানুষদের সঙ্গে—এমনকি এই গাছগাছড়াদেরও একটা আত্মীয়তা আছে। এ-ভাবে ভাবতে গেলে খুবই অবাক লাগে না কি?

এইবার পুরো কথাটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

আজকের দিনে পৃথিবীতে আমরা এই যে সব এতো রকমের গাছগাছড়া, জীবজন্তু আর পশুপাখি দেখছি এগুলির কোনোটাই চিরকাল ধরে পৃথিবীর বুকের উপর এইভাবে ছিলো না। অনেক কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে অনেক রকম অদল-বদল হতে-হতে শেষ পর্যন্ত নেহাতই যেন আধুনিক কালে এতো সব রকমারি গাছগাছড়া আর পশুপাখির আবির্ভাব হয়েছে। জীবজগতে এই যে জটিল পরিবর্তন—যে পরিবর্তনের ফলে যুগের পর যুগ ধরে নানান দিকে নানান রকম নতুন জীবের আবির্ভাব ঘটে চলেছে—এরই নাম হলো জীবজগতের ক্রমবিকাশ।

পৃথিবীর বুকে কী করে মানুষের আবির্ভাব হলো? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তাই ক্রমবিকাশের কথা বুঝতে হবে। আমরা এখানে ক্রমবিকাশসংক্রান্ত কয়েকটি কথা আলোচনা করবো।

এক : ক্রমবিকাশের প্রমাণ কী?

দুই : ক্রমবিকাশের কারণ কী?

তিন : ক্রমবিকাশের ফলে কী করে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে?

ক্রমবিকাশের প্রমাণ কী?

প্রথমত ফসিল। পাললিক পাহাড় আর ফসিলের কথা আগেই বলেছি। এইখানে আর একবার ছোঁটোর মধ্যে সেই কথাগুলি মনে করে নেওয়া যাক।

গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র প্রতি বছর ১০২০৬০০০০০০ মন করে পলিমাটি বয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের বুকের মধ্যে। সেই সঙ্গে বয়ে চলেছে নানা রকম গাছগাছড়া আর জীবজন্তুর দেহাবশেষ। এগুলি কোন সময়কার বা কোন যুগের গাছগাছড়া আর জীবজন্তু? এ-যুগের—অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর। দু শো কোটি বছর আগেকারও হতে পারে না, দু শো কোটি বছর পরেরও হতে পারে না। ওই পলিমাটিই একদিন সমুদ্রের বুকের ভিতর জমাট হয়ে পাথরের একটা স্তর হয়ে যাবে আর যে-সব গাছগাছড়া কিংবা জীবজন্তুর দেহাবশেষ আজ এই পলিমাটির সঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে জমা হচ্ছে তার মধ্যে কোনো কোনোটি ওই পাথরের স্তরের মধ্যে নিজেদের চিহ্ন রেখে দেবে। সেগুলিই হলো ভবিষ্যতের ফসিল। আর এইভাবে সমুদ্রের ভিতরে পাথরের স্তরের উপর পাথরের স্তর জমতে-জমতে গড়ে উঠবে এক পাললিক পাহাড়।

ঠিক কতো দিন পরে একটি নতুন পাললিক পাহাড় গড়ে উঠবে তা অবশ্য আমরা জানি না। আমরা শুধু এটুকু কথা খুব স্পষ্ট ভাবেই জানতে পারলাম যে ভবিষ্যতের সেই পাললিক পাহাড়টির কোনো এক বিশেষ স্তরে আমাদের গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র আমাদের যুগের গাছগাছড়া আর জীবজন্তুর কাহিনী অমর করে রাখবার আয়োজন করলো।

ঠিক একই ভাবে, ভবিষ্যতের ওই পাললিক পাহাড়টির এই স্তরটির নিচের স্তরেও কোনো কোনো জীবজন্তু আর গাছগাছড়ার



পাললিক পাহাড়ের নানান স্তরের ফসিল—অর্থাৎ
নানান যুগের প্রাণীদের কাহিনী

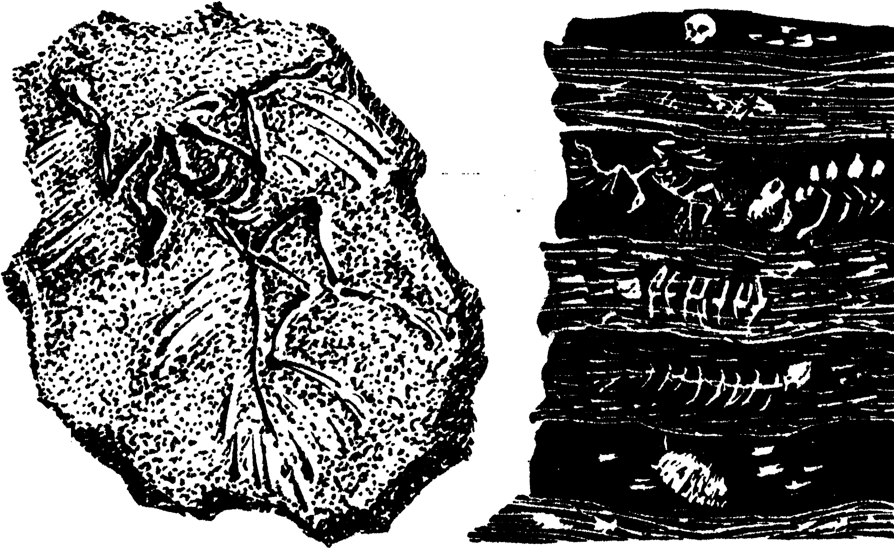
স্মৃতিচিহ্ন অমর হয়ে থাকবার কথা, আবার এই স্তরটির উপরের স্তরেও কোনো কোনো গাছগাছড়া আর জীবজন্তুর স্মৃতিচিহ্ন অমর হয়ে থাকবার কথা। নিচের স্তরে কোন যুগের জীবের স্মৃতি? নিশ্চয়ই অতীত যুগের জীবের স্মৃতি। কেননা অতীত নদীরা যে-পলিমাটি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তা থেকেই পাললিক পাহাড়ের ওই নিচের স্তরটির সৃষ্টি এবং নদীদের পক্ষে অতীত যুগে নিশ্চয়ই অতীত যুগের জীবদের দেহই পলিমাটির সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর। আর আমাদের ওই পাললিক পাহাড়টির উপরের দিকের স্তরে যে-সব জীবের স্মৃতিচিহ্ন ফসিল হয়ে থাকবে সেগুলি নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ-যুগের জীব; কেননা যে-পলিমাটি থেকে পাললিক পাহাড়ের ওই স্তরটি সৃষ্টি হবে সেই পলিমাটি ভবিষ্যতে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে জমবে এবং তার সঙ্গে তাই ভবিষ্যতের জীবদেরই দেহাবশেষ ভেসে যাওয়া সম্ভব।

এবার ভেবে দেখা যাক একজন ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকের কথা, যিনি কিনা ভবিষ্যতের ওই পাললিক পাহাড়টিকে পরীক্ষা করবেন। ধরা যাক, এই পাললিক পাহাড়টির বিভিন্ন স্তর গড়ে উঠতে কতো বছর করে সময় লেগেছিলো তার হিসেব তিনি করতে শিখেছেন। অর্থাৎ কিনা, তিনি জানেন এই পাললিক পাহাড়টির কোন স্তরের বয়েস কতো। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ওই সব বিভিন্ন স্তরের ফসিল-গুলি দেখতে-দেখতে এ-কথাও বলে দিতে পারবেন, কোন যুগে পৃথিবীতে কোন গাছগাছড়া আর কোন জীবজন্তুর পরিচয় ছিলো।

হয়তো তিনি আজ থেকে দু হাজার কোটি বছরকার পরের বৈজ্ঞানিক। তাঁর পক্ষে এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীটিকে চোখে দেখবার কথাই ওঠে না। তবুও তিনি ওই ফসিলের প্রমাণ থেকেই জানতে পারবেন বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে কোন ধরনের গাছগাছড়া ছিলো, কোন ধরনের জীবজন্তু ছিলো, মানুষগুলোকেই

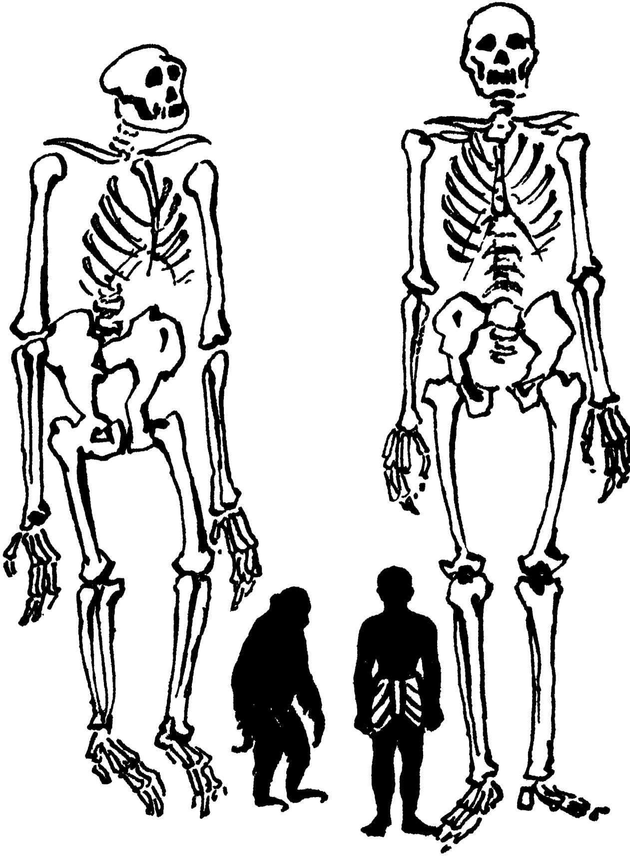
বা কী রকম দেখতে ছিলো—কেননা ক্রমবিকাশের দরুন দু হাজার কোটি বছর পরে মানুষের চেহারাও নিশ্চয়ই দারুণ বদলে যাবে। মানুষকে, কিংবা মানুষ বদলে আরো উঁচু ধরনের যে প্রাণীটি তখন দেখা দেবে, তাকে—কী রকম দেখতে হবে এখন থেকে সে-কথা ভেবে অবশ্য লাভ নেই।

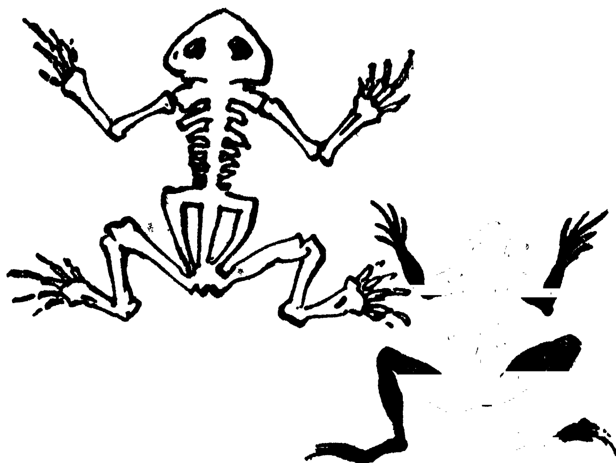
এবার ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকের কথা ছেড়ে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকের কথা ভাবা যাক। তাঁর সামনে পাললিক পাহাড় রয়েছে—সেইসব পাললিক পাহাড়ের নানান স্তর, নানা স্তরে নানা রকম গাছগাছড়া আর জীবজন্তুর ফসিল। কোন স্তরের কতো বয়েস তা হিসেব করবার উপায় তাঁর জানা আছে। আর তাই তিনি বলে দিতে পারছেন যে-সব গাছগাছড়া, পোকামাকড় আর জন্তুজানোয়ারের চিহ্ন পাথরের মধ্যে জমানো রয়েছে ওগুলির মধ্যে কোনটি কোন যুগের জীব।



ফসিলটা কোন স্তরে পাওয়া গিয়েছে তারই হিসেব থেকে বোঝা যায় কোন যুগের জীবের চিহ্ন

মিল আছে। এমনি বাইরে থেকে মিল আমাদের চোখে ধরা পড়ে না; কিন্তু খুব ভালো করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছেন বলেই বৈজ্ঞানিকদের চোখে সে-মিল ধরা পড়েছে। এখানে দুরকম মিলের নমুনা দেওয়া গেলো। এক: ভ্রূণ অবস্থায়,—অর্থাৎ কিনা জন্মাবার আগে ডিমের মধ্যে বা মার পেটের মধ্যে থাকবার অবস্থায়,—বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কী আশ্চর্য মিল তা ৫২ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। দুই: শরীরের ভেতরের কঙ্কালগুলির গড়নের দিক থেকে মিল। এ-মিলও কম বিস্ময়কর নয়! কোথায় মানুষ আর কোথায় সিম্পাঞ্জী আর কোথায়





ব্যাঙ—তবুও এদের কঙ্কালে কী আশ্চর্যই না মিল! কোথায় মানুষের হাত আর কোথায় পাখির ডানা—তবুও ভেতরকার হাড়ের গড়ন পরীক্ষা করবার সময় মিল দেখে অবাক হতে হয়।

ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা : ডারউইন আর লামার্ক

প্রাণিজগতে এই যে অবিরাম পরিবর্তন ঘটে চলেছে—এর তো একটা ব্যাখ্যা চাই। প্রশ্ন হলো, পরিবর্তন কেন হয়? কেন এক জাতের প্রাণী বদলাতে-বদলাতে অন্য জাতের প্রাণী হয়ে যায়?

এই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করলেন একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম লামার্ক। ১৮০৯ সালে তাঁর মতবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো।



লামার্ক

মতবাদটা কী ?

লামার্ক বললেন, এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে শরীরের অঙ্গের ব্যবহার আর অব্যবহার। কোনো একদল প্রাণী যদি তাদের শরীরের কোনো একটি অঙ্গকে বেশি করে ব্যবহার করতে থাকে তাহলে বংশপরম্পরায় ওই অঙ্গটি বৃদ্ধি পেয়ে চলবে, এবং এইভাবে একটি অঙ্গ বৃদ্ধি পেতে-পেতে শেষ পর্যন্ত তাদের শরীরের চেহারাটাই সম্পূর্ণ বদলে যাবে। অপর পক্ষে তারা যদি শরীরের কোনো একটি অঙ্গের ব্যবহার বন্ধ করে দেয় তাহলে শেষ পর্যন্ত অব্যবহারের ফলে তাদের বংশধরদের শরীর থেকে ওই অঙ্গটি একেবারে মুছে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কয়েকটা নমুনার কথা আলোচনা করলে লামার্ক-এর মতটা বুঝতে সুবিধে হবে। কামারশালে কামার হাতুড়ি পিটে চলেছে; আর এইভাবে ডান হাতটাকে ক্রমাগত ব্যবহার করার দরুনই শক্তিশালী হয়ে উঠছে তার হাতটা। অপরদিকে, কারুর ডান হাতটা যদি পাটা দিয়ে বেঁধে রেখে দেওয়া যায়—যদি মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর এই হাতটিকে সে কোনো ভাবে ব্যবহার না করে—তাহলে দেখা যাবে তার হাতটা শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে, ব্যবহারের ফলে অঙ্গটি বাড়ে, ব্যবহারের অভাবে অঙ্গটির অবনতি হয়। এই ধরনের ঘটনা দেখতে-দেখতেই লামার্ক-এর মনে হয়েছিলো, কোনো এক ধরনের প্রাণী যদি বংশের পর বংশ ধরে ক্রমাগত একটি বিশেষ অঙ্গকে বেশি করে ব্যবহার করতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে ওই অঙ্গটি মস্ত বড়ো আকার ধারণ করেছে এবং তখন বেখাপ্পা রকমের বড়ো ওই অঙ্গটিই এ-প্রাণীর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, তাঁর ধারণায়, পাখিদের পূর্বপুরুষেরা সামনের পা-জোড়াকে ক্রমাগতই ওড়বার চেষ্টায় ব্যবহার করতে শুরু করছিলো আর শেষ পর্যন্ত তাই এই পা-জোড়া বদলে

গিয়ে পাখির ডানা হয়ে গেলো। অপর পক্ষে, লামার্ক-এর ধারণায়, সাপের পূর্বপুরুষেরা তাদের পাগুলোকে ব্যবহার করবার চেষ্টা বন্ধ করলো আর তাই শেষ পর্যন্ত সাপদের শরীর থেকে মুছে গেলো পায়ের চিহ্ন। জিরাফের গলাটা অমন প্রকাণ্ড লম্বা হলো কেন? কেননা, লামার্ক মনে করলেন, তাদের পূর্বপুরুষেরা ক্রমাগতই গাছের উঁচু ডালের দিকে গলাটা এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে চলেছিলো।

লামার্ক-এর এই মতটি শুনতে বেশ লাগে। প্রাণিজগতে যে বিরাট আর জটিল পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার ব্যাখ্যা যদি সত্যিই এমন সহজ হতো তাহলে তো আর কথাই ছিলো না। কিন্তু দুঃখের বিষয় লামার্ক যেভাবে কথাটা বলেছিলেন তার বৈজ্ঞানিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই বললেই চলে। তার প্রধান কারণ হলো, যে-সব দৃষ্টান্তের কথা ভেবে লামার্ক তাঁর এই মতটি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন সেগুলি তাঁর মনগড়া। সাপের বাপ-ঠাকুরদারা পায়ের ব্যবহার বন্ধ করেছিলো বলেই যে তাদের শরীর থেকে পায়ের চিহ্ন মুছে গেলো, কিংবা, জিরাফদের পূর্বপুরুষেরা উঁচু ডালের দিকে ক্রমাগত গলা বাড়াতে শুরু করেছিলো বলেই যে শেষ পর্যন্ত জিরাফদের গলা ও-রকম প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে গেলো—এ-সব কথা মনে করবার সত্যিই কোনো কারণ নেই। কিন্তু তার মানে কি এই যে ব্যবহার আর অব্যবহারের দরুন শরীরের অঙ্গে কোনো তফাত হয় না? সে-কথা বললে ভুল বলা হবে। পায়ের ব্যায়াম করলে পা বলিষ্ঠ হয়, হাতের ব্যায়াম করলে হাত সবল হয়—এ-ধরনের ঘটনা তো আমরা হামেশাই দেখছি। লামার্ক-ও তা দেখেছিলেন। কিন্তু লামার্ক একটি কথা ভেবে দেখেন নি: এইভাবে ব্যায়াম বা ব্যবহারের ফলে একজনের অঙ্গে যে-পরিবর্তন দেখা দিলো সে পরিবর্তন কি তার সন্তানদের মধ্যেও আপনি-আপনিই টিকে

থাকবে বা সঞ্চারিত হবে? আমি ব্যায়াম করে বুকের পাটা বিয়াল্লিশ ইঞ্চি করে ফেললাম; কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমার ছেলেরও বুকের পাটা বিয়াল্লিশ ইঞ্চি হবে। সে যদি ওই রকম চওড়া বুকের পাটা চায় তাহলে তাকে নতুন করে, নিজের চেষ্টায়, এই গুণটি অর্জন করতে হবে—অর্থাৎ একটি প্রাণী চেষ্টা করে নিজের শরীরে যে সব গুণ অর্জন করলো সে গুণ তার সন্তানদের মধ্যে বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হয় না।

এই কথাটা সামান্য জটিল। তাই একটু খুলে বলা দরকার। আসলে, প্রাণীর দেহে দু রকম লক্ষণ আছে। এক, জন্মগত। দুই, অর্জিত। জন্মগত লক্ষণগুলি বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। তাই মানুষের ছেলেপুলেরা মানুষের মতো দেখতে, হাতির বাচ্ছারা হাতির মতো দেখতে। কিন্তু অর্জিত লক্ষণগুলিও কি এইভাবে বংশ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়? লামার্ক-এর মতের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, তা হয় না। কিন্তু এ কথা লামার্ক-এর মতের বিরুদ্ধে গেলো কেন? কেননা, এই কথাটি না মানলে লামার্ক-এর মতটা আর মানা যায় না। ব্যবহার আর অব্যবহারের ফলে প্রাণীর অঙ্গে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা জন্মগত নয়, অর্জিত—লামার্ক-এর ধারণায় এই পরিবর্তনের চিহ্ন নিয়েই ওই প্রাণীর সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করবে আর তারপর তাদের নিজেদের ব্যবহার-অব্যবহারের ফলে পরিবর্তনটাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর? তারপর তাদের যে সন্তানেরা জন্মাবে তারা জন্মাবে এই মোট দু-ধাপ পরিবর্তনের চিহ্ন নিয়েই এবং নিজেদের চেষ্টায় তারা পরিবর্তনটাকে যেন আরো একধাপ বাড়িয়ে দেবে। আবার তাদের সন্তানেরা জন্মাবে এই তিন-ধাপ পরিবর্তন নিয়ে; তারপর নিজেদের চেষ্টায় তারা যেন পরিবর্তনটিকে চতুর্থ ধাপে পৌঁছে দেবে। এইভাবে বদল চলতে-

চলতে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, পূর্বপুরুষদের অঙ্গটি একেবারে বদলে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অঙ্গ দেখা দিলো।

তাহলে, লামার্ক-এর মতটা মানতে গেলে এ কথাও মানতে হয় যে অর্জিত লক্ষণও বংশগত সূত্রে সঞ্চারিত হতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, সে কথা মানবার কোনো উপায় নেই আর তাই লামার্ক-এর মতটিকে মানা যায় না।

কিন্তু লামার্ক-এর মতটা না মানলেও বৈজ্ঞানিকেরা অন্য একটি কারণে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন। কী কারণ? জীবজগতের পরিবর্তনের যে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার এ কথা সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছিলেন লামার্ক। তাঁর ব্যাখ্যাটা গ্রহণযোগ্য না হলেও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাটা খুবই সম্মানযোগ্য। শুধু তাই নয়। লামার্ক-ই সবপ্রথম অনুভব করেন যে প্রাণিজগতের এই যে পরিবর্তন তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বদল হলে তার সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে—নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের নতুন ভাবে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে—প্রাণিদেহের অঙ্গে নানা রকম পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনই জমতে-জমতে শেষ পর্যন্ত আবির্ভাব হয় নতুন ধরনের প্রাণীর। কথাটা যতো সরল ভাবে লামার্ক বলেছিলেন অতো সরল ভাবে বললে অবশ্যই ভুল করা হবে। তবে একথাও উড়িয়ে দেবার মতো নয় যে বংশের পর বংশ ধরে নতুন অবস্থায় নতুন ভাবে শরীরটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে-করতেই প্রাণীদের দেহে নতুন অঙ্গের আবির্ভাব হয় বই কি। তাই বলে, লামার্ক যে-রকম মনগড়া দৃষ্টান্তের কথা ভেবে যেমন সরল ভাবে ক্রম-বিকাশের ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটা ভুল—তার বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই।

আসল কথা হলো, জীবজগতের রহস্য যেমন জটিল তেমনি

বিচিত্র। তাই এ নিয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে অনেক দেখতে হয়, অনেক তথ্য যোগাড় করতে হয়। তার জন্যে কতো অজস্র দৃষ্টান্ত দেখা দরকার—খুঁটিয়ে, ভালো করে, স্পষ্টভাবে দেখা দরকার,—কতো রাশিরাশি তথ্য যে যোগাড় করা প্রয়োজন—তার নমুনা পাওয়া গেলো ডারউইনের রচনায়।

ডারউইন কে? কী বই তাঁর?

চার্লস্ ডারউইন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর যুগান্তকারী বই: দি অরিজিন্ অব্ স্পিসিস্ বাই ন্যাচার্‌যাল সিলেক্‌শন্। এই বইতে ডারউইন প্রাণিজগতে ক্রম-বিকাশের একটা ব্যাখ্যা দিলেন। ব্যাখ্যাটি দেবার জন্যে ডারউইন একটানা আটাশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। নানা দেশ, নানা দ্বীপ ঘুরে তিনি রাশি রাশি তথ্য যোগাড় করেছিলেন আর অত্যন্ত কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে এতো তথ্যকে বোঝবার, গোছাবার, ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তারই ভিত্তিতে তিনি যে-মতবাদটি দাঁড় করালেন সে-মতবাদ শুধুই যে বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলো তাই নয়, সাধারণভাবে মানুষের চিন্তায় যেন যুগান্তর নিয়ে এলো।



ডারউইন

তাই ডারউইনের মতটিকে ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করতে হবে।

ডারউইনের মত : প্রাকৃতিক নির্বাচন

ডারউইন তাঁর মতটির নাম দিয়েছিলেন, ন্যাচার‍্যাল্ সিলেক্‌শন্—বাঙলা করলে দাঁড়ায় প্রাকৃতিক নির্বাচন। মতটির আলোচনায় একে একে কয়েকটি কথা ভালো করে বোঝা দরকার।

এক : জীবজন্তুর যতোগুলি বাচ্চা শেষ পর্যন্ত বাঁচে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি বাচ্চার জন্ম হয়। কয়েকটা হিসেব দেখা যাক। একজোড়া ব্যাঙ—তার মধ্যে মেয়ে ব্যাঙ ডিম পাড়লো। যতোগুলি ডিম সে পাড়লো তার সবগুলি ফুটে যদি ব্যাঙাচি বেরুতো, আর প্রতিটি ব্যাঙাচিই যদি বড়ো হতে পারতো, আর বড়ো হয়ে যদি প্রত্যেকেই নতুন বংশের ব্যাঙদের জন্ম দিতে পারতো—তাহলে পাঁচপুরুষ পরে ওই একজোড়া ব্যাঙেরই বংশধরদের মোট সংখ্যা হতো ৫২০০০০০০০০০০০০০! পৃথিবীতে কতো জোড়া ব্যাঙ আছে? তাদের সবাইকারই যদি এই হারে বংশ বেড়ে যায় তাহলে কি এক হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবীতে শুধু ব্যাঙ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর পক্ষে থাকবার জায়গা হবে?

ব্যাঙদের বেলাতে যে কথা, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর বেলাতেই সেই কথা। কোনো কোনো মাছের বেলায় দেখা যায়, একটি মাছ একসঙ্গে দশ লক্ষ ডিম পাড়ছে। সমস্ত ডিম ফুটেই যদি বাচ্চা বেরুতো আর সব বাচ্চাই যদি বেঁচে থাকতো আর ওই হারে বংশবৃদ্ধি করতো তাহলে কিছু বছরের মধ্যেই ওই মাছের বংশ ছাড়া সমুদ্রের মধ্যে আব তিল ধারণের জায়গা থাকতো না!

হাতিদের খুব কম বাচ্চা হয় আর অনেক দেরি করে-করে হয়। তবুও ডারউইন হিসেব করে দেখলেন যে হাতিদের সব বাচ্চাই যদি বেঁচে থাকতে পারতো তাহলে সাড়ে সাতশো বছরের মধ্যে মাত্র একজোড়া হাতিরই বংশধরদের সংখ্যা হতো এক কোটি নব্বই লক্ষ! কিন্তু হাতিদের বংশ যদি এই হারে বেড়ে চলে তাহলে

এতো হাজার হাজার বছর পরেও পৃথিবীতে হাতি এমন দুর্লভ কেন? তার কারণ, তাদের যতো বাচ্চা হয় তার সবই বাঁচে না —বাচ্চাদের মোট সংখ্যার তুলনায় মাত্র একটি মুষ্টিমেয় সংখ্যা বাঁচতে পায়। আর এইটেই হলো প্রাণিজগতের রহস্য বোঝবার প্রথম কথা। প্রত্যেক প্রাণীর বেলাতেই দেখা যায়, যতোগুলি সন্তান বাঁচতে পারবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সন্তানের জন্ম হচ্ছে।

দুই: বাঁচবার জন্যে সংগ্রামের প্রয়োজন। একটি প্রাণীর যতো বাচ্চা হলো তার মধ্যে বেশির ভাগই মরে গেলো, বাঁচলো মাত্র সামান্য কয়েকটি। এমন কেন হয়? তার কারণ, বাঁচতে পারাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বাঁচতে গেলে খাদ্য চাই, বায়ু চাই, আলো চাই, উপযুক্ত উত্তাপ চাই, শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারা চাই, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির মতো নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সঙ্গে যুঝতে পারা চাই। এতো রকম ব্যবস্থা হলে পর তবেই বাঁচা যাবে। অর্থাৎ কিনা, বাঁচতে গেলে প্রতি পদেই সংগ্রাম করতে হবে—ডারউইন এই সংগ্রামের নাম দিলেন স্ট্রাগল্ ফর্ এক্‌সিস্‌টেন্স।

ডারউইনের তৃতীয় কথা হলো, পার্থক্যের কথা। একই প্রাণীর বিভিন্ন সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যও প্রকৃতির নিয়ম। ধরা যাক, একটা কুকুরের পাঁচটা বাচ্চা হলো। এই পাঁচটি বাচ্চাই কি একেবারে হুবহু একরকমের হবে? নিশ্চয়ই নয়। এমনকি, দুটি বাচ্চাও একেবারে হুবহু একরকমের নয়। প্রতিটির বৈশিষ্ট্য আছে; তার মানে প্রত্যেকটির সঙ্গে বাকিগুলির তফাত আছে, পার্থক্য আছে। একই জাতের অনেকগুলি গাছকে আমরা যদি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করি তাহলে দেখবো প্রত্যেকটিরই স্বাতন্ত্র্য আছে; একই জাতের অনেকগুলি জানোয়ারকে আমরা

যদি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করি তাহলে দেখবো প্রতিটিই অন্যগুলি থেকে কোনো-না-কোনো দিক থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। এই পার্থক্যের পরিচয় হয়তো সাধারণত আমাদের চোখে পড়তে চায় না; কিন্তু আমরা যদি ডারউইনের মতো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে রাজি হই, যদি রাজি হই ডারউইনের মতো নিষ্ঠা নিয়ে দেখতে,—তাহলে তা নিশ্চয়ই আমাদেরও চোখে পড়বে। মনে রাখতে হবে, ডারউইন বীগল্ বলে জাহাজে চড়ে নানান দেশ দেখেছিলেন, নানান্ দ্বীপ ঘুরেছিলেন আর সর্বত্রই তিনি গাছগাছড়া, পোকা-মাকড়, জন্তু-জানোয়ার পরীক্ষা করেছিলেন অসম্ভব নিষ্ঠা নিয়ে, খুঁটিয়ে। আর তাই জন্যেই তাঁর কাছে প্রকৃতির এই নিয়মটি অমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিলো।

ডারউইনের চতুর্থ কথা হলো, সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াবার চেষ্টা। তুষার দেশের গাছগাছড়া আর জীবজন্তু ক্রমাগতই চেষ্টা করে চলেছে হিমশীতল অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে, জলাভূমির জীবেরা ক্রমাগতই চেষ্টা করে চলেছে ওই জলাজায়গার অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে, রুক্ষ মরুভূমির জীবেরা চেষ্টা করে চলেছে সেই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে। এই খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা,—আশপাশের অবস্থার সঙ্গে যুঝে বাঁচবার চেষ্টা—এও নিশ্চয়ই জীবন-সংগ্রামেরই একটা দিক। কেবল মনে রাখতে হবে জীবন-সংগ্রাম বলতে ডারউইনের মতে শুধুমাত্র এইটুকুই নয়। এ-ছাড়াও একই প্রাণীর নিজেদের দলের মধ্যেও একটা সংগ্রাম আছে।

এইবার, ডারউইনের সবকটি কথা একসঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে পারলে আমরা একটি প্রশ্নের জবাব পাবো। যতো প্রাণীর জন্ম হয় তার মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় বাঁচতে পারে, বাকি সকলেই পৃথিবী থেকে

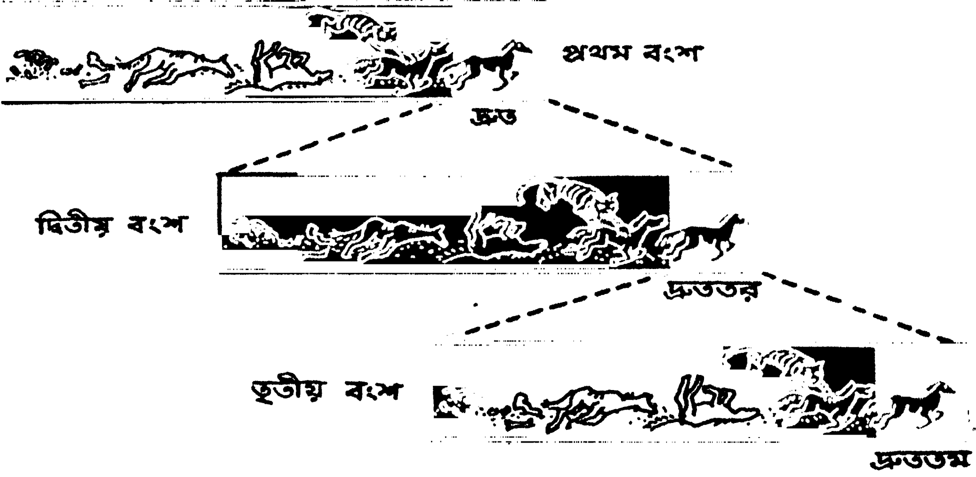
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, যারা বাঁচে তারা কী করে বাঁচে? যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারা কেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? যারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হয় শুধু তারাই বাঁচে; যারা হেরে যায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়। কিন্তু, কারা জয়ী হয়? কারা হেরে যায়? যারা আশপাশের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের ঠিকমতো খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারাই জয়ী হয়; যারা পারে না তারা বাঁচে না। যারা অপরদের সঙ্গে সংগ্রামে বাকি সকলকে হারিয়ে দিয়ে জীবনের রসদটুকু ভালো করে সংগ্রহ করতে পারে তারাই বাঁচে; যারা তা পারে না তারা হেরে যায়, মরে যায়। কিন্তু কেন? একই জাতের প্রাণী, হয়তো একই পিতামাতার সন্তান; কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে কেউ বা ওই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে পারলো, কেউ বা পারলো না—এমন তফাত হয় কেন? কেননা, ডারউইন বললেন, ওই পার্থক্যের কথা, তফাতের কথা। একই জাতের সমস্ত প্রাণী হুবহু একরকমের নয়; একই পিতামাতার সমস্ত সন্তান হুবহু একরকমের নয়। খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যায় প্রতিটি স্বতন্ত্র, প্রতিটিই বিশিষ্ট—বাকি সকলের সঙ্গে প্রতিটির তফাত আছে। তার মানে, প্রত্যেকের মধ্যেই এমন কিছু কিছু লক্ষণ আছে যা আর কারুর মধ্যে নেই। এই ধরনের লক্ষণ বা গুণের মধ্যে কোনো কোনোটি বাঁচবার ব্যাপারে সহায়ক, কোনো কোনোটি তা নয়। ফলে, অনেক সন্তানের জন্ম হলেও সব সন্তানই বাঁচতে পারে না। শুধু তারাই বাঁচে যাদের নিজস্ব, বিশিষ্ট গুণের মধ্যে এমন গুণ থাকে যা কিনা বাঁচবার ব্যাপারে সহায়ক।

এর পর প্রশ্ন হলো, যে নিজস্ব বা বিশিষ্ট লক্ষণের দরুন কয়েকটি প্রাণী বাঁচতে পারলো সেই গুণগুলি তারা পেলো কোথা থেকে? তাদের বাপ-মার কাছ থেকে। অর্থাৎ কিনা, এই গুণগুলি তাদের পক্ষে অর্জিত গুণ নয়, জন্মগত গুণ। আর জন্মগত গুণ বলেই তাদের সন্তানদের মধ্যেও এই গুণগুলি দেখা দেওয়ায় বাধা নেই।

ডারউইন মনে করেছিলেন, তাই দেখা দেয়। তাহলে যারা বাঁচলো তারা যে-গুণ বা লক্ষণের দরুন বাঁচলো সেই গুণ বা লক্ষণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করবে তাদের সন্তানেরা। কিন্তু এই সন্তানদের মধ্যে সকলে হুবহু সমান হবে না; কারুর কারুর মধ্যে আবার নতুন ধরনের কিছু কিছু বাড়তি গুণ থাকবে। এই বাড়তি গুণগুলির দরুন তারা আবার জীবন-সংগ্রামে জিতে যাবে, অন্যেরা পারবে না। আবার এদের যখন সন্তান হবে, তখন সেই সন্তানদের মধ্যে দেখা দেবে তুপুরুষেরই বিশিষ্ট গুণ। এইভাবে প্রাণিজগতে বংশের পর বংশ উত্তীর্ণ হয়ে একই জাতের প্রাণীদের সন্তানদের মধ্যে ক্রমশ বহু—বহু—নতুন আর বিশিষ্ট গুণের সমাবেশ হতে থাকবে। আর তারই ফলে শেষ পর্যন্ত এই প্রাণীটির বংশধরেরা এমন অসম্ভব বদলে যাবে যে তাদের আর যেন পুরোনো-জাতের প্রাণী বলে চেনাই যাবে না। অর্থাৎ কিনা তখন সেই পুরোনো জাতের প্রাণী বদলে পৃথিবীর বুকে দেখা দেবে একেবারে নতুন জাতের একরকম প্রাণী।

ডারউইনের ভাষায়, এই যে পুরো পদ্ধতি—এরই নাম হলো 'ন্যাচারাল্ সিলেক্শন্' বা প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের দরুনই যুগের পর যুগ ধরে পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব হয়ে চলেছে।

প্রাণিজগতের পরিবর্তনের ডারউইন এই যে-ব্যাখ্যা দিলেন,—এ যেন মানুষের চিন্তাজগতে একেবারে যুগান্তর নিয়ে এলো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আজকের যুগের প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই ডারউইনের মতের প্রতিটি কথায় সায় দেন। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আজো এই নিয়ে নানান রকম তর্ক-বিতর্ক চলেছে, চলেছে ডারউইনের মতকে আরো নির্ভুল—আরো নিখুঁত করে নেবার চেষ্টা। বিজ্ঞান মানেই তাই: দিনের পর দিন নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে, প্রকৃতিকে আরো বেশি নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা করে,



প্রাকৃতিক নির্বাচনের মনগড়া ছবি। প্রথম বংশে যাদের মধ্যে 'দ্রুত' বলে বিশিষ্ট লক্ষণ ছিলো শুধু তারাই বাঁচলো—বাকি মরলো। দ্বিতীয় বংশে এদের সব বংশধরই 'দ্রুত' লক্ষণ নিয়ে জন্মালো; কিন্তু তাদের মধ্যে আবার বাড়তি বিশিষ্ট লক্ষণের অধিকারী হিসেবে যারা ছিলো 'দ্রুততর', তারাই বাঁচলো। তৃতীয় বংশের সবাই 'দ্রুততর' লক্ষণ নিয়ে জন্মালেও বিশিষ্ট লক্ষণের অধিকারী হিসেবে যারা ছিলো 'দ্রুততম', শুধু তারাই বাঁচলো। এইভাবে বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত এক অভূতপূর্ব প্রাণীর আবির্ভাব হবে।

স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে চিন্তা করে প্রকৃতির নিয়মকানুনগুলিকে ভালো করে জানা। ফলে, ডারউইনের পর জীবজগতে পরিবর্তনের রহস্য উদ্ঘাটন করবার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা নতুন নতুন গবেষণা করছেন। কিন্তু তবুও জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইন যে-বিপ্লব ঘোষণা করে গিয়েছেন তার বিস্ময় কোনোদিন ম্লান হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ





মানুষ কী করে এলো ?

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কী ভাবে জীবন্ত জিনিস দেখা দিলো— বৈজ্ঞানিকেরা আজো এ-প্রশ্নের একেবারে নিখুঁত জবাব খুঁজে পান নি। অনেক কথা জানতে পারা গিয়েছে, আরো অনেক কথা পরে জানা যাবে। কেননা, বিজ্ঞানের গবেষণা চলেছে, তাই আগামী-কালের বিজ্ঞান পৃথিবীর আরো অনেক রহস্য চিনিয়ে দিতে পারবে।

প্রাণের আবির্ভাব নিয়ে যে-কথা নির্ভুলভাবে জানতে পারা গিয়েছে তারই সামান্য পরিচয় দেবো।

প্রথমত, প্রাণ বা জীবন অলৌকিক কিছু নয়। এই পৃথিবীরই কয়েক রকম জিনিস একসঙ্গে মিশতে-মিশতে, মিশতে-মিশতে শেষ পর্যন্ত জীবন্ত জিনিস হয়ে উঠেছে। যে-জিনিসগুলি মিশে সৃষ্টি হয়েছে জীবন্ত জিনিস সেগুলির নাম কী ? বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় প্রধানত কার্বন; তাছাড়াও ক্লোরিন, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গেনিস, বোরোন,—আরো কয়েক

রকম। বৈজ্ঞানিকেরা এই ধরনের জিনিসগুলিকে বলেন মৌলিক পদার্থ।

মৌলিক পদার্থ মানে কী? একটা তুলনা দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা যায়। ধরা যাক ইংরেজী ভাষার কথা। ইংরেজী ভাষায় কটি অক্ষর? ২৬টি। কতো শব্দ? অজস্র শব্দ—হাজার হাজার। কিন্তু যতো শব্দই থাকুক না কেন, সবই তো ওই ২৬টি অক্ষর দিয়ে তৈরি।

পৃথিবীর জিনিসগুলির বেলাতেও অনেকটা তাই। পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলে আমরা কতো অসংখ্য জিনিস দেখতে পাই: জল, মাটি, কাগজ, কলম, ঘাস, ফুল, কাঠ, কালি, ডিম, দুধ, কতোই না। কিন্তু ইংরেজী ভাষার অতো অজস্র কথা যে-রকম শেষ পর্যন্ত ২৬টি অক্ষর দিয়ে তৈরি তেমনি পৃথিবীর এতো অসংখ্য জিনিসও শেষ পর্যন্ত ৯২টি মূল উপাদান দিয়ে তৈরি। ওই মূল উপাদান-গুলিকেই বলে মৌলিক পদার্থ। আর একাধিক মৌলিক পদার্থ একসঙ্গে মিশে যে-নতুন জিনিস তৈরি করে তাকে বলে যৌগিক পদার্থ। যেমন, ওই ৯২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে দুটির নাম হলো হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে ঠিকভাবে ঠিক পরিমাণে মেশাতে পারলে তৈরি হয় একটি যৌগিক পদার্থ, তার নাম জল।

অনেকটা এইভাবেই কার্বন, ক্লোরিন, আয়োডিন, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি অনেক রকম মৌলিক পদার্থ মিশে তৈরি হয়েছে জীবন্ত জিনিস। তার নাম প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌। এই প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌ দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত গাছগাছড়া, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ—এক কথায়, জীবন্ত বলতে যা-কিছু তাদের সবাইকার দেহই—গড়ে উঠেছে।

সূর্য থেকে পৃথিবী যখন প্রথম ঠিকরে এলো তখন কি পৃথিবীতে প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌ বলে কিছু ছিলো? নিশ্চয়ই নয়। কেননা তখন

শুধু আগুন আর আগুন—সূর্যের মতোই পৃথিবীও দাউদাউ করে জ্বলছে। তারপর ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়েছে পৃথিবীর বাইরের দিকটা আর পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে পাহাড়, সমুদ্র, নদী।

ওই জলের মধ্যেই কয়েক রকম মৌলিক পদার্থের মিশেল হতে-হতে তৈরি হয়েছিলো পৃথিবীর প্রথম প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌। ঠিক কী করে ? ঠিক কতোদিন আগে ? এ-সব প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর এখনো জানা যায় নি। তবে এটুকু জানা গিয়েছে যে সেই আদিম প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌-এর বিন্দুগুলিই পৃথিবীর প্রথম প্রাণী।

স্বচ্ছ, পেছলা, ছোটোখাটো বিন্দুর মতো সেই প্রাণী—এতো ছোটো যে আজকালকার মানুষের চোখে ও-রকম ছোটো জিনিস নজরেই আসে না। আজকালকার মানুষ অতো ছোটো জিনিস দেখবার জন্যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেছে ; এ-যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম জিনিসকেও অনেক বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌-এর ওই তুচ্ছ বিন্দুগুলিকেই আজকালকার মানুষের সবচেয়ে আদিম পূর্বপুরুষ বলতে হবে। শুধু মানুষই বা কেন ? সমস্ত গাছগাছড়া, পশুপাখি, জীবজন্তু, পোকামাকড়—আজকের পৃথিবীতে জীবন্ত জিনিস বলতে যেখানে যা-কিছু ত' সবেরই—আদিম পূর্বপুরুষ বলতে ওরাই, ওই প্রথম প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌-এর বিন্দুগুলিই।

প্রোটোপ্লাস্‌মের এ-হেন এক-একটি বিন্দুকে বলা হয় এক-একটি জীবকোষ। জীবকোষ মানে কী ? জীবদেহের সবচেয়ে সূক্ষ্ম অংশ। যেমন, সমস্ত মাটির পাত্রই শেষ পর্যন্ত মাটির সূক্ষ্ম অংশ দিয়ে গড়া তেমনি আজকালকার সমস্ত গাছগাছড়া আর জীবজন্তুর শরীরই শেষ পর্যন্ত ওই সূক্ষ্ম জীবকোষ দিয়ে গড়া। তবুও মজার কথা এই যে এই জীবকোষগুলির প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে এক-একটি জীব।

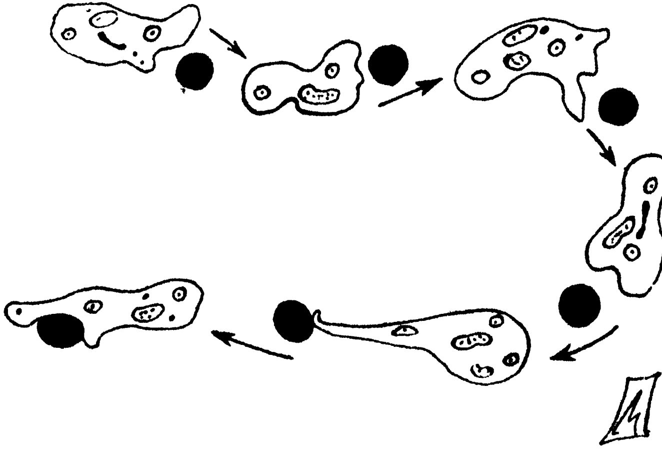
তার মানে, আমাদের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সবকিছুই অসংখ্য জীবকোষ দিয়ে তৈরি, প্রতিটি জীবকোষই আবার স্বতন্ত্র ভাবে এক-একটি জীব। কিন্তু পৃথিবীর সেই যে প্রথম জীব—সেই প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌-এর আদিম বিন্দুগুলি—সেগুলি মোটেই আমাদের শরীরের মতো অনেক জীবকোষের সমষ্টি নয়। তার বদলে আলাদা-আলাদা এক-একটি স্বতন্ত্র জীবকোষ মাত্র।

আশ্চর্য জীব! পুরো শরীর বলতে মাত্র একটি জীবকোষ! কিন্তু আরো আশ্চর্য কথা হলো, আজকের দিনেও পৃথিবী থেকে এ-ধরনের জীব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পানাপুকুরের জল পরীক্ষা করবার সময় আজো আমরা এরকম জীবকে স্বচক্ষে দেখতে পাই। নাম অ্যামিবা। আর এদের দেখেই আমরা আন্দাজ করতে পারি সেই আদিম যুগে সমুদ্রের জলে প্রোটোপ্লাস্‌ম্‌-এর বিন্দু হিসেবে ওই যে প্রথম জীবের আবির্ভাব হয়েছিলো, ওরা কী রকম দেখতে ছিলো, কী ভাবে বাঁচতো।

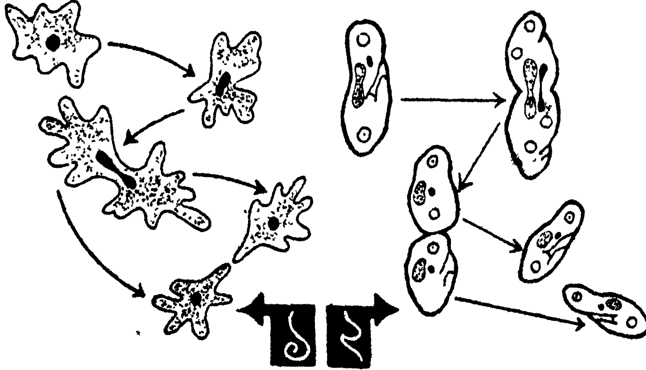
এক-কোষ জীব

অনুবীক্ষণ দিয়ে পানাপুকুরের ওই এককোষ জীবগুলিকে দেখতে ভারি অবাক লাগে। ওদের শরীরের আগোগোড়াই হলো ডিমের স্বচ্ছ অংশের মতোই স্বচ্ছ পেছলা থলথলে এতোটুকু একটি বিন্দুর মতো। তাই আমাদের মতো হাত-পা চোখ-মুখ বলে ওদের শরীরে আলাদা-আলাদা অঙ্গ নেই। বরং ওদের পুরো শরীরটাকেই পা বলতে পারা যায়, আবার পুরো শরীরটাকেই মুখ বলতে পারা যায়, পেটও বলতে পারা যায়। পা কী রকম? এগুবার সময় ওরা নিজেদের শরীরের যে-কোনো অংশকে সামনের দিকে একটুখানি যেন ঠেলে দেয়; এই ঠেলে-দেওয়া অংশটিকে বলে ঝুটো-পা বা সিউডো-পড্‌। তারপর ওদের শরীরের বাকিটুকু যেন গড়িয়ে যায়

ঝুটো-পার দিকে ! আবার যখন একটা খাবারের দানা জোটে তখন ওরা পুরো শরীরটা দিয়ে এঁকেবেঁকে তাল-গোল পাকিয়ে যেন জড়িয়ে ধরে খাবারটুকু আর তারপর কোনোমতে খাবারের দানাটুকু আত্মসাৎ করে নেয় নিজেদের শরীরের মধ্যে। তাই পুরো শরীরটাই যেন মুখ, পুরো শরীরটাই যেন পেট। আবার এদের বাচ্চাও হয় ভারি অদ্ভুত ভাবে : বাইরে থেকে ওই ভাবে



কী করে খায়



বংশবৃদ্ধি

শরীরের মধ্যে খাবার আত্মসাৎ করবার ফলে শরীরটা ক্রমশ বড়ো হয় আর বড়ো হবার পর সেটা আস্তে আস্তে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। তখন একটির বদলে দুটি জীব হয়ে যায়। আর ওই ভাবেই দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি....বেড়ে চলে ওদের বংশ।

হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে জীবন্ত জিনিষ বলতে শুধুমাত্র এই রকম এককোষ-বিশিষ্ট জীবই ছিলো। তারপর ক্রমশ এইসব ছোটো ছোটো জীবগুলি যেন দল পাকাতে শুরু করলো, যেন এক-এক জায়গায় একজোট হতে লাগলো। আর এইভাবেই দেখা দিলো নতুন ধরনের জীব—তাদের শরীর বলতে আর শুধুমাত্র একটি জীবকোষ নয়, একটি জীবকোষের বদলে একদল জীবকোষ মিলে একটি জীবের শরীর তৈরি হলো। এই নতুন ধরনের জীবদের বেলায় দেখা গেলো শরীরের পাঁচ রকম চাহিদা মেটাবার জন্যে কাজের ভার যেন স্বতন্ত্র হয়ে যাচ্ছে—শরীরের কোনো একদল জীবকোষের উপর খাওয়া-দাওয়ার ভার, আর-এক দলের উপর চলা-ফেরার ভার, আর-এক দলের উপর বাচ্চা পাড়ার ভার। আর এইভাবেই ক্রমশ তৈরি হলো সেই ছোট ছোট আদিম জীব থেকে বড়ো বড়ো জীবের শরীর।

আদিম মাছের আবির্ভাব

এইভাবে বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে সেই আদিম এক-কোষ জীব থেকে ক্রমশ নতুন ধরনের জীব দেখা দিতে লাগলো। জলের মধ্যে দেখা দিলো শ্যাওলা আর সবুজ ছোটো উদ্ভিদ। এরা সেই আদিম এক-কোষ জীবেরই বংশধর এবং অপরদিকে এরাই আবার আজকের পৃথিবীর এতোরকম গাছগাছড়ার পূর্বপুরুষ। কোনো কোনো গাছ জলের মধ্যেই থেকে গেলো, কোনো কোনো গাছ ক্রমশ জলের কিনারায় কাদায় আস্তানা গাড়তে শুরু

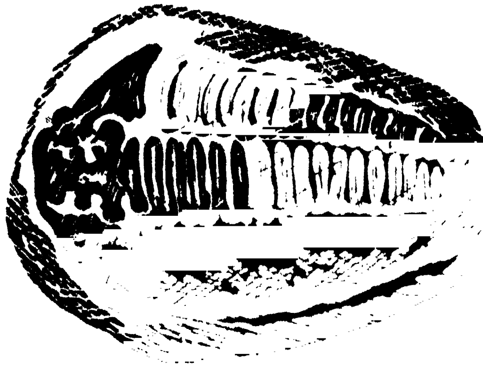
করলো। তখনো কিন্তু পৃথিবীর শুকনো ডাঙা আর পাহাড়-পর্বতগুলি যেন খাঁ খাঁ করছে, প্রাণীর চিহ্ন তো দূরে থাকুক উদ্ভিদেরও চিহ্ন নেই। অর্থাৎ জল থেকে দূরে শুকনো ডাঙায় আর পাহাড়-পর্বতে আজকের এতো সব রকমারি গাছগাছড়ার আবির্ভাব অনেক অনেক পরে হয়েছে। কিন্তু সে-কথা আলাদা। আপাতত আমরা মানুষের আবির্ভাবের কাহিনীটুকুই বুঝতে বসেছি। তাই, সেই আদিম এক-কোষ জীব থেকে কী করে আদিম উদ্ভিদের আবির্ভাব হলো আর সেই আদিম উদ্ভিদ থেকে কী করে শেষ পর্যন্ত আজকের পৃথিবী এতোরকম গাছগাছড়ায় ছেয়ে গেলো সে আলোচনা আপাতত আমরা তুলবো না। উদ্ভিদজগতের কথা ছেড়ে আমরা শুধু প্রাণিজগতের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখবো—বিশেষ করে প্রাণিজগতে পরিবর্তনের সেই ধারাটির দিকেই যার শেষে দেখা দিয়েছে আজকের মানুষ।

পৃথিবীতে প্রথম যে সব প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিলো তারাও ওই আদিম এককোষ জীবেরই বংশধর আর তারাও জন্মেছিলো জলের মধ্যেই। তার মানে? মানে, কোটি কোটি বছর আগে জলের মধ্যে আদিম এককোষ জীবগুলি দল বাঁধতে-বাঁধতে নতুন নতুন জীবে পরিণত হতে লাগলো আর ক্রমশই দেখা গেলো সেই আদিম এককোষ জীবের বংশধরেরা ক্রমশ দুটি স্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। এক ভাগকে বলা হয় উদ্ভিদ আর একভাগকে বলা হয় প্রাণী। আজকালকার যতো রকম গাছ-গাছড়া, লতাগুল্ম, শ্যাওলা, পাঁক—সবই ওই আদিম উদ্ভিদের বংশধর। আজকালকার যতো রকম পশুপাখি, পোকামাকড়, জীবজন্তু—সবই ওই আদিম প্রাণীদের বংশধর। আমরা এখানে ওই আদিম উদ্ভিদদের বংশের কথা বাদ দিয়ে আদিম প্রাণীদের বংশের কথাই আলোচনা করবো, কেননা যে-মানুষের কথা

বলতে বসেছি সেই মানুষও শেষ পর্যন্ত এই বংশধরদেরই মধ্যে পড়ে।

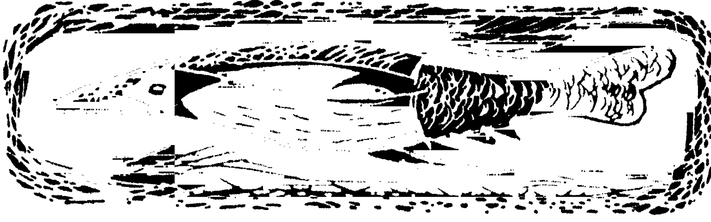
কোটি কোটি বছর ধরে সমুদ্রের মধ্যে আদিম এককোষ জীব মিলে গড়ে তুলতে লাগলো নানা রকম প্রাণীর শরীর। পোকা, কেঁচো, ঝিনুক, গুগলি, কতোই না! আর ক্রমশ এদের মধ্যে যেন রাজা হয়ে বসলো একরকম অদ্ভুত দেখতে প্রাণী—তাদের বলে ট্রাইলোবাইট। প্রায় বিশ কোটি বছর ধরে জলের মধ্যে এই ট্রাইলোবাইটদেরই যেন একচেটিয়া রাজত্ব চললো। কেউ বা জলের তলায় কাদায় আটকে থাকতো, কেউ বা ভাসতো জলের ওপর। জল থেকে ওরা সহজেই খাবার যোগাড় করতে পারতো আর ওদের গায়ের ওপর একরকম পুরু খোলস মতো ছিলো বলেই আত্মরক্ষা করতে পারাও অনেক সহজ ছিলো। তাছাড়া, এদের বাচ্চা হতো সংখ্যায় অনেক, অজস্র। তাই বহু বাচ্চা মরে গেলেও বিলুপ্ত হতো না এদের বংশ!

আজকের পৃথিবীতেও ট্রাইলোবাইটদের কিছু কিছু সাক্ষাৎ বংশধর টিকে আছে। যেমন কাঁকড়া, বিছে। তবুও সেই আদি অকৃত্রিম ট্রাইলোবাইটদের ইতিহাস অনেকদিন আগেই



ট্রাইলোবাইট-এর ফসিল

শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রায় বিশ কোটি বছর ধরে জলের মধ্যে একচেটিয়া রাজত্ব চালাবার পর শেষ পর্যন্ত আসল ট্রাইলোবাইটরা বিলুপ্ত হলো।



ইতিমধ্যে, পরিষ্কার জলের নিচে একরকমের নতুন প্রাণী দেখা দিতে শুরু করেছে। তাদের নাম দেওয়া হয় অস্ট্রাকোডার্ম। তাদের মুখগুলো ছুঁচোলো মতো। মুখের মধ্যে চোয়াল নেই, তারা চিবিয়ে খেতে পারতো না। কী করে খেতো ? কাদার ভেতরে ছুঁচোলো মুখ গুঁজে খাবার শুষে খেতো। আর ওদের শরীরে দেখা দিয়েছিলো দারুণ জরুরী একটি অঙ্গ। তার নাম মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক বলে অঙ্গটি এতো দামী কেন ? আমরা—মানুষেরা শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের সাহায্যেই দেখতে পাই, শুনতে পাই, শুঁকতে পারি, স্বাদ পাই, স্পর্শ পাই,—কেননা মস্তিষ্ক না থাকলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কোনো কাজেই আসতো না। শুধু তাই নয়। আমরা মানুষেরা যে এতো রকম জটিল কাজকর্ম করতে পারি, এতো-রকমের জটিল বিষয়ে চিন্তা করতে পারি—ভাবতে পারি, বুঝতে পারি,—তাও শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের দৌলতেই। আর এই কারণেই এতো কদর ওই অঙ্গটির।

অবশ্য তাই বলে সেই অস্ট্রাকোডার্মদের মস্তিষ্ক আমাদের মতো নয়। মানুষের তুলনায় যেন কিছুই নয়। অত্যন্ত বাজে ধরনের। তাই এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, ওদের

ইন্দ্রিয়গুলো আমাদেরই মতো তীক্ষ্ম ছিলো বা ওদের চিন্তাশক্তি আমাদের মতো এতোখানি ছিলো। মোটেই তা নয়। মানুষদের সঙ্গে ওদের মস্তিষ্কের এতো তফাত যে তুলনাই করা যায় না। তবুও মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক বলে এই অঙ্গটি দেখা দেওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা! পরমাশ্চর্য কেন? কেননা, এর আগে পর্যন্ত মস্তিষ্কের পরিচয় আর কোথাও দেখা যায় না। আর তাই, ওদের ওই মস্তিষ্ক যতো স্থূল আর সাদাসিধে ধরনের হোক না কেন—তার দৌলতেই ওরা হয়ে দাঁড়ালো সেকালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী। ছুঁচোলো-মুখ আর চোয়ালহীন ওই অদ্ভুত প্রাণীগুলিই প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছর ধরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী হয়ে রইলো—আজকের শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলতে যে-রকম মানুষের দল।

তারপর, এদেরই বংশধরেরা বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে, শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো আদিম মাছ। তাদের শরীরে মস্তিষ্ক ছিলো? ছিলো। তাছাড়াও দেখা দিলো নতুন সম্পদ। কী নাম? শিরদাঁড়া। অস্ট্রাকোডার্মদের শিরদাঁড়া ছিলো না। পৃথিবীর প্রথম স্পষ্ট শিরদাঁড়া-বিশিষ্ট প্রাণী বলতে মাছই। শিরদাঁড়া-বিশিষ্ট প্রাণীদের বলে মেরুদণ্ডী—ইংরেজিতে ভার্টিব্রেট। অবশ্য আজকের দিনে আমরা দেখি আরো অনেক রকম জীবজন্তুর শরীরে শিরদাঁড়া আছে। মনে রাখতে হবে, শেষ পর্যন্ত এরা সবাই আদিম মাছদেরই বংশধর। শিরদাঁড়া ছাড়াও আদিম মাছদের মুখের মধ্যে দেখা দিলো চোয়াল। চোয়ালের দৌলতে ওরা চিবিয়ে খেতে শিখলো। নতুন অঙ্গ বলতে আরো কী দেখা দিলো? পাখনা। পাখনা নেড়ে আর লেজ নেড়ে মাছেরা জলের মধ্যে চলাফেরা করতে শিখলো। কতোই না সুবিধে হলো বাঁচবার। আর অতো সুবিধে হলো বলেই অন্যদের তুলনায় আদিম মাছরা অনেক ভালো করে বাঁচতে পারলো।

দেখতে-দেখতে পৃথিবীর জলভাগ মাছে মাছে ভরে গেলো। আর তারপর প্রায় পাঁচ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জীব বলতে ওই মাছেরাই—যেমন আজকের দিনে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলাম আমরা, মানুষেরা !

জল থেকে স্থলের দিকে

এদিকে মাছদের যুগ শুরু হবার সময় থেকেই ডাঙার ওপরেও দেখা দিয়েছে সবুজের চিহ্ন: লতা-পাতা, ঘাস, গাছ। এ সব কিন্তু আজকালকার মতো গাছ, লতা, ঘাস নয়। কেননা, সেগুলোর শেকড় ছিলো না, মাটির ওপর যেন আলগোছে থাকতো। মাছদের ওই যুগটি ধরে ডাঙায় জীব বলতে এই রকম উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই নেই। ডাঙার উপর প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে।

ডাঙায় প্রাণী বলতে প্রথম কারা ? তারা আদিম মাছদেরই বংশধর। তারা জল থেকেই ডাঙায় উঠে এসেছিলো। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কোয়েলাকান্থ-এর কথা আলোচনা করতে গিয়ে ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি কী ভাবে আদিম যুগের মাছদের বংশধরেরা দুদিকে যেন দুভাগ হয়ে গেলো। একদলের শরীরে



কানকো ছাড়াও ক্রমশ ফুসফুস ধরনের অঙ্গ গজাতে লাগলো, আর দেখা গেলো তাদের পাখনার তলায় ঢিপি মতো উঁচু জায়গা, এই ঢিপির তলার হাড়। ওই আদিম ফুসফুস ধরনের অঙ্গটি বদলে ক্রমশ স্পষ্ট ফুসফুস হয়ে দাঁড়ালো আর পাখনার তলায় ঢিপি থেকে গজালো পা। এইভাবেই আদিম মাছদের একদল বংশধর শেষ পর্যন্ত উভচর হয়ে গেলো।

উভচর কেন? কেননা জল ছেড়ে তারা ডাঙায় উঠে আসতে পারলো বটে,—জল ছাড়াও ডাঙার উপর তারা বাঁচতে শিখলো বটে,—কিন্তু তবুও জলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা পুরোপুরি ঘুচতে চাইলো না। তাদের খানিকটা জীবন তখনো জলের মধ্যে আর খানিকটা জীবন শুকনো ডাঙায়। তাই উভচর।

পুরোপুরি ডাঙার জীব ওরা হতে পারলো না কেন? কেননা ওদের ওই ডিমগুলো। ডিমগুলো তখনো তুলতুলে নরম, ডাঙায় সে ডিম বড়ো সহজেই নষ্ট হয়ে যেতো। তাই ডিম পাড়বার সময় তাদের পক্ষে জলে ফিরে যাবার দরকার পড়তো। অমন তুলতুলে ডিম জলের মধ্যে অনেক বেশি নিরাপদে থাকতে পারে। তুলতুলে নরম ডিম কী রকম? আজকালকার এক উভচর হলো ব্যাঙ; ব্যাঙ-এর ডিম পরীক্ষা করলেই এ-কথা বুঝতে পারা যাবে। কিন্তু পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যাঙের ডিম যোগাড় করতে হবে জল থেকেই।

জলের প্রাণীর পক্ষে ডাঙায় উঠে আসবার এ-রকম তাগিদ কেন দেখা দিয়েছিলো? কেননা, সেই যুগটায় পৃথিবীর সঙ্গে যোঝবার—বাঁচবার—আর কোনো উপায় ছিলো না। তখন পৃথিবীর আবহাওয়াটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো অনিশ্চিত; যখন অনাবৃষ্টি তখন এমনই অনাবৃষ্টি যে সমুদ্রেরও জল শুকিয়ে আসে, পালে-পালে মরতে থাকে জলের প্রাণী। তাই জলের প্রাণীদের পক্ষে

ডাঙায় উঠে আসবার ও-রকম তাগিদ দেখা দিয়েছিলো। আর সেই তাগিদের ফলেই আবির্ভাব হয়েছিলো উভচরদের।

সরীসৃপের যুগ

তারপর সেই উভচরদের যুগও শেষ হলো। সে-আজ প্রায় বিশ কোটি বছর আগেকার কথা। তারপর প্রাণিজগৎ জুড়ে রাজত্ব শুরু হলো এদেরই এক রকম বংশধরের। তাদের বলে সরীসৃপ। সরীসৃপ মানে ? যারা বুকে ভর দিয়ে চলে তাদের বলে সরীসৃপ—যেমন, আজকালকার সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি। কারুর বা পা আছে। কারুর পা নেই। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা হলো, বুকে ভর দিয়ে চলে কি না ?

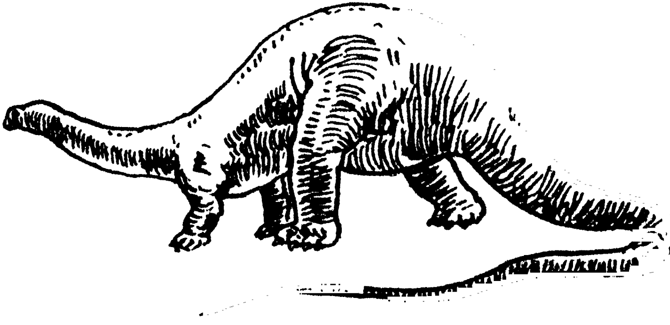
সরীসৃপেরা কিন্তু পুরোপুরি ডাঙার জীব। তার মানে, তারা জলে বাঁচবার তাগিদটাকে পুরোপুরি কাটিয়ে আসতে পারলো। কী করে পারলো ? তার কারণ, এদের ডিমগুলো উভচরদের ডিমের মতো নরম নয়। সরীসৃপদের ডিমের উপরে শক্ত খোলস আছে। এ ডিম ডাঙাতেও নিরাপদ। ডিম পাড়বার জন্যে তাই সরীসৃপদের আর জলে যেতে হয় না।

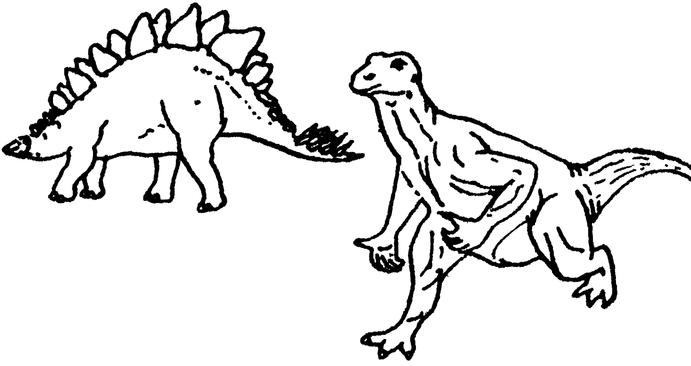
সরীসৃপদের শরীরে এ-ছাড়া আরো কয়েকটা সুবিধে দেখা দিয়েছিলো। ঘোরাফেরা করবার সুবিধে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধে। এই সুবিধেগুলির দরুন পৃথিবীর বুকে ক্রমশ তারাই প্রধান প্রাণী হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। কিন্তু সব সরীসৃপই একরকমের নয়। উভচরের বংশধরেরা নানানভাবে বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে নানান রকমের সরীসৃপ হয়ে গেলো। কারুর বা পা রীতিমতো মজবুত ; চলবার সময় তারা আর শুধুমাত্র বুকের উপর ভর দেয় না। কারুর শরীর থেকে আবার পায়ের চিহ্ন একেবারে মুছে গেলো ; যেমন সাপ। কারুর বা পাগুলো বদলাতে-বদলাতে

নৌকার দাঁড়ের মতো হয়ে গেলো; তারা ফিরে গেলো জলের জীবনে। আবার কারুর শরীরে পায়ের বদলে গজালো চামড়ার ডানা—আজকালকার বাদুড়দের মতো। ফলে এরা সরীসৃপ হয়েও আকাশে উড়তে শিখলো। কিন্তু তাই বলে এই আদিম উড়ন্ত সরীসৃপগুলি আজকালকার পাখির মতোও নয়, আজকালকার পাখিদের পূর্বপুরুষও নয়। আজকালকার পাখি অবশ্য সেকালের একরকম সরীসৃপদেরই বংশধর; কিন্তু ওই উড়ন্ত চামড়ার-ডানা-ওয়ালা সরীসৃপদের বংশধর নয়।

এতোরকম সরীসৃপদের মধ্যে যাদের নিয়ে সবচেয়ে জমকালো গল্প তাদের বলে ডাইনোসার। পৃথিবীর বুকে অমন বীভৎস আর অতিকায় জানোয়ার আর কখনো দেখা দেয়নি। আজকালকার হাতি, উট, গণ্ডারও তাদের পাশে নেহাতই যেন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জিনিস। নানা রকম ডাইনোসার; তাদের নানান রকম নামকরণ করা হয়েছে। কারুর নাম ডিপলোডোকাস, লম্বায় ৫৮ হাত। কিন্তু নিরামিষাশী। আর বুদ্ধিটা একেবারে নিরেস। কেননা, অমন প্রকাণ্ড শরীর হলে কী হয়, মাথার মধ্যে মস্তিষ্কটা আজকাল-কার মুরগির ডিমের মতো এতোটুকু। মানুষের তুলনায় এরা যে কী বোকা ছিলো তা ওই মগজের হিসেব থেকেই খানিকটা বোঝা যাবে। মানুষের শরীর প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা, কিন্তু মগজের ওজন প্রায় দেড় সের। তার মানে, গুটি তিরিশেক ডিপলোডোকাসের মগজ এক করলে একটি মানুষের মগজের সমান ওজন হতে পারতো। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিটা মোটেই সমান হতো না। কেননা, বুদ্ধি শুধুই মগজের ওজনের উপরে নির্ভর করে না; মগজের গড়নের উপরেও নির্ভর করে। মানুষের মগজ শুধুই ওজনে ভারি নয়। গড়নেও ভালো। তাই এতো সরেস আমাদের বুদ্ধি।







কয়েক রকম ডাইনোসার

আর-এক রকম ডাইনোসারের নাম দেওয়া হয় ব্রাসিওসরাস। তারা ওজনে এক-একজন প্রায় ৪৫০ মন করে। আর তাদের গলাগুলো এমনই লম্বা যে মাটিতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আজকাল-কার বাড়ির তিনতলার জানালায় উঁকি দিতে পারতো।

ডাইনোসারদের আর-এক জাতের নাম টিরেনোসরাস। সাক্ষাৎ যমদূত বলতে যা বোঝায় তারা যেন তাইই। লম্বায় ১৯ ফুট। পিছনের পা দুটো থামের মতো, সামনের পা দুটো ছোটোছোটো। দাঁতগুলো মুলোর মতো, প্রকাণ্ড বড়ো মুখের হাঁ। তাদের ল্যাজের ঝাপটায় কেঁপে উঠতো বনজঙ্গল আর তারা ছিলো মাংসাশী—মাংসাশী বলতে এমন বিরাট জানোয়ার পৃথিবীতে আর কখনো দেখা দেয়নি। তাই, তারা যখন শিকারে বেরুতো তখন বাকি সব অতিকায় ডাইনোসারের দলও ভয়ের চোটে একেবারে যেন জড়োসড়ো হয়ে থাকতো।

এই রকম অনেক রকমের ডাইনোসার আর অনেক লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বুক জুড়ে এদের যেন দুর্দান্ত দাপট।

কিন্তু অমন দৈত্যের মতো চেহারা হলে কী হয়, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বুক থেকে এরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, পড়ে রইলো শুধু ওদের কঙ্কালগুলোর কিছু কিছু ফসিল।

ওরা লুপ্ত হলো কেন? সে আজ প্রায় ছ কোটি বছর আগেকার কথা। পৃথিবীর বুকের ওপরে শুরু হলো যেন এক রসাতল কাণ্ড। মস্ত মস্ত জলাভূমি শুকিয়ে যেতে লাগলো, মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগলো বিরাট বিরাট পাহাড়ের চুড়ো। উত্তর শিয়র থেকে বইতে শুরু করলো শুকনো হিম হাওয়া, সে-হাওয়ায় মরে যেতে লাগলো গাছপালার দল।

পৃথিবীর চেহারাটাই যেন হুহু করে বদলে যেতে লাগলো। এর আগে পর্যন্ত পৃথিবীর যে-রকম অবস্থা তা ওই ডাইনোসারদের

পক্ষে চমৎকার, খাসা। কেননা, এদের মধ্যে অনেকেই থাকতো জলার মধ্যে গা ডুবিয়ে, বাঁচতো ভিজে গরম হাওয়ায়। আর পৃথিবীর বদলের সঙ্গে,—নতুন অবস্থার সঙ্গে,—ওরা কিছুতেই নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারলো না। আর তা পারলো না বলেই ওরা অমনভাবে শেষ হয়ে গেলো। শেষ হলো সরীসৃপদের যুগ।

স্তন্যপায়ীর যুগ

এদিকে ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বুকে আর-এক রকম জানোয়ার দেখা দিয়েছিলো। ইঁদুরের মতো ছোট্ট তাদের চেহারা, তাই ডাইনোসারদের তুলনায় একেবারে যেন কিছুই নয়। তবুও ডাইনোসারদের সঙ্গে এদের একরকম জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছিলো। কেননা, সরীসৃপদেরই কোনো এক শাখা বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে এই নতুন ধরনের জানোয়ার হয়েছিলো।

তাদের বলা হয় স্তন্যপায়ী। তাদের শরীর আকারে ছোটো হলেও বাঁচবার ব্যাপারে তাদের কয়েক রকম সুবিধে ছিলো। প্রথমত, এদের গা লোমে ঢাকা। দ্বিতীয়ত, এদের রক্তকে বলে গরম রক্ত।

গরম রক্ত মানে কী ? আসলে, জন্তুজানোয়ারদের রক্ত দু রকমের হতে পারে। একরকম জানোয়ারের বেলায় বাইরের আবহাওয়া অনুসারে রক্তের তাপ ওঠানামা করে। ঠাণ্ডা পড়লে তাদের রক্তও ঠাণ্ডা হয়ে যায়, গরম পড়লে তাদের রক্তও তপ্ত হয়। এরকম রক্তকে বলে ঠাণ্ডা রক্ত। আর-এক রকমের বেলায়, আশপাশের আবহাওয়া ঠাণ্ডাই হোক আর গরমই হোক, শরীরের ভিতরকার রক্তের তাপ সবসময়ে সমান থাকে। এ-রকম রক্তকে বলে গরম রক্ত।

পৃথিবীতে আবহাওয়ার অবস্থা সব সময় সমান নয়। তাই বাঁচবার পক্ষে ঠাণ্ডা রক্তের চেয়ে গরম রক্তই অনেক বেশি সুবিধের।

স্তন্যপায়ীদের আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো প্রাণী তাদের সবাইকারই ঠাণ্ডা রক্ত। এমনকি ওই অতিকায় ডাইনোসারদেরও তাই। ফলে, প্রায় ছ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যখন ওই রকমের রসাতল কাণ্ড শুরু হলো,—শুরু করলো কনকনে ঠাণ্ডা আর শুকনো হাওয়া বইতে,—তখন এমনকি ডাইনোসার-এর দলও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের দেখতে অমন ছোটো হলেও তারা বেঁচে গেলো। কী করে বাঁচলো? তাদের গায়ের বাইরে লোম। তাদের গায়ের ভেতরে গরম রক্ত।

স্তন্যপায়ীদের অবশ্য তাছাড়াও আরো নানান সুবিধে ছিলো। ওদের মগজগুলো অনেক ভালো; তাই তারা অনেক হুঁশিয়ার, অনেক বেশি সজাগ। ওদের দাঁতগুলো ভালো, ওদের পাগুলো মজবুত, ওদের শরীরের ভেতরে শ্বাস নেবার ব্যবস্থা অনেক উন্নত ধরনের।

আর তাছাড়া আরো একটা মস্ত সুবিধে হলো, ডিম পাড়বার বদলে ওরা শুরু করলো একেবারে তৈরি আর আস্ত বাচ্ছা পাড়তে।

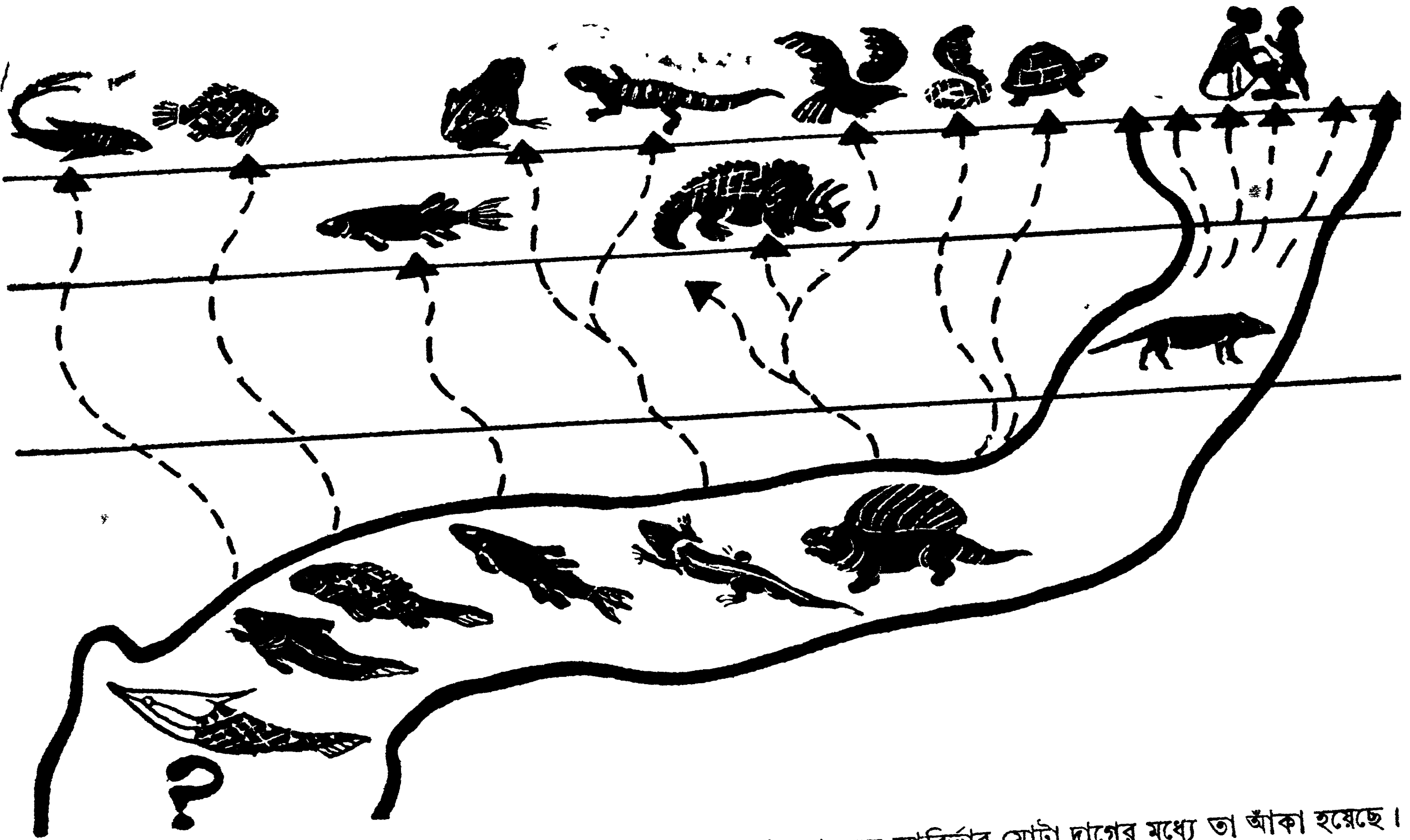
সরীসৃপ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীই ডিম পাড়তো। কিন্তু ডিম পাড়ার নানান রকম অসুবিধে। ডিম সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ডিম পাড়বার জন্যে সুবিধেমতো জায়গা খুঁজে পাওয়া চাই। তাছাড়া ডিম পাড়বার পর সেগুলোর ওপরে যত্ন করে তা দিতে হবে—তবে বাচ্চা ফুটবে। তাই স্তন্যপায়ীরা যে একেবারে আস্ত বাচ্চা পাড়তে লাগলো তার দরুন সুবিধে হলো অনেকখানি। তাছাড়া, বাচ্চা পাড়বার পর স্তন্যপায়ীদের পক্ষে বাচ্চার জন্যে খাবার সংগ্রহ করবার হাঙ্গামাটাও রইলো না। কেননা বাচ্চারা তাদের মা-র বুক থেকে দুধ খাবে। আসলে,

বাচ্চাদের পক্ষে এইভাবে দুধ খাবার ব্যবস্থা থেকেই এদের নাম হয়েছে স্তন্যপায়ী।

অবশ্য শুরুর দিকে স্তন্যপায়ীদের চেহারা বড়ই তুচ্ছ। কিন্তু ওদের শরীরে এতো রকম সুবিধে ছিলো বলেই দেখতে-দেখতে সারা পৃথিবী জুড়ে ওরাই শ্রেষ্ঠ জানোয়ার হয়ে দাঁড়ালো। তাই সরীসৃপদের যুগের পর শুরু হলো স্তন্যপায়ীদের যুগ।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে-সব স্তন্যপায়ী দেখা দিয়েছিলো তাদেরই বংশধরেরা নানান দিকে নানান ভাবে বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে, শেষ পর্যন্ত নানান জাতের জানোয়ার হয়ে যেতে লাগলো। আকাশে বাদুড়, ডাঙায় সিংহ, হাতি, জেবরা, জিরাফ, জলের তলায় মাছখেকো মাছ। এরা সকলেই স্তন্যপায়ী, নানান জাতের স্তন্যপায়ী। আর এই রকমেরই স্তন্যপায়ীদের আর-একটি জাত বাসা বাঁধলো গাছের ডালে। আমরা—আজ-কালকার মানুষেরা—আসলে হলাম সেই গেছো স্তন্যপায়ীদেরই বংশধর।

কী নাম তাদের? প্রাইমেট। আজকাল প্রাইমেট দেখা যায়? না, যায় না। কিন্তু প্রাইমেটদের অনেক রকম বংশধরকে দেখতে পাওয়া যায়। কী রকম বংশধর? একদিকে অনেক রকমের বাঁদর আর-এক দিকে অনেক রকমের বনমানুষ। বনমানুষ এক রকমের নয়। কোনো জাতের নাম ওরাং ওটাং; কোনো জাতের নাম শিম্পাঞ্জি, কোনো জাতের নাম গোরিলা। আর ওই রকমই আর-এক জাতের বনমানুষই হলো আমাদের সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ। অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষ। সেই জাতের বনমানুষই বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে আজকালকার মানুষ হয়ে গিয়েছে।



প্রাণিজগতে পরিবর্তন : বিশেষ করে যে-ধারাটির ফলে শেষ পর্যন্ত মানুষের আবির্ভাব মোটা দাগের মধ্যে তা আঁকা হয়েছে।

চার-পা ছেড়ে দু-পা

সেই সব প্রাইমেট—যাদের একদল বংশধরই শেষ পর্যন্ত বনমানুষে পরিণত হয়েছিলো,—আজকের পৃথিবীতে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি ওই সব বনমানুষ,—যাদের একদল বংশধরই হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু মানুষ,—আজকের দিনে তাদেরও দেখা যায় না। তবুও বৈজ্ঞানিকেরা আন্দাজ করতে পেরেছেন কী করে একদল বনমানুষের বংশধরই বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে, শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়ে গেলো।

কী করে ?

সেই বনমানুষদের আড্ডা ছিলো গাছের উপরে। তাদের গায়ে লোম, মুখে লোম, পিছনে লেজ। আর তাদের হাত বলে কিছু ছিলো না। হাত-পার বদলে চার-চারটেই পা।

গাছেগাছে ঘোরবার সময় পিছনের পা জোড়ার চেয়ে সামনের পা-জোড়া অনেক বেশি কাজে লাগবার কথা: গাছের ডাল আঁকড়ে ধরা থেকে ফলমূল যোগাড় করা, ফলমূল মুখে পোরা—সব ব্যাপারেই পিছনের পা-জোড়ার চেয়ে সামনের পা-জোড়া অনেক বেশি কাজে লাগে। আর তাই, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম অনুসারে, ওদের মধ্যে সেই বনমানুষগুলিই ভালো করে টিকে থাকতে পারলো—বাঁচতে পারলো—যাদের কিনা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসাবে পিছনের পা-জোড়ার চেয়ে সামনের পা-জোড়ার কর্মক্ষমতা কিছুটা বেশি। এইভাবে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে ওই বনমানুষদের বংশধরদের মধ্যে দেখা গেলো পিছনের পা-জোড়ার সঙ্গে সামনের পা-জোড়ার বেশ কিছুটা তফাত হয়ে যাচ্ছে।

আর তারপর—সে-এক ভারি আশ্চর্য ঘটনা। এমন আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম ঘটেছে। কী ঘটনা ? ওই চার-

পেয়ে বনমানুষদের মধ্যে কোনো কোনো দল নেমে এলো গাছের বাসা ছেড়ে সমতল জমির উপরে। আর ক্রমশই তারা এই সমতল জমির উপরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে শিখলো, শিখলো চার-পা ছেড়ে দু-পায়ে ভর দিয়ে চলতে।

ঘটনাটা ঘটলো কী করে? কতোদিন আগে?

বৈজ্ঞানিকেরা এ-নিয়ে যে-কথা অনুমান করেন তাই বলি।

সে-অনেক বছর আগেকার কথা। দশ লাখ বছর হতে পারে। আরো বেশি বছর হতে পারে। তখনকার কালে পৃথিবীর মানচিত্র অন্য রকমের ছিলো। আজকের দিনে যেখানে ভারত মহাসাগর তখনকার দিনে সেখানে মহাসাগর ছিলো না। তার বদলে ছিলো এক মহাদেশ। সে-মহাদেশ ওই মহাসমুদ্রের তলায় হারিয়ে গিয়েছে।

অতোকাল আগে, ওই হারিয়ে-যাওয়া মহাদেশটির বুক থেকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বনজঙ্গলের চিহ্ন মুছে গিয়েছিলো। কেন মুছে গেলো? হয়তো দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো, হয়তো বা ভূমিকম্পের দরুন ধ্বসে নেমে গিয়েছিলো মাটির নিচে। কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুনও সে-বনজঙ্গল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। ঠিক যে কেন ওইভাবে বনজঙ্গল নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো তা অবশ্য জোর করে বলা কঠিন। তবে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করছেন, যে-কোনো কারণেই হোক না কেন—তা নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো। আর বনজঙ্গল নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো বলেই গাছের বাসা থেকে সমতল জমির উপরে নেমে এসেছিলো সেকালের বনমানুষদের কোনো কোনো দল।

মাটির উপরেও কি তারা চারপেয়ে জানোয়ার হয়ে থাকবে? তা নয়। গাছে-গাছে বাঁচবার সময়েই পিছনের পা-জোড়ার তুলনায় তাদের সামনের পা-জোড়া কিছুটা অন্য রকম হয়ে

যাচ্ছিলো। সমতল জমিতে নেমে আসবার পর এই তফাতটা আরো আরো বেড়ে চললো। বনমানুষের সেই বংশধরেরা শিখলো শুধুমাত্র পিছনের পা-জোড়ার উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে, চলাফেরা করতে।

কিন্তু সামনের পা-জোড়ার কী হলো ? গাছে বাঁচবার সময়েই পিছনের পা-জোড়ার সঙ্গে এগুলির তফাত হয়েছিলো। সমান জমিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবার পর এগুলি আরো বদলাতে লাগলো। বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে, অনেক হাজার বছর পরে, অনেক বংশ পেরিয়ে, বনমানুষদের সেই সামনের পা-জোড়া শেষ পর্যন্ত মানুষের হাত হয়ে গেলো। ফলে, বন-মানুষেরাও আর বনমানুষ রইলো না। হয়ে গেলো আদিম মানুষ।

আমরা যে মানুষ হয়েছি তা আমাদের এই হাতের গুণেই। আর কোনো জানোয়ারেরই হাত নেই—যে-রকম আছে আমাদের, মানুষদের। সিম্পাঞ্জীর থাবা আছে। গোরিলার থাবা আছে। কিন্তু হাত নেই। ওই থাবা দিয়ে ওরা বড়ো জোর একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু হাতিয়ার বানাতে পারে না। মানুষের হাত আছে। হাত দিয়ে মানুষ হাতিয়ার বানাতে পারে। আর এই হাতিয়ার বানাতে পারে বলেই পৃথিবীর বাকি সব জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের এতো তফাত।

হাতিয়ার কাকে বলে ? যা হাতে নিয়ে আমরা পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি—পৃথিবীকে বদলাতে পারি। আমাদের কাস্তে-কুড়ুল, তীর-ধনুক, কোদাল-হাতুড়ি—সবকিছুই।

এই হাতিয়ারের দরুনই বাকি সব জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের এতো তফাত কেন ? কেননা, বাকি সবাই বাঁচে পৃথিবীর মুখ চেয়ে, পৃথিবীর দয়ার উপরে নির্ভর করে। কপালে যদি খাবার

জোটে তা হলেই তাদের পেট ভরবে। নইলে নয়। মাথা গোঁজবার জায়গা যদি জোটে তাহলেই তারা মাথা গুঁজতে পারবে। নইলে নয়। কিন্তু মানুষও কি এ-রকম অসহায়ের মতো, এ-রকম নিরুপায়ের মতো, বেঁচে থাকে নাকি? নিশ্চয়ই নয়। মানুষ পৃথিবীর সঙ্গে রীতিমতো সংগ্রাম করে, সংগ্রাম করেই পৃথিবীর কাছ থেকে বাঁচবার উপকরণগুলি আদায় করে নেয়। তাই মাটির বুক চিরে মানুষ ফসল ফলায়, গাছের তুলো বদলে কাপড় তৈরি করে, পাথর গেঁথে বাড়ি বানায়। শুধুই কি তাই নাকি? উড়োজাহাজ বানিয়ে মানুষ আকাশকে জয় করেছে, ডুবুরীর পোশাক পরে জয় করেছে পাতাল। আরো কতো রকম। সত্যিই যে কতো রকম তার একটা ফর্দ তৈরি করাই কঠিন!

আর মানুষ যে এতোখানি পেরেছে,—পেরেছে এমন ভাবে প্রকৃতিকে জয় করতে,—শেষ পর্যন্ত তার কারণ হলো মানুষের ওই হাত, যে-হাত দিয়ে সে হাতিয়ার বানায়। পৃথিবীতে আর কোনো জানোয়ারেরই হাত নেই। বাকি সবাই তাই বাঁচতে চায় পৃথিবীর মুখ চেয়ে—নিরুপায়ের মতো, অসহায়ের মতো।

কিন্তু বুদ্ধি? মানুষ যে আজ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রাণী তার আসল কারণ কি মানুষের বুদ্ধি নয়? নিশ্চয়ই তাই। মানুষের যে-রকম বুদ্ধি আছে সে-রকম নিশ্চয়ই আর কোন জানোয়ারেরই নেই। আর এই বুদ্ধির জোরেই মানুষ এতো বড়ো হয়েছে। এ-সব কথা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু কথাগুলোকে আরো ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।

প্রশ্ন হলো বুদ্ধিটা নির্ভর করে কিসের উপর? মস্তিষ্কের উপর। মানুষের মস্তিষ্কটা অনেক বড়ো, মানুষের মস্তিষ্কটা অনেক ভালো,—আর তাই জন্যেই মানুষের এতো বুদ্ধি। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কটা এতো ভালো হলো কী করে? আদিম বনমানুষদের অন্যান্য

বংশধরগুলির মস্তিষ্ক তো এতো ভালো হয়নি। সিম্পাঞ্জীর নয়। ওরাং ওটাং-এর নয়। কারুর নয়। কেন নয়? কেননা ওই হাতের সঙ্গে মস্তিষ্কেরও সম্পর্ক আছে, হাতের উন্নতির সঙ্গে মস্তিষ্কের উন্নতির সম্পর্ক আছে। বনমানুষের থাবা বদলে যতোই কিনা মানুষের হাত হয়েছে ততোই বদলেছে মাথার ভিতরে মস্তিষ্কটিও। আকারে তা বড়ো হয়েছে, গড়নে তা ভালো হয়েছে, আর তারই দরুন আজ মানুষের বুদ্ধি এতোখানি, এমন বেশি।

তাহলে, হাতের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক রয়েছে। শুধু মস্তিষ্কই নয়, মানুষের আর-একটি পরমাশ্চর্য বৈশিষ্ট্যেরও, তার নাম ভাষা।

তাই, এবার আমরা ভাষা, মস্তিষ্ক আর হাতের সম্পর্কটা আরো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবো—মানুষ কী করে মানুষ হলো তা বোঝা যাবে।

যুগ	প্রধান প্রাণী	সময়ের হিসেব (বছর)
প্যালিওজোইক যুগ		৭০০,০০০,০০০ থেকে ৫৫০,০০০,০০০ বছর
		৫৯০,০০০,০০০ থেকে ৪৮০,০০০,০০০ পর্যন্ত
		৪৬০,০০০,০০০ থেকে ৩৯০,[illegible]০০,০০০ পর্যন্ত
		৪২০,০০০,০০০ থেকে ৩৬০,০০০,০০০ পর্যন্ত
		৩৭০,০০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০,০০০ পর্যন্ত
		৩৩০,০০০,০০০ থেকে ২৫০,০০০,০০০ পর্যন্ত
		২৮০,০০০,০০০ থেকে ২১৫,০০০,০০০ পর্যন্ত

যুগ	প্রধান প্রাণী	সময়ের হিসেব (বছর)
মেসোজোইক যুগ		২৪০,০০০,০০০ থেকে ১৯০,০০০,০০০ পর্যন্ত
		১৯৫,০০০,০০০ থেকে ১৫৫,০০০,০০০ পর্যন্ত
		১৫০,০০০,০০০ থেকে ১২০,০০০,০০০ পর্যন্ত
		১১৫,০০০,০০০ থেকে ৯৫,০০০,০০০ পর্যন্ত
		১৩৬,০০০,০০০ থেকে ১১৬,০০০,০০০ পর্যন্ত
সেনোজোইক যুগ		১,০০০,০০ পর্যন্ত ১,৫০০,০০০ থেকে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশে ছান্দোগ্য-উপনিষদ বলে খুব পুরানো কালের একটি পুঁথি আছে। তার এক জায়গায় লেখা আছে, ভাষা বা বাক্-ই হলো মানুষের সার। পুরুষস্য বাক্ রসঃ।

কথাটা কি ঠিক? একদিক থেকে ঠিক। আর যেদিক থেকে ঠিক তার কথা ভালো করে বুঝতে না-পারলে মানুষের আসল রহস্যটাই আমাদের কাছে অজানা থেকে যাবে। তাই পশুরাজ্যের আলোচনা ছেড়ে মানবরাজ্যের আলোচনায় প্রবেশ করবার সময় এই বিষয়টিই আলোচনা করা দরকার।

ভাষাই মানুষের সার। কথাটা কোনদিক থেকে সত্যি? তা বুঝতে হলে শুধুমাত্র ভাষার কথাটুকু তুললেই হবে না—মানুষের ভাষা, মানুষের চিন্তাশক্তি, মানুষের হাতিয়ার-ব্যবহার, এই তিনটি বিষয়ই একসঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে হবে।

তিনটি বিষয় কেন? কেননা, মানুষের আসল বৈশিষ্ট্য বলতে এই তিনটিই, এই তিনদিক থেকেই জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে মানুষের আসল তফাত। মানুষ কথা কইতে পারে, চিন্তা করতে পারে, পারে হাতিয়ার দিয়ে পৃথিবীকে নিজের চাহিদামতো বদল করে নিতে। জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে আর কেউই তা পারে না।

কিন্তু তিনটির কথা একসঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে হবে কেন? চিন্তা-চেতনা তো মস্তিষ্কের ব্যাপার, হাতিয়ার-ব্যবহার হাতের

ব্যাপার। এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী? আর এ-দুয়ের সঙ্গে মিলিয়ে না-বুঝলে মুখের ভাষাকেই বা বুঝতে পারা যাবে না কেন? এমনিতে তিনটিকে আলাদা বলেই মনে হয় বইকি। কিন্তু খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবো, আলাদা-আলাদা হিসেবে বিচার করলে তিনটির একটিকেও ঠিকমতো বোঝা যায় না। কেন, তাই দেখা যাক। কিন্তু এগুতে হবে ধীরে ধীরে, ধাপে-ধাপে।

বনমানুষ আর মানুষ

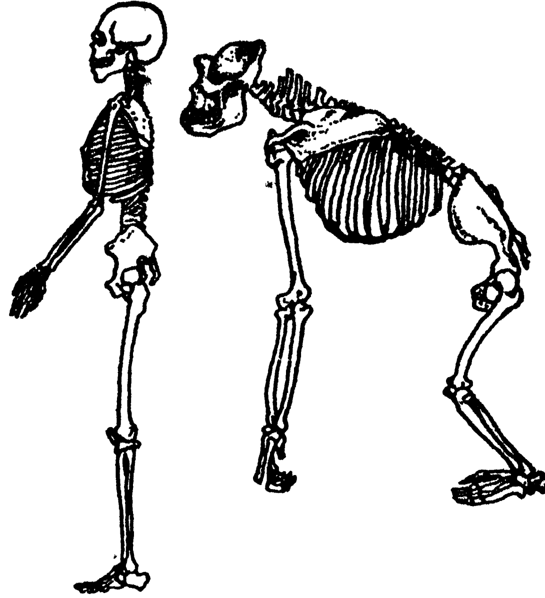


মানুষের এক নিকট আত্মীয়—গোরিলা

আজকের পৃথিবীতে যে-সব জন্তু-জানোয়ারের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে মানুষের সব-নিকট আত্মীয় বলতে কে, বা, কারা? গোরিলা, সিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং, গিবন। এরা সবাই বনমানুষ—আধুনিক বনমানুষ। অর্থাৎ, একরকম আদিম বনমানুষের বংশধর। মানুষও তাই।

মানুষ আর ওই আধুনিক বনমানুষেরা নিকট-আত্মীয় হলেও এক নয়। অনেক তফাত। কিসের তফাত? শরীরের দিক থেকে প্রধানত দুটো।

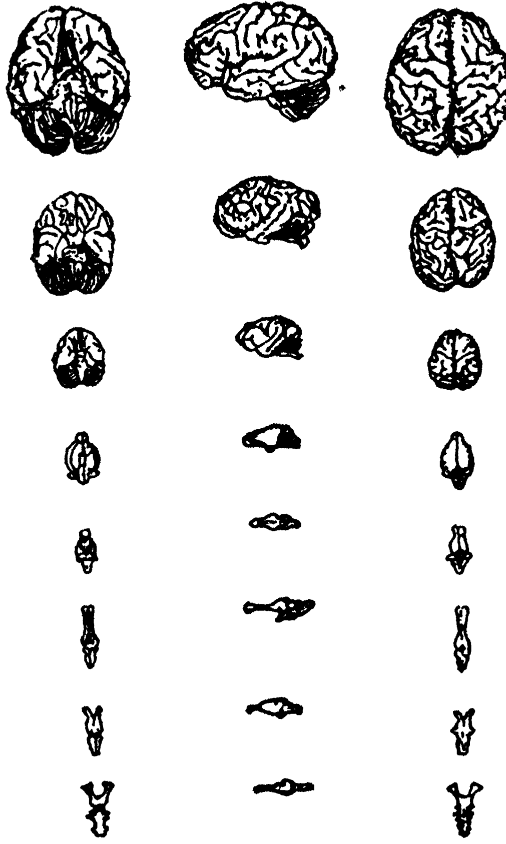
এক: মানুষ সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সম্পূর্ণ সোজা হয়ে চলাফেরা করতে পারে। বনমানুষেরা পারে না।



গোরিলার কঙ্কাল আর মানুষের কঙ্কাল এঁকে দেওয়া হলো। মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে তফাতটা কতোখানি।

দুই: মানুষের মস্তিষ্ক ঢের বড়ো, ঢের ভালো। অন্য-সব জন্তুজানোয়ারের চেয়ে তো বটেই, বনমানুষের চেয়েও। তফাত যে কতোখানি তা বোঝবার জন্যে পরের পাতায় আর-একটা ছবি দেওয়া গেলো।

তিনসার ছবি। মস্তিষ্ককে মাথার খুলি থেকে বের করে বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে আলাদা-আলাদা রকমের লাগবে। তাই বোঝাবার জন্যে ছবিতে তিনটে আলাদা সারি আঁকা হয়েছে। তলার থেকে দেখলে কী রকম দেখায়—অর্থাৎ, মস্তিষ্কের নিচের দিকটা কী রকম দেখতে—তারই ছবি আঁকা হয়েছে সবচেয়ে বাঁ-দিকের সারিতে। উপর-দিক থেকে দেখলে যে-রকম দেখায় তার ছবি সবচেয়ে ডান-দিকের সারিতে। আর মাঝের



সারিতে? মস্তিকের বাঁ-পাশ থেকে দেখলে যে-রকম দেখায় তারই ছবি।

প্রতি সারিতে আটটি করে ছবি—আট রকম প্রাণীর মস্তিষ্ক! উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এদের নাম বলে যাই: মানুষ, গোরিলা, প্রাইমেট, আদিম বনমানুষ, নিচুস্তরের স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর, আদিম মাছ। আধুনিক বনমানুষদের মধ্যে গোরিলা হলো মানুষের অতি নিকট আত্মীয়। চেহারাটা প্রকাণ্ড, কিন্তু মস্তিষ্কটা কতো নিকৃষ্ট।

খাড়া শরীর আর ভালো মস্তিষ্ক। এই দুটি তফাত ছাড়া

মানুষের সঙ্গে বনমানুষদের আর কোন তফাত চোখে পড়ে না? পড়ে। বনমানুষদের হাতগুলো তুলনায় অনেক বেশি লম্বা, পাগুলো বেঁটে বেঁটে। আবার, মানুষের পায়ের চেটোটা অনেক থ্যাবড়া, পায়ের আঙুলগুলো ছোট্ট ছোট্ট। কিন্তু এ-সব তফাতকে মৌলিক তফাত বলছি না। কেননা এগুলি অনেক পরে দেখা দিয়েছে। তার মানে, মানুষ আর আধুনিক বনমানুষ যে আদিম বনমানুষদের বংশধর, তাদের শরীরের গড়নে এ-সব লক্ষণ ছিলো না। সমতল জমির উপর চলতে-চলতে মানুষের পায়ের চেটো আর আঙুলগুলোর ওই রকম অবস্থা হয়েছে।



হালের বনমানুষ—ওরাং ওটাং



হালের বনমানুষ—সিম্পাঞ্জী



গিবন

এদিকে গাছে থাকতে-থাকতে—গাছের ডাল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে—আধুনিক বনমানুষদের হাতগুলো ও-রকম লম্বা-লম্বা হয়ে গিয়েছে।

কেনিয়ায় একরকম আদিম বনমানুষের ফসিল পাওয়া গিয়েছে। তাদের শরীরে আধুনিক বনমানুষদের এই লক্ষণগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ, আধুনিক বনমানুষেরা তাদেরি বংশধর। দক্ষিণ-আফ্রিকায় আর-এক রকম বনমানুষের ফসিল পাওয়া গিয়েছে। তাদের বৈজ্ঞানিক নাম অস্টারো পিথেকাস। ওই দু রকম ফসিলের মধ্যে খুব মিল। তাদের শরীরেও আধুনিক বনমানুষদের এ-সব লক্ষণ নেই। অথচ অন্যান্য সাদৃশ্য রয়েছে।

আজকালকার বনমানুষদের মতোই ওদের মস্তিষ্ক আকারে ছোটো, চোয়াল বড়ো আর ভারি ধরনের। আধুনিক মানুষদের সঙ্গেও খানিকটা যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এদের হাত লম্বা আর পা খাটো নয়, দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও অনেক সোজা। তার মানে, গাছের বাসা ছেড়ে এরা ইতিমধ্যেই সমতল জমির উপর নেমে এসেছিলো।

কী প্রমাণ হলো? আধুনিক বনমানুষদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি বরং হাল-আমলের কথা, গাছের বাসা ছেড়ে আসতে পারেনি বলেই ক্রমশ তাদের এ-সব নতুন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা গাছের বাসা ছেড়ে আসতে পেরেছিলো তাদের শরীরে বরং অন্য রকম পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছিলো। অর্থাৎ তারা বদলাতে শুরু করেছিলো মানুষের দিকেই।

আর-এক রকম ফসিল পাওয়া গিয়েছে। তাদের নাম দেওয়া হয় পিথিকান্‌থ্রোপাস্‌। বিশেষত পিকিং-এর কাছে এদের যে-সব ফসিল পাওয়া গিয়েছে সেগুলি খুব আশ্চর্য। মস্তিষ্ক আকারে ছোটোই; কিন্তু শরীরের গড়ন মানুষের মতোই হয়ে আসছে। এরা গুহায় থাকতো, হরিণ শিকার করতো, এমনকি পাথরের হাতিয়ার আর আগুনের ব্যবহার পর্যন্ত শিখেছিলো। কী প্রমাণ হলো? গাছের বাসা ছেড়ে মাটির বুকে নেমে আসার দরুনই এ-সব বদল হতে শুরু করেছিলো। যারা গাছের বাসা ছেড়ে নেমে আসেনি তাদের শরীরেও বদল হয়েছে—কিন্তু তা অন্য রকমের।

হাত আর মস্তিষ্ক

গায়ের জোর, নখের ধার, দাঁতের শক্তি—এসব দিক থেকে মানুষ, এবং মানুষের পূর্বপুরুষ সেই আদিম বনমানুষেরাও—অন্যান্য নানান জন্তুজানোয়ারের তুলনায় নেহাতই নিরুপায়, নেহাতই অসহায়।

তাই গাছের বাসা হারিয়ে সমতল জমির উপর নেমে আসবার পরও যদি তারা এগুলির উপরই নির্ভর করে বাঁচবার চেষ্টা করতো তাহলে হয়তো পৃথিবীর বুক থেকে তারা কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। কিন্তু তা যায়নি। কেননা, শুরু থেকেই সমতল ভূমির অন্যান্য জানোয়ারদের চেয়ে তাদের একটা মস্ত সুবিধেও ছিলো। কী সুবিধে? মস্তিষ্ক। আধুনিক মানুষের তুলনায় তা নিকৃষ্ট, কিন্তু সমতল জমির বাকি সব জানোয়ারদের চেয়ে তা অনেক উৎকৃষ্ট। গাছে বাঁচবার সময়েই আদিম বনমানুষদের মস্তিষ্ক উন্নত হয়েছিলো—অন্য জানোয়ারদের চেয়ে উন্নত। সেই উন্নত মস্তিষ্ক নিয়েই তারা সমতল জমির উপর বাঁচতে এসেছিলো। যারা গাছে রয়ে গেলো তাদের মস্তিষ্কও অবশ্যই অন্যান্য জানোয়ারদের চেয়ে ভালো। তাই আধুনিক বনমানুষের মস্তিষ্কও বাঘভালুকের চেয়ে ভালো। কিন্তু তারপর আর উন্নতি হয় নি। মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতি হয়েছে। কী করে হলো? তা বলতে হলে, হাতের কথা থেকে শুরু করতে হবে।

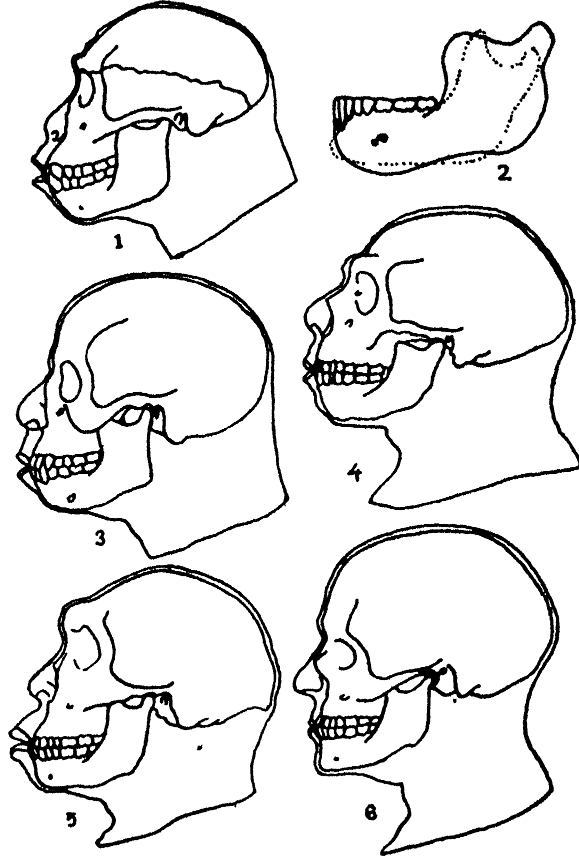
সমতল জমিতে ক্রমশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখবার দরুন হাতজোড়া মুক্তি পেলো সাধারণ চলা-ফেরার দায়িত্ব থেকে। হাত-জোড়া শুধু যে মুক্তি পেলো তাই নয়, উন্নততর মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিতও হতে লাগলো।

শরীরের পুরো ভারটাই এখন থেকে পা-জোড়ার উপর। ফলে পায়ের চেটোটা থ্যাবড়া আর শক্ত আর পায়ের আঙুলগুলো ভোঁতা আর ছোটো হয়ে আসতে লাগলো—পা দিয়ে চলাফেরা ছাড়া আর কোনো সূক্ষ্ম কাজ করা চলে না। কিন্তু হাতের আঙুলগুলোর বেলায় অন্য কথা। হাতের আঙুলগুলো মগজের পরিচালনা মেনে ক্রমশই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, নিপুণ থেকে নিপুণতর কাজের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠতে লাগলো।



উপরে বাঁ দিকে সিম্পাঞ্জীর থাবা, ডান দিকে গোরিলার থাবা।
নিচে মানুষের হাত

আর, মজার কথা এই যে হাতের আঙুলগুলির এই উন্নতির দরুনই মাথার খুলির ভিতরকার মস্তিষ্কটিও আরো উন্নত হবার সুযোগ পেলো। কী করে? যতোদিন পর্যন্ত হাতজোড়া এ-ভাবে মুক্তি পায়নি ততোদিন পর্যন্ত অনেক বেশি দায়িত্ব ছিলো দাঁত আর চোয়ালের উপর। অনেক কাজই দাঁত দিয়ে করতে হতো। ফলে চোয়ালের জোর বেশি লাগতো। চোয়ালগুলো ভারি আর বড়ো হওয়া দরকার ছিলো। কিন্তু হাতজোড়া মুক্ত হওয়ার দরুন দাঁত আর চোয়ালের ওপর আর অতোখানি দায়িত্ব রইলো না। চোয়ালের হাড় ক্রমশই ছোটো হয়ে আসতে লাগলো। আর তারই ফলে মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্কের জন্যে জায়গা বাড়তে লাগলো। মস্তিষ্ক বাড়তে লাগলো। আবার অপরদিকে মস্তিষ্ক যতোই বড়ো হতে লাগলো, উন্নত হতে লাগলো, ততোই হাত



চোয়ালের হাড় ছোটো হয়ে মগজকে বড়ো হবার জন্যে জায়গা করে দিয়েছে

জোড়াকে আরো দক্ষ ভাবে, আরো আরো নিপুণ ভাবে, কাজে লাগাবার সম্ভাবনা দেখা দিতে লাগলো।

তাহলে, হাতের উন্নতি আর মস্তিষ্কের উন্নতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

মস্তিষ্কের কথা

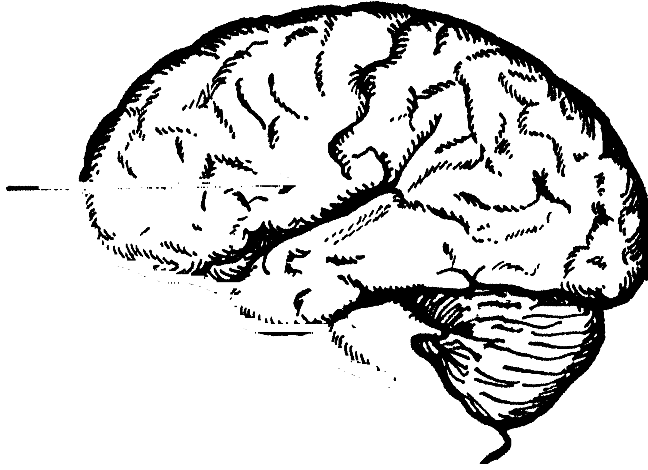
মস্তিষ্কের কাজটাকে আর-একটু ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

চোখে আলো এসে পড়লো। স্নায়ু বেয়ে চোখ থেকে খবরটা চলে গেলো মস্তিষ্ক পর্যন্ত, যেমন ইলেকট্রিকের তার বেয়ে টেলিগ্রাফের খবর যায় এদেশ থেকে ওদেশে। মস্তিষ্ক সেই খবরটার ব্যাখ্যা করলো, অর্থাৎ আমরা ওই আলোর কথাটা জানতে পারলাম। মস্তিষ্ক যদি কোনো কারণে তার কাজটি না করতো? তাহলে, চোখ থাকতেও আমরা অন্ধ হয়ে থাকতাম—কিছুই দেখতে পেতাম না।

এই হলো মস্তিষ্কের এক নম্বর কাজ: আমাদের ইন্দ্রিয়রা বাইরের পৃথিবী থেকে যে-খবর পাচ্ছে তা গ্রহণ করা, ব্যাখ্যা করা।

দু-নম্বর কাজ হলো আমাদের শরীরকে বা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে পরিচালনা করা। আমরা যাই করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তা ওই মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুসারেই করি। হাত নাড়ানো, ঠোঁট নাড়ানো, জিভ নাড়ানো, পা নাড়ানো—সবকিছুই। হাত নাড়ানো মানে? মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু বেয়ে হাতের পেশী পর্যন্ত খানিকটা স্নায়বিক শক্তি আসে, ফলে কুঁচকে ওঠে হাতের পেশী,—হাত নড়ে। কথা বলবার বেলাতেও ঠিক এই রকমই হয়। অর্থাৎ কথা বলবার জন্যে শরীরের যা-কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার তার সবই মস্তিষ্কের ফরমাশ অনুসারে হয়।

কিন্তু মস্তিষ্কের সব-অংশই এক কাজ করে না। আলাদা-আলাদা দায়িত্ব আলাদা-আলাদা কেন্দ্রের উপর। যে-সব এলাকা ইন্দ্রিয় মারফত বাইরের পৃথিবীর সংবাদ সংগ্রহ করছে সেগুলিকে বলে 'সেন্সরি' এলাকা আর যে-সব এলাকা থেকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চালনা করা হয় সেগুলিকে বলে 'মোটর' এলাকা। আবার, সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনই মস্তিষ্কের এক জায়গা—বা একই মোটর কেন্দ্র—থেকে হচ্ছে না। মস্তিষ্কের আলাদা-আলাদা কেন্দ্র আলাদা-আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করছে।



হাতিয়ার-ব্যবহার আর ভাষা ব্যবহার

কিন্তু মস্তিষ্কের পক্ষে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করবার ব্যাপারে একটা ভারি মজার বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যে-কেন্দ্রগুলির উপর হাত-নাড়াবার দায়িত্ব আর যে-কেন্দ্রগুলির উপর কথা বলবার দায়িত্ব, তারা নেহাতই পাশাপাশি আর ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে রয়েছে। ফলে এই দু রকম কেন্দ্রের মধ্যে একটির কাজ অনেক সময় আর-একটির কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, আর-একটির কাজের উপর উপছে গিয়ে পড়ে। ইংরেজিতে একে বলে স্প্রেড বা *spread*।

নমুনা দেখা যাক।

লেখবার সময়ে হাতের আঙুলকে নিপুণভাবে কাজে লাগানো দরকার। বাচ্চারা যখন লিখতে শেখে তখন দেখা যায়, আঙুল চালানোর সঙ্গেই ওরা জিভও চালাচ্ছে—হয়তো কথাগুলি উচ্চারণও করছে। মুখ দিয়ে উচ্চারণ না করে হাত দিয়ে লিখতে পারাই যেন সম্ভব হচ্ছে না। হাতের কাজ আর মুখের ভাষা একই সঙ্গে জড়িয়ে যেতে চাইছে।

আবার মুখের ভাষাও প্রায়ই হাত-নাড়ানোর সঙ্গে জড়িয়ে যায়, এমনকি হাত-নাড়ানোর উপর নির্ভর করে। এই কারণেই,

কথা বলবার সময় শিশুরা অতো বেশি অঙ্গভঙ্গি করে। অঙ্গভঙ্গি বাদ দিয়ে যেন কথাটা বলতে পারাই সম্ভব নয়। বড়োরাও করে; বক্তৃতা দেবার সময়ে হাত নাড়ায়, হাত না-নাড়িয়ে অনেক সময় বঁক্তৃতাই দিতে পারে না। তবে, বড়োদের বেলায় কম। শিশুদের বেলায় বেশি। কিন্তু ব্যাপারটা একই। স্প্রেড। মুখের কথার সঙ্গে হাতের কাজ জড়িয়ে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? মস্তিষ্কের যে-কেন্দ্রগুলির উপর কথা-কওয়ানোর দায়িত্ব আর যে-কেন্দ্রগুলির উপর হাত-চালানোর দায়িত্ব—তারা বড্ড পাশাপাশি বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে রয়েছে।

এদিক থেকে পৃথিবীর অসভ্য আর আদিম মানুষেরা অনেকটা শিশুর মতোই। কথা বলার সময় ওরাও অসম্ভব বেশি অঙ্গভঙ্গি করে। না-করে পারে না। যাঁরাই ওদের পরীক্ষা করেছেন তাঁরাই এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। এমনকি, অনেক সময় দেখা গিয়েছে হাত-নাড়ানোটাই তাদের ভাষার একেবারে অপরিহার্য অঙ্গ। অঙ্গভঙ্গি বাদ দিলে তাদের ভাষার অর্থই অসমাপ্ত থাকে।

তাহলে শুধু শিশুদের দৃষ্টান্তই নয়; মানবজাতির যতো শৈশবের দিকে আমরা চেয়ে দেখি ততোই আমাদের চোখে পড়ে ভাষার সঙ্গে হাতের কাজের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এর থেকে কি অনুমান করা যায় যে আদিম অবস্থায় মানুষের হাতের কাজ আর মুখের ভাষা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলো—ভাষা ছিলো হাতের কাজের অপরিহার্য অঙ্গ?

কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে মানতে হবে, মানুষের ভাষা নেহাতই মুখের কথা নয়। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, গাছের বাসা ছেড়ে সমতল জমির উপর নেমে আসতে বাধ্য হবার পরও মানুষ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি তার কারণ মানুষের মস্তিষ্ক আর মানুষের হাত। এই হাত আর মস্তিষ্কের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী: একদিকে

যেমন মস্তিষ্কের দরুন হাতের উন্নতি হয়েছে অপরদিকে আবার হাতের দরুনও মস্তিষ্ক উন্নত হতে পেরেছে। এখন আমরা দেখছি, হাতের সঙ্গে মুখের ভাষার সম্পর্কটাও নিবিড়। এমনকি, আমরা দেখেছি এ-কথা অনুমান করবারও সুযোগ রয়েছে যে আদিম অবস্থায় হাতের কাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিলো মুখের ভাষা। যদি তাই হয় তাহলে মানতে হবে মানুষের জাত যে পৃথিবী থেকে মুছে গেলো না, নিশ্চিহ্ন হলো না, তার একটি প্রধান কারণ মানুষের ভাষা।

এইদিক থেকেই ছান্দোগ্য-উপনিষদের ওই কথাটি ভেবে দেখা যায়। ভাষাই হলো মানুষের সার—পুরুষস্য বাক্ রসঃ। আসলে উপনিষদ খুবই প্রাচীন কালের রচনা। তাই এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে যাঁরা উপনিষদ রচনা করেছিলেন তাঁদের স্মৃতি থেকে ভাষার সঙ্গে হাতের কাজের—এবং অতএব বাঁচা-মরার—সম্পর্কটার কথা আজকালকার মতো এতোখানি ঝাপসা হয়ে যায় নি।

শুধু আমাদের দেশের উপনিষদই নয়; অন্যান্য দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় বাক্ বা ভাষাকেই মানুষের সার বলে কল্পনা করা হয়েছে।

ভাষা আর চিন্তাশক্তি

হাতের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক দেখলাম। ভাষার সঙ্গে হাতের সম্পর্ক দেখলাম। কিন্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে ভাষার কি কোনো সম্পর্ক দেখা যায়?

ভেবে দেখা যাক।

বনমানুষদের মস্তিষ্ক মানুষের মতো ভালো না হলেও পশুরাজ্যের বাকি সকলের চেয়েই ভালো। আর তারই দরুন পশুরাজ্যের মধ্যে ওই বনমানুষেরাই হাতিয়ার ব্যবহারের সবচেয়ে

কাছাকাছি পৌঁছেছে বলে দেখা যায়। ওরা ইটপাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি করতে পারে, গাছের ভাঙা ডালকে অন্তত খানিকটা লাঠির মতো করে ব্যবহার করতে পারে—একে হাতিয়ার ব্যবহার না বললেও তার খানিকটা কাছাকাছি পৌঁছানোর লক্ষণ বলা যায়।

কিন্তু ওরা কেউ কথা কইতে পারে না। প্রকৃত হাতিয়ারের মতোই ভাষাও একমাত্র মানুষেরই সম্পদ। তার কারণ কিন্তু মানুষদের গলার—স্বরযন্ত্রটুকুরই—বৈশিষ্ট্য নয়। বেশির ভাগ বনমানুষেরই স্বরযন্ত্র যথেষ্ট ভালো, ভাষা ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত। তবুও ওরা শুধুই কিচির-মিচির করতে জানে, শুধু চিৎকারই করতে পারে—কথা কইতে পারে না।

কথা কইতে পারা মানে কী? গলার স্বরকে মনের ধারণার বাহক করে দেওয়া। আমার মনে একটা ধারণা আছে—ধরা যাক, "বই" বলে একটা জিনিসের ধারণা। সেটাকে আমি অপরের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমি করবো কি, এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করবো—গলার স্বরকে এমন ভাবে ব্যবহার করবো—যে শব্দটা অপরের কাছে পৌঁছুলে পর সেও ওই একই জিনিসের ধারণা পাবে। অর্থাৎ, গলার স্বর হয়ে যাবে ধারণার বাহক। তখনই তা ভাষা হয়ে দাঁড়াবে।

তাহলে, কথা কওয়া মানে কী? স্বর দিয়ে, শব্দ দিয়ে মনের ধারণা বা মনের চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারা। বনমানুষেরা কথা কইতে পারে না—কথা কইবার জন্যে স্বরযন্ত্র বলে যে-অঙ্গ থাকা প্রয়োজন তা থাকা সত্ত্বেও নয়। কেননা, প্রকাশ করবার মতো ওদের মাথায় কোনো ধারণা নেই, কোনো চিন্তা নেই।

চিন্তা ছাড়া ভাষা হয় না। চিন্তা করতে না-পারলে কথা কওয়া যায় না।

কিন্তু ভাষা ছাড়া কি চিন্তা করা যায়? তাও যায় না। এ নিয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করেছেন। তাঁরা বলছেন, চিন্তা আসলে অনুচ্চারিত ভাষা ছাড়া আর কিছুই নয়। কথা কওয়াই—তবে উচ্চারণ করে নয়, যেন মনে-মনে কথা কওয়া, যেন গোপনে কথা কওয়া, যেন নিঃশব্দে কথা কওয়া।

একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যাবে। আমি চিন্তা করছি, কলমটা মেরামত করতে হবে। চিন্তাটা ভাষায় বললাম। কিন্তু ভাষা না থাকলে কি চিন্তা করতে পারতাম? ওই কটা কথা যদি আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হতো, যদি আমার মন থেকে সবকটা শব্দ একেবারে মুছে যেতো—তাহলে কি আমি ওকথা ভাবতে পারতাম? কথা বাদ দিয়ে ভাববার চেষ্টা করলে দেখা যায়—ফাঁকা। ভাবনা বা চিন্তা বলে কিছুই নেই।

শিশুরা চিন্তা করতে শেখে। কথা কইতে শেখে। একই সঙ্গে। যা-কিছু ভাবে তাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে—উচ্চারণ-করে-করে চিন্তা করে। এইজন্যেই শিশুদের নিয়ে বড়োরা অনেক সময় মুশকিলে পড়েন। কেননা বড়োরা জানেন, মনের সব কথা সবসময় বলে ফেলা ঠিক নয়। অনেক চিন্তাকে চেপে দিতে হয়—তার মানে মুখ ফুটে বলতে নেই; মনে মনে বলা যায়, নিঃশব্দে বলা যায়। বড়োদের কাছ থেকে শিশুরাও ক্রমশ তাই শেখে। তখন মনে হয়, চিন্তা এক, ভাষা আর-এক। আসলে তা নয়। চিন্তাও ভাষাই। তবে মুখ-ফুটে-বলা ভাষা নয়।

চিন্তা করি কিসের সাহায্যে? মস্তিষ্কের সাহায্যে। তাহলে ভাষার সঙ্গে শুধুমাত্র হাতের সম্পর্কই নয়, মস্তিষ্কেরও সম্পর্ক রয়েছে।

মানুষের ভাষা আর মানুষের সমাজ

মানুষের বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে ভাষার সমস্যাটা আর-একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

শব্দ দিয়ে আমরা মনের ধারণা প্রকাশ করি। ধারণাটা না-থাকলে শব্দের কোনো মানে হয় না। কিন্তু কোন্ শব্দ দিয়ে কোন্ ধারণা প্রকাশ করা হবে?

ধরা যাক একটা শব্দ। ফুল। কিসের ধারণা প্রকাশ করছে? আমরা বলবো, কুসুমের ধারণা—যা গাছে ফোটে। সাহেবরা বলবে, বোকার ধারণা,—যার বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। কিংবা ধরা যাক আর-একটা শব্দ। বেল। কিসের ধারণা বয়ে আনছে? আমাদের কাছে একরকম ফলের ধারণা। সাহেবদের কাছে ঘণ্টার ধারণা।

একই শব্দ দু-দেশের মানুষদের কাছে দুরকম ধারণার বাহক। এমনটা কী করে হয়? তার কারণ, শব্দের সঙ্গে ধারণাটাকে বেঁধে দিয়েছে সমাজ, মানুষের সমাজ। মানুষের সমাজ এক নয়। এ-সমাজে একরকম, ও-সমাজে আর-একরকম। আমাদের সমাজে একরকম, সাহেবদের সমাজে অন্য রকম।

ভাষা ছাড়া মানুষকে বোঝা যায় না। সমাজ ছাড়া ভাষার রহস্য বোঝা যায় না। আমি যদি একা হতাম তা হলে না হয় যে-কোনো শব্দকে যে-কোনো ধারণার বাহক করে নিতে পারতাম। কিন্তু আমি একা নই; আমার একার জন্যে ভাষা নয়। তাই একটি নির্দিষ্ট শব্দকে আমি একটি নির্দিষ্ট ধারণারই বাহক করতে বাধ্য। কোন নির্দিষ্ট ধারণার? আমার সমাজের বাকি সকলে ওই শব্দটিকে যে-ধারণার বাহক করেছে শুধু সেইটিরই। বই বলতে আমরা সবাই বই বুঝি। তার বদলে কেউ যদি বলে, বই বলতে আমি হাতি বুঝবো, বা ঘোড়া বুঝবো? তাহলে তার

কথাও কেউ বুঝবে না, সেও কারুর কথা বুঝতে পারবে না। অর্থাৎ, এ-ক্ষেত্রে ভাষাই হবে না।

ভাষা নিয়ে মানুষ জন্মায় না। শিশুকে ভাষা শিখতে হয়। তার মানে, বাকি সকলেই যে-শব্দের যে-মানে করে শিশুকেও সেই শব্দের সেই মানে শেখানো হয়। শেখা মানেই, সমাজে যা স্বীকৃত তাই আয়ত্ত করা।

মানুষের সঙ্গে বাকি সব জানোয়ারের আর-একটা মস্ত তফাত এবার বুঝতে পারা যাবে। প্রথমত মনে রাখা দরকার, অন্যদের তুলনায় মানুষের শৈশব অনেক দীর্ঘ—মানুষের পক্ষে বড়ো হতে অনেক বেশি সময় লাগে। কোনো কোনো জন্তু তো জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই চলা-ফেরা দৌড়ঝাঁপ করতে পারে। হাতির বাচ্চা জন্মের দুদিন পরেই মার পেছু-পেছু চলতে শিখে যায়। মাংসাশীর বাচ্চারা জন্মের পর মাস কয়েক অসহায় ভাবে থাকে। গিবনের বাচ্চারা সাত মাস পর্যন্ত মা-কে আঁকড়ে থাকে। ওরাং-ওটাং-এর বাচ্চারা বড়ো হয় আরো বেশি দেরি করে। আর মানুষ? মানুষেরই শৈশব হলো সবচেয়ে সুদীর্ঘ। কোনোমতে টলমল করে হাঁটতেই প্রায় এক-বছর লেগে যায়।

বড়ো হবার জন্যে মানব-শিশুর এই যে সুদীর্ঘ সময় লাগে, এই সময়টি ধরে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় সমাজের সঞ্চিত জ্ঞান, সঞ্চিত অভিজ্ঞতা। এই জন্যেই শিশু যখন বড়ো হয়—মানুষ হয়—তখন সে একান্তই সমাজের মানুষ, সামাজিক জীব। তার সমাজের যা কিছু আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সব নিয়েই সে বড়ো হয়।

প্রকৃতির সঙ্গে নতুন সম্পর্ক

মানুষের পক্ষে পশুর রাজ্য ছেড়ে আসবার কথাটা এইবারে আরো ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। অনেকগুলো বিষয়ের

আলোচনা হলো; সবকটা কথা একসঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে হবে।

গাছের বাসা ছেড়ে আদিম বনমানুষের বংশধরেরা যখন সমতল জমির উপর নেমে আসতে বাধ্য হলো তখন অন্যান্য অনেক জানোয়ারের তুলনায় নানান দিক থেকেই তারা অনেক অসহায়। জীবন-সংগ্রামের জন্য তাদের প্রধানত দুটি সম্বল। এক, অন্যদের তুলনায় ভালো মস্তিষ্ক। দুই, চলা-ফেরার-কাজ-থেকে-মুক্তি-পাওয়া দুটি হাত। এরই সাহায্যে মানুষ বাঁচবার চেষ্টা করছে। ফলে উন্নত হয়েছে তার মস্তিষ্ক আর তার হাত—দুইই।

মস্তিষ্কের উন্নতি হাতকে উন্নত করেছে। আবার হাতের উন্নতিও মস্তিষ্ককে উন্নত করেছে।

আর ওই মস্তিষ্ক আর হাত দুয়ের উন্নতির উপর নির্ভর করেই মানুষ কথা কইতে শিখেছে, ভাষা পেয়েছে। এ-ভাষা একের সম্পত্তি নয়, একার সম্পত্তি নয়, পুরো সমাজের সম্পত্তি। ভাষা-ভাষী হিসেবে মানুষ একান্তই সামাজিক জীব।

মস্তিষ্ক, হাত, ভাষা—এই তিনটি সহায় হলো একরকম নতুন জীবের। তার নাম মানুষ। সে সামাজিক জীব।

ফলে হলো কী? প্রকৃতির মধ্যেই প্রকৃতির সঙ্গে একরকম নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠলো। কথাটা ভালো করে বোঝা দরকার।

মানুষ সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতিরই আরো অনেক রকম জিনিসের মধ্যে একরকম জিনিস। এই প্রকৃতিরই কয়েক রকম মৌলিক পদার্থ মিলে আদিম জীব সৃষ্টি হয়েছিলো আর অনেক অনেক কোটি বছর ধরে অনেক অনেক বংশপরম্পরা উত্তীর্ণ হয়ে সেই আদিম জীবেরই একরকম বংশধর শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়েছে। মানুষ তাই প্রকৃতিছাড়া কিছু নয়—প্রকৃতিরই অঙ্গ।

তবুও প্রকৃতির অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও এই মানুষই প্রকৃতিকে বদল

করতে শুরু করেছে ;—মানুষ যে-রকম ভাবে চায় সেই রকম ভাবে বদল করে নিতে, অর্থাৎ তার নিজের পরিকল্পনা-মতো, চাহিদা-মতো। মানুষ যে তা পেরেছে তার কারণ হলো মানুষের মস্তিষ্ক, তার হাত, তার ভাষা।

মানুষের ইতিহাস বলতে অনেকখানিই হলো প্রকৃতির সঙ্গে এই অভিনব সম্পর্কটির কাহিনী।

এ-সম্পর্ককে আমরা বলবো সক্রিয় সম্পর্ক আর ওই সক্রিয়-সম্পর্ককে বিচার করলে আমরা সেই মূল কথা দুটিকেই নতুন করে দেখতে পাবো : মানুষের মস্তিষ্ক আর মানুষের হাত, মানুষের জ্ঞান আর মানুষের কর্ম।

চলতি কথায় আমরা বলি, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে। কিন্তু জয় করা মানে কী ? একদল সৈন্য একটা দেশ আক্রমণ করলো, জয় করলো। তারা কিন্তু ও-দেশের কেউ নয়, তারা দেশের বাইরে থেকে এসেছে, তারা আগন্তুক। মানুষ যে প্রকৃতিকে জয় করছে তাও কি এই ভাবেই নাকি ? নিশ্চয়ই নয়। কেননা, মানুষ প্রকৃতির বাইরে থেকে আসে নি ; সে প্রকৃতিরই অংশ, প্রকৃতিরই জিনিস। তাহলে তার পক্ষে প্রকৃতিকে জয় করবার অর্থটা কী ?

দু-একটা নমুনা বিচার করা যাক।

পৃথিবীতে যে-খাবারের যোগান রয়েছে তাই খেয়েই জন্তু-জানোয়ারেরা জীবন ধারণ করে। এটা হলো প্রকৃতির সঙ্গে নিষ্ক্রিয় সম্পর্ক, প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বাঁচবার নমুনা। কিন্তু মানুষ জঙ্গল কেটে জমি সাফ করে, চাষ করে, ফসল ফলায়, তাই খেয়ে জীবন-ধারণ করে। এটা হলো প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক। প্রকৃতিতে যা ছিলো না, যা আপনি গড়ে উঠতো না, প্রকৃতিকে তাই সৃষ্টি করতে, গড়ে তুলতে, বাধ্য করা। এই হলো মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে জয় করবার নমুনা।

কিন্তু কোন অর্থে জয় করা ? প্রকৃতির ঘাড়ে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কতকগুলো ফরমাশ চাপিয়ে দেওয়া নাকি ? নিশ্চয়ই নয়। তা চাপিয়ে দিতে গেলেও প্রকৃতি শুনবে না। তাহলে ?

প্রকৃতিরই নিয়মকে স্পষ্টভাবে চিনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। আর শুধু জানাই নয়। সেই নিয়ম জেনেই অগ্রসর হতে হবে—কাজ করতে হবে ; তবেই প্রকৃতির কাছে মানুষ যা চায় তা পাবে। কোন নিয়ম অনুসারে মাটির বুকে ফসল ফলে তা স্পষ্টভাবে জানা চাই ; আবার অপরদিকে সেই নিয়মের উপরই নির্ভর করে ফসল ফলাবার চেষ্টা করা চাই—তবেই ফসল ফলবে।

তাহলে প্রকৃতিকে জয় করা মানেই হলো প্রকৃতিকে মানা, স্বীকার করা। এই স্বীকৃতির দুটো দিক আছে। একদিকে জানা আর একদিকে করা, একদিকে প্রকৃতির নিয়মকে চেনা আর অপরদিকে সেই নিয়ম মেনে চলা। মস্তিষ্কের সাহায্যেই এই নিয়মকে চেনা আর হাতের সাহায্যেই এই নিয়মকে মেনে কাজ করা। তাই, একদিকে মস্তিষ্ক, আর একদিকে হাত। আমরা আগেই দেখছি, একদিকে যেমন মস্তিষ্ক হাতকে চালনা করেছে, উন্নত করেছে, অপরদিকে আবার হাতও মস্তিষ্ককে বড়ো হতে, উন্নত হতে, সাহায্য করেছে। প্রকৃতিজয়ের বেলাতেও এই নিয়মটিই চোখে পড়ে। মানুষ যদি হাত গুটিয়ে চুপটি করে বসে থাকে তাহলে কোনোদিনই সে প্রকৃতিকে জানতে পারবে না, প্রকৃতির নিয়মকে চিনতে পারবে না। দীর্ঘ যুগ ধরে ফলমূল আহরণ করবার একটানা চেষ্টা থেকেই শেষ পর্যন্ত মানুষ জানতে পেরেছে কোন্ নিয়মের দরুন কেমন ভাবে মাটির বুকে ফসল ফলে। হাতের চেষ্টাই জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছে। অপর পক্ষে, মানুষ যদি শুধু ওই জ্ঞানটা পেয়েই থেমে যেতো ? তাহলেও মানুষের অগ্রগতি ওইখানেই থেমে থাকতো। তা থাকে নি, কেননা মানুষ ওই জ্ঞানকে

মেনে সত্যিকারের ফসল ফলাবার চেষ্টা করে চলেছে। আবার, যতো ভালো করে মানুষ এই কাজের চেষ্টা চালিয়েছে ততোই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে তার জ্ঞান। একদিকে জ্ঞান আর তার উলটো দিকেই কাজ; একদিকে মস্তিষ্কের অবদান আর অপরদিকে হাতের অবদান।

তাহলে প্রকৃতির মধ্যেই এই এক অভিনব সম্পর্কের সূচনা হয়েছে: প্রকৃতিরই আরো পাঁচ রকম জিনিসের মতো এক রকম জিনিস—মানুষ—প্রকৃতির নিয়মকেই যতো স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করতে পারছে ততোই ভালো করে পারছে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে, বদল করতে। মানুষের ইতিহাস বলতে একদিকে এই সম্পর্কটিরই কাহিনী।

আরো একটা দিক আছে। সে-দিকটার কথা মনে না রাখলে মানুষের ইতিহাস বোঝা যাবে না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে সক্রিয় সম্পর্ক তার মূলে রয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক আর মানুষের হাত। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, মস্তিষ্ক আর হাত—দুয়ের সঙ্গেই মানুষের ভাষার সম্পর্ক আছে আর মানুষের সমাজের কথা ছাড়া ভাষার কথাটা বোঝাই সম্ভব নয়।

তাহলে, সমাজের কথাও এলো। প্রকৃতির মধ্যেই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই যে অভিনব সম্বন্ধ তারই মধ্যে রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের কথাও,—সমাজের কথাও। প্রকৃতির সঙ্গে ওই সক্রিয় সম্পর্কের ইতিহাসই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে—মানুষের সমাজকে—বদলে দিয়েছে। আবার অপরদিকে মানুষে-মানুষে এই সম্পর্ক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককেও—মানুষের প্রকৃতি-বিজয়কেও—প্রভাবিত করেছে: কখনো-বাধা দিয়েছে, কখনো এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

মানুষের ইতিহাস বলতে এই সব কথাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাতিয়ার

প্রায় এক শ বছর আগের ঘটনা। অন্যান্য বছরের তুলনায় ইউরোপে সেবার একটু বেশি গরম পড়েছে। খরার তাপে নদীনালা, পুকুর-পুষ্করিণীর জল শুকিয়ে যেতে লাগলো। ইউরোপের উত্তরে ছোট্ট দেশ স্যুইট্জারল্যাণ্ড ছোটোবড়ো অজস্র হ্রদে ভর্তি। জল শুকিয়ে যেতে হ্রদের ঢালু গা যতো উপরে উঠে আসতে লাগলো, ততোই একটা আশ্চর্য জিনিস সকলের নজরে এলো। হ্রদের গায়ে ছড়ানো এমন সব বহু পুরোনো জিনিসপত্র দেখতে পাওয়া গেলো, যেগুলোকে মানুষ কোনো এক সময়ে তার রোজকার কাজে ব্যবহার করেছিলো। কাঠের-বাঁট-লাগানো পাথরের কুড়ুল, কাঠের বাঁটটা যদিও এতোদিনে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে কোথায় মিশে গেছে,—জিনিসপত্র রাখবার ঝাঁকা, এমনকি খাবার তৈরি করা হতো যা দিয়ে সেই গমের দানা পর্যন্ত—রকমারি জিনিসপত্র এবং হাতিয়ার এই হ্রদগুলোর গা থেকে পাওয়া গেলো। বহুকাল আগে এখানে যে মানুষের বসতি ছিলো, তা পরিষ্কার বোঝা গেলো।

পাথর : ব্রোঞ্জ : লোহা :

স্যুইট্জারল্যাণ্ডের হ্রদের গায়েই শুধু নয়। কিছুদিন আগে থেকে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে আরো অনেক জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছিলো, সেগুলো কোনো না কোনো সময়ে মানুষই ব্যবহার করতো। এই সমস্ত জিনিসপত্র এবং হাতিয়ারগুলো প্রধানত তিনটি উপাদান দিয়ে তৈরি : পাথর, তামা বা ব্রোঞ্জ এবং লোহা।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এগুতে-এগুতে মানুষ যখন তামা এবং

তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করে তার হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছিলো, তখন পাথরের ব্যবহার স্বভাবতই কমে এসেছিলো। আবার, লোহার আবিষ্কারে ব্রোঞ্জের কদরও কমে এসেছিলো। সুতরাং পৃথিবীর বুকে আবির্ভাবের পর মানুষ প্রথমে পাথর, তারপর তামা ও ব্রোঞ্জ, এবং সবচেয়ে শেষে লোহার তৈরি হাতিয়ার এবং জিনিসপত্র ব্যবহার করে এসেছে, সেটা বোঝা যায়। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের মানুষরাও এ খবরটি জানতেন। কারণ তাঁরা যে সমস্ত পুঁথিপাটা লিখে রেখে গেছেন তা থেকেও এই খবরটি জানা যায়।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের মানুষরা এ-খবরটি জানলেও, মানুষের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে এই ধারণাটির সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত প্রতিষ্ঠা হলো ১৮৩৬ সালে। আদিম যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার এবং জিনিসপত্রগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে বাছাই করে ডেনমার্কের কোপেনহ্যাগেন জাতীয় মিউজিয়ামের জে. সি. টম্‌সেন্‌ এই বছর ঘোষণা করলেন যে, আদিম মানুষের সমাজ থেকে আজকের মানুষের সমাজ পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির ধাপ প্রধানত তিনটি : পাথরের যুগ, তামা ও ব্রোঞ্জের যুগ, এবং লোহার যুগ।

মানুষের আদিম ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করা হলো বটে, কিন্তু তখনো একটা বড়ো ফাঁক থেকে গেলো। সেটা হলো, তামা বা ব্রোঞ্জ-যুগ এবং লোহার যুগে মানুষ যে ছিলো, তার ভূরি-ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু পাথরের হাতিয়ার এবং জিনিসপত্র ব্যবহার করতো, এমন মানুষের সমাজ কি সত্যি সত্যিই ছিলো?

পাথরের যুগের মানুষ

১৮৩৬ সালে টমসেনের বৈজ্ঞানিক ঘোষণা সম্বন্ধে আই যে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারছিলো, তার নিরসন হলো এর আঠারো বছর পরে,

১৮৫৪ সালের সেই খরায়। সুইট্জারল্যাণ্ডের শুকিয়ে-যাওয়া হ্রদের গায়ে মানুষের যে বসতির চিহ্ন অভ্রান্তভাবে দেখা গেলো, সেখানে সমস্ত হাতিয়ার এবং জিনিসপত্রের মধ্যে ব্রোঞ্জ বা লোহার ব্যবহারের কোনো সামান্য চিহ্ন পর্যন্তও দেখতে পাওয়া যায় না। সবকিছুই পাথরের তৈরি। অর্থাৎ, এখানে যে মানুষরা বসবাস করতো, তারা ব্রোঞ্জ বা লোহার ব্যবহার জানতো না, সেটা পরিষ্কার। সুতরাং, মানুষ যে একসময় শুধু পাথরের হাতিয়ার এবং জিনিসপত্র ব্যবহার করতো তার নির্ভুল প্রমাণ এখানে পাওয়া গেলো।

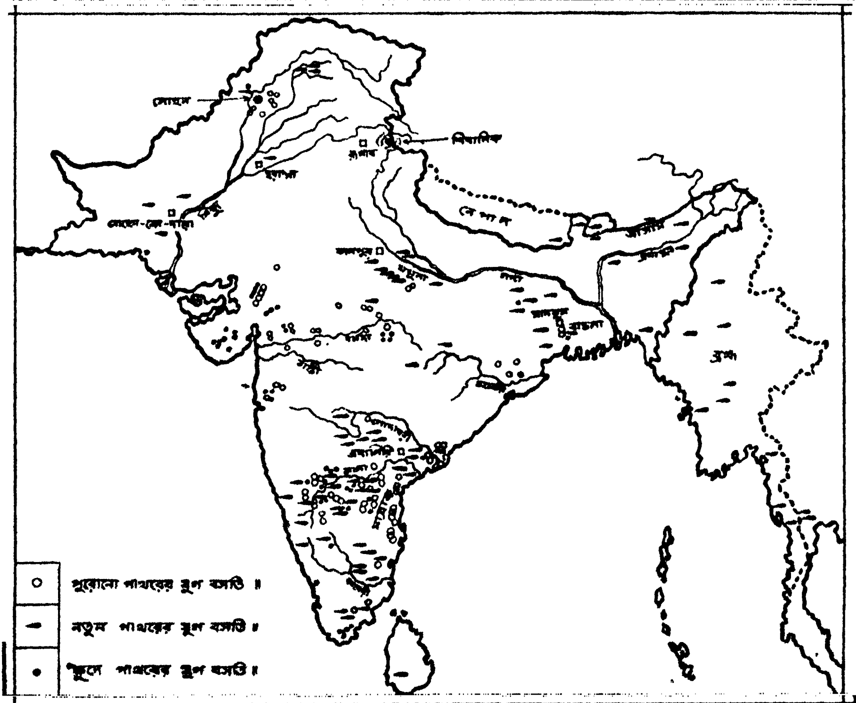
এর আগে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নানা জায়গা থেকে অতি প্রাচীন যুগের মানুষের ব্যবহৃত পাথরের তৈরি অনেক হাতিয়ার এবং অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাচ্ছিলো। এমনকি, এককালে পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত অতিকায় জীবজন্তু চলাফেরা করতো, তাদের হাড়গোড়ের সঙ্গে একই জায়গায় মানুষের কঙ্কালও পাওয়া গিয়েছিলো। ১৮৪৭ সালে ফ্রান্সে সোম নদীর অতি প্রাচীন খাতের অসংখ্য পাথরের টুকরো এবং নুড়ির মধ্য থেকে ব্যুসের-দ্য-পের্থ নামে ফরাসী পণ্ডিত এমন সমস্ত নুড়ি সংগ্রহ করেছিলেন, যেগুলো মানুষের হাতের তৈরি এবং ব্যবহৃত বলে তিনি ঘোষণা করলেন। প্রথমে তাঁর কথায় কেউ কান না দিলেও ১৮৫৯ সালে ইউরোপের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা প্রায় সকলেই স্বীকার করলেন যে, ঐ নুড়িগুলোকে এককালে মানুষই নানাভাবে ভেঙেভুঙে তৈরি করে তার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে।

ঠিক একই সময়ে, ১৮৫৯ সালেই চার্লস ডারউইনের "দি অরিজিন অফ্ স্পিশিজ" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর বুকে জীবনের সূত্রপাত এবং তার ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষের

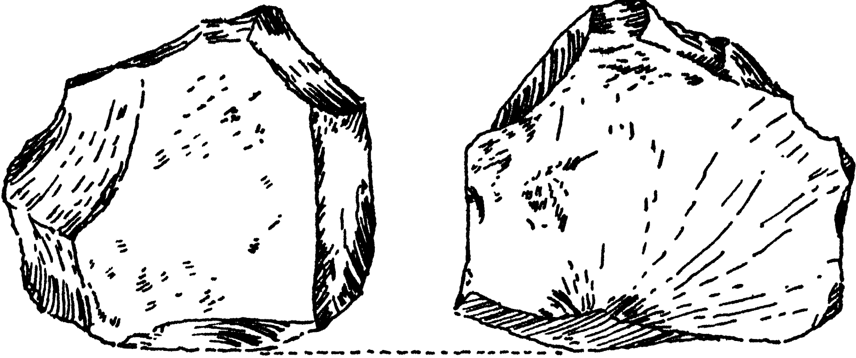
স্থান সম্পর্কে ধারণা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগলো। আর এই ইতিহাসের শুরু যে কতো সুদূর অতীতে তারও বিজ্ঞানসম্মত ধারণা পাওয়া গেলো এর ঠিক চার বছর পরে। ১৮৬৩ সালে বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ চার্লস্ লায়াল্ তাঁর "মানুষের প্রাচীনত্বে ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্য" ("জিওলজিক্যাল এভিডেন্স অফ্ দি অ্যান্টিকুইটি অফ্ ম্যান") গ্রন্থে পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের ধারার সঙ্গে মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধারার সম্পর্ক নির্ণয় করলেন।

ভারতবর্ষে

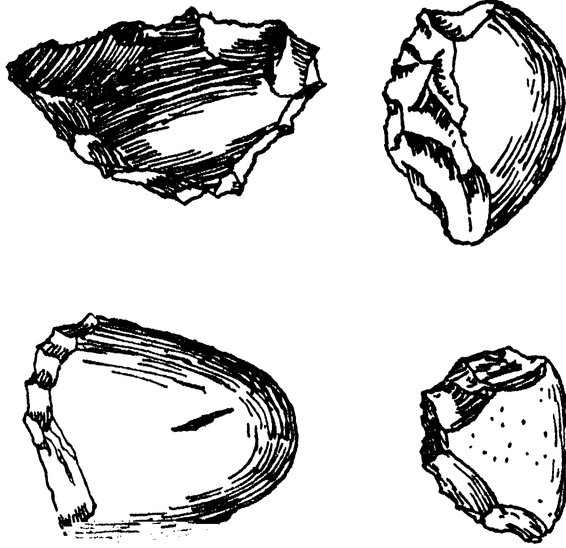
মানুষের আদিম ইতিহাস জানবার জন্য ইউরোপের এই প্রচণ্ড তোলপাড়ের ঢেউ ভারতবর্ষেও এসে লাগলো। ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভের ব্রুস্ ফুট্ সর্বপ্রথম এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে



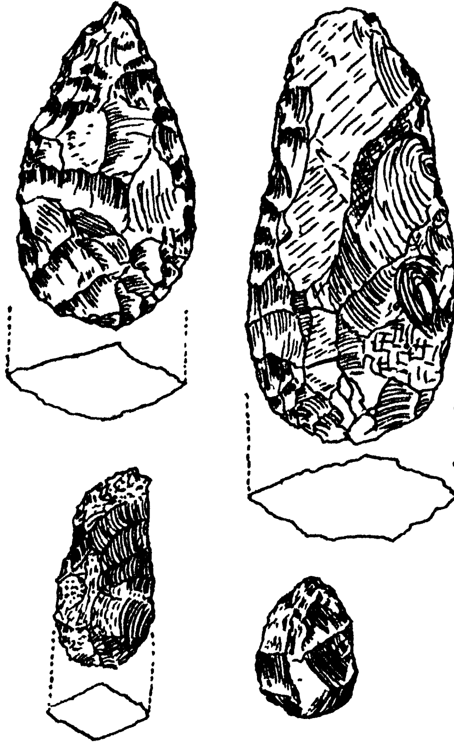
ভারতবর্ষে বিভিন্ন পাথরের যুগের বসতি



উত্তর ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন পাথরের হাতিয়ার। বড়ো বড়ো নুড়ি থেকে পরত তুলে এই হাতিয়ারগুলো তৈরি হতো। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই এগুলি প্রচলিত ছিলো



ভারতবর্ষে পুরোনো পাথরের গোড়ার যুগের হাতিয়ার। এগুলিও নুড়ি থেকে তৈরি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সোহন উপত্যকায় এই ধরনের প্রচুর হাতিয়ার পাওয়া গেছে বলে এগুলোকে প্রাচীন সোহন যুগের হাতিয়ার বলা হয়



পুরোনো পাথরের যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেমন পরত তুলে তা থেকে হাতিয়ার তৈরি হতো, দক্ষিণ ভারতে তেমনি পরত তুলে যা অবশিষ্ট থাকতো তাই দিয়ে হাতিয়ার তৈরি হতো। মাদ্রাজ অঞ্চলেই এই ধরনের হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে। উপরের দুটি মাদ্রাজ অঞ্চলে পাওয়া "হাত-কুড়ুল"। নিচের দুটির মধ্যে বাঁ দিকেরটি বোম্বাই এবং ডান দিকেরটি পাঞ্জাবে পাওয়া।

ওঠেন। ভারতবর্ষেও অতি অতি প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ বসবাস করে আসছে, এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ ভারতের পাথরের যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁর এই চেষ্টা সফল হতে বেশি সময় লাগেনি। ১৮৬৩ সালেই মাদ্রাজের কাছাকাছি কয়েকটি এলাকা থেকে তিনি এই ধরনের পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কার করলেন। ক্রমশ ক্রমশ আরো নানা জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে পাথরের যুগের হাতিয়ার পাওয়া যেতে লাগলো। প্রায় তেতাল্লিশ বছর ধরে অক্লান্ত উদ্যমে ব্রুস্ ফুট্ দক্ষিণ ভারতে পাথরের যুগের হাতিয়ারের অনুসন্ধান চালিয়ে যান। ভারতবর্ষে পাথরের যুগের মানুষের অস্তিত্বের আবিষ্কার

প্রধানত তাঁরই কীর্তি। তাঁর চেষ্টাতেই এদেশে প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিলো বলা যায়। ব্রুস্ ফুট্-এর আবিষ্কৃত এবং সংগৃহীত পাথরের যুগের সমস্ত জিনিসপত্র এবং হাতিয়ার এখন মাদ্রাজ সরকারী মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

অতীতের অতীত

সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে জ্ঞানের রাজ্যে একটা প্রচণ্ড ওলট-পালট হয়ে গেলো। মানুষ যে কোনো অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক ক্ষমতার উদ্ভট সৃষ্টি নয়, প্রকৃতির নিয়মকানুনের সঙ্গে পুরো সামঞ্জস্য রেখে প্রকৃতিরই বিবর্তনের একটা ধাপে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো—সেটা আর অস্বীকার করবার উপায় থাকলো না। এর আগে যে ধারণা ছিলো, প্রাচীন গ্রীস এবং রোম, বড়জোর প্রাচীন মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার আমল থেকেই মানুষের ইতিহাস শুরু হয়েছিলো, সে ধারণাও এখন নস্যাৎ হয়ে গেলো। প্রকৃতিতে পৃথিবীর বিবর্তনের ধারায় মানুষের আবির্ভাব সবচেয়ে আধুনিক, কিন্তু গ্রীস, রোম, মিশর, মেসোপটেমিয়ার তুলনায় মানুষের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। এক হাজার দু-হাজার বছর নয়, লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে মানুষ এই পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করছে, প্রকৃতির নিয়মকানুন ক্রমশ ক্রমশ বুঝে নিয়ে তার সঙ্গে সহযোগিতা করে সে ক্রমশ আজকের মানুষের সমাজে এগিয়ে এসেছে।

প্রকৃতির রাজ্যে সবচেয়ে দুর্বল জীব, সহায়সম্বলহীন মানুষ কীভাবে ধাপে ধাপে এই অগ্রগতির পথে এগিয়ে এসেছে, তা আজ মোটামুটি জানা যায়। কারণ, লক্ষ লক্ষ বছর আগের মানুষ আজ বেঁচে না থাকলেও, তার ব্যবহৃত অনেক হাতিয়ার এবং জিনিসপত্র আজও খুঁজে পাওয়া যায়। কাজেই পরের পর

মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলো পরীক্ষা করলে, মানুষের প্রাচীন ইতিহাসেরও অনেক খবর জানা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান গত এক শো বছরে এই ইতিহাসকেই তুলে ধরেছে।

কী সেই ইতিহাস?

ঊষার পাথরের যুগ

জাভা এবং চীনের পিকিং-এ সবচেয়ে আদিম যে মানুষের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত জানা গিয়েছে, তারাও হাতিয়ার ব্যবহার করতো। পিকিং-এ যে পাথরের হাতিয়ারগুলো পাওয়া গিয়েছে, হাতিয়ারের ইতিহাসে সেগুলোই হলো সবচেয়ে প্রাচীন। পিকিং-এর সেই প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যে ইতস্তত ছড়ানো পাথরের টুকরো থেকে কাজে লাগানোর জন্যে বেছে-বেছে কতকগুলোকে তার গুহায় বয়ে নিয়ে এসেছিলো, তা বেশ বোঝা যায়। অল্প কয়েকটির মধ্যে একটু ভাঙাভাঙি করে আরো বেশি কাজে লাগানোর চেষ্টার ছাপ আছে বটে, তবে তার মধ্যে কোনো নিপুণতাই নেই। চেহারার মধ্যেও বিশেষ একটা ধরন করবার কোনো ছাপ নেই। হাতিয়ারগুলোর ধরনধারন দেখে মনে হয় যে কোনো একটি সাময়িক প্রয়োজনে তখনকার মতো কাজে লাগে এমন একটি পাথরের টুকরো-ই পিকিং-এর এই মানুষরা ব্যবহার করতো। বারবার ব্যবহার করবার জন্যে সেটাকে যত্ন করে রেখে দেবার কথা তারা ভাবতো না, পরবর্তী প্রয়োজনের সময় অন্য আর



ঊষার পাথরের যুগের সাময়িক হাতিয়ার। পিকিং-এর আদিম মানুষের বসতি থেকেই এগুলো পাওয়া গেছে।

একটি পাথরের টুকরো ব্যবহার করা হতো। মানুষের ইতিহাসে একেবারে গোড়ার যুগের পাথরের এই হাতিয়ারগুলো ছিলো নেহাতই সাময়িক হাতিয়ার মাত্র। এই হাতিয়ারগুলোকেই "ইওলিথিক্" বা ঊষার যুগের পাথরের হাতিয়ার বলা হয়।

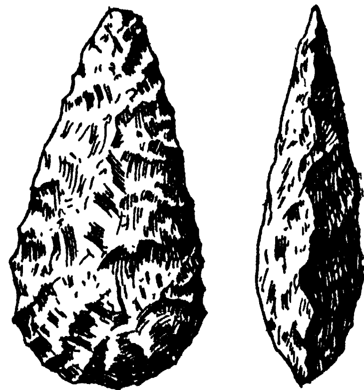
পুরোনো পাথরের যুগ

এর পরের স্তরে যে হাতিয়ারগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ দেবার, বিশেষত একটা দিক ধারালো করে তোলবার ঝোঁক দেখা যায়। হাতিয়ারগুলোর ধরন থেকে বোঝা যায় যে একটা পাথরের উপর হাতের পাথরটাকে ঘা মেরে, তা থেকে পরতের পর পরত তুলে সেটাকে কিংবা সেই তুলে-ফেলা পরতগুলো দিয়ে মনোমত হাতিয়ার তৈরি করা হতো। আজকালকার কামারের নেহাই-এর মতো ঘা মারবার জন্যে পাথরের এই ধরনের বড়েবড়ো খণ্ডও এই যুগের মানুষের বসতির মধ্যে অনেক পাওয়া গিয়েছে।

হাত কুড়ুল :

পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরির কাজটা এখন মোটামুটি ভেবেচিন্তেই করা হচ্ছে। এ যুগের হাতিয়ারগুলোর মধ্যেও তাই কয়েকটি বিশেষ রূপ ও ধরনের হাতিয়ারের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে এবং আমাদের ভারতবর্ষেও এ যুগের ব্যবহৃত ভূরি-ভূরি যে সব হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে মোটামুটি তিন-চার ধরনের হাতিয়ারের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্যে যে কটি হাতিয়ার সবচেয়ে বেশি কাজের বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, মানুষ ক্রমশ সেই কটি হাতিয়ারের কথা মনে

রেখেই নতুন হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছে। এক-একটা প্রয়োজনের সময় কী ধরনের হাতিয়ার চাই, এবং সেই ধরনটি কি ভাবে আনা যায়, এখন আর তা নিয়ে তাকে বিশেষ মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। সমাজের পুরো অভিজ্ঞতাটাই এখন তার সামনে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিশিষ্ট কয়েকটি ধরনের সবচেয়ে এই পুরানো হাতিয়ারগুলো হাত কুড়ুল বা "*Hand axe*" নামে পরিচিত। কিন্তু ঠিক কি কি নির্দিষ্ট কাজের জন্যে যে এই বিশিষ্ট হাতিয়ার-গুলো ব্যবহার করা হতো তা বলা মুশকিল। কারণ, এই হাতিয়ার-গুলো দিয়ে কাটা, চাঁছা, আঘাত করা—প্রায় সব কাজই করা সম্ভব ছিলো। খুব সম্ভব এই সব রকম কাজের জন্যেই এগুলোর ব্যবহার চলতো। "হাত-কুড়ুল" হাতিয়ারগুলো দিয়ে মোটামুটি সে যুগের প্রয়োজন মেটানোর মতো প্রায় সব রকম কাজই পাওয়া যেতো।



হাত কুড়ুল

আলাদা কাজে আলাদা হাতিয়ার

এর পরের যে হাতিয়ারগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে বিশিষ্ট একটি কাজের জন্যে বিশিষ্ট একটি হাতিয়ার ব্যবহারের ঝোঁক ক্রমশ বেশি বেশি লক্ষ্য করা যায়। আগের যুগের সবরকম কাজেই ব্যবহার করার বদলে এক-একটি হাতিয়ারকে এখন এক-একটি কাজের জন্যে নির্দিষ্ট রূপে ব্যবহার করা হতে লাগলো। অর্থাৎ, কাটা চাঁছা ছোলা আঘাত করা প্রভৃতির জন্যে একটিমাত্র হাতিয়ার নয়, প্রত্যেকটি কাজের জন্যে এখন আলাদা-আলাদা এক-একটি



মাংস চাঁছা বা কাটার জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার। পুরোনো পাথরের যুগে খুব সম্ভব গেরস্থালী কাজের জন্য মেয়েরাই এগুলো ব্যবহার করতো।

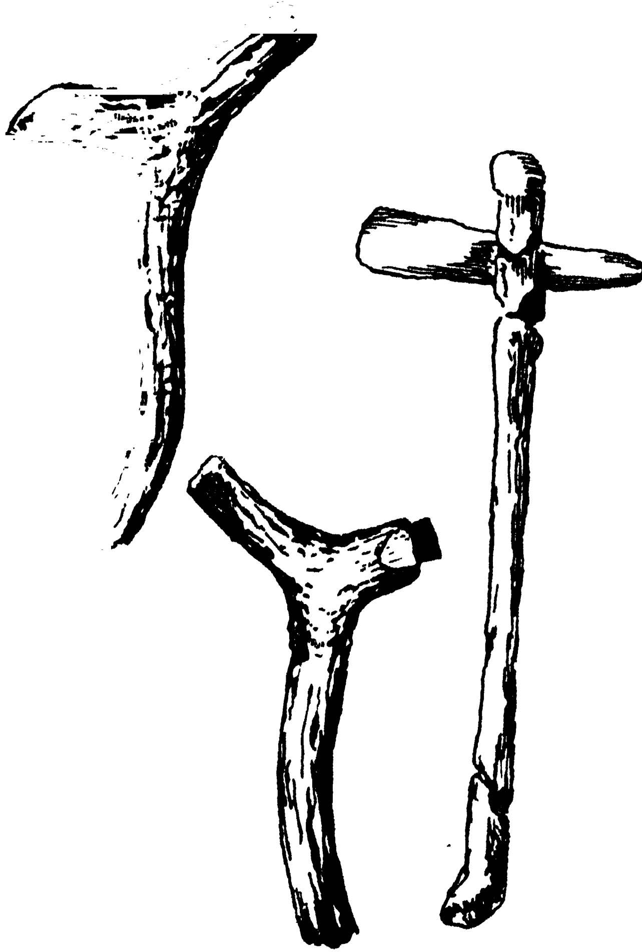


তিন-কোণা হাতিয়ার। খুব সম্ভব শিকার করবার উদ্দেশ্যে পুরুষরা এগুলো ব্যবহার করতো।

হাতিয়ার তৈরি হতে লাগলো। ফলে এক-একটি হাতিয়ার অনেক বেশি কাজের হয়ে উঠলো। ইউরোপের নিয়েণ্ডারটাল্ মানুষের সমাজেই এই যুগের হাতিয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অতিকায় হাতি এবং গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপশু শিকার করে এই সমাজের খাবারের সংস্থান হতো। সুতরাং এগুলোকেই আরো ভালো ভাবে শিকার করা, তাদের মাংস কাটা, চামড়া চেঁছে তোলা—ইত্যাদি কাজের জন্যেই হাতিয়ারগুলোর মধ্যে এক-একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারের ধরন এসে গেলো। ছুরি হিসাবে, অথবা বল্লমের আগায় লাগিয়ে অতিকায় এই জন্তুগুলোকে গভীর ভাবে আঘাত দরবার জন্যে দেখা দিলো দুপাশ-ধারালো ছুঁচলো তিনকোণা হাতিয়ার। আবার, শিকার-করা জন্তুগুলোর মাংস কেটেকুটে ছাল ছাড়িয়ে খাবারের উপযুক্ত করে তোলবার জন্যে তৈরি হলো চ্যাপ্টা আরেক রকম হাতিয়ার। এ যুগের প্রাচীন এই দু-রকম হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে মনে হয় যে মানুষের সমাজে তখন পুরুষ ও নারীর কাজের ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে। শিকারে-বেরুনো পুরুষের পক্ষে তিনকোণা ঐ ছুঁচলো

হাতিয়ারগুলো খুবই কাজের ছিলো ; আর শিকার-করা জন্তুগুলোর মাংস কেটেকুটে খাবার তৈরি করবার জন্যে মেয়েরাই খুব সম্ভব ঐ চ্যাপ্টা হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করতো।

ক্রমশ মানুষ পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরির কাজে আরো বেশি দক্ষ আরো বেশি নিপুণ হয়ে উঠলো। পাথর ছাড়াও জন্তুজানোয়ার



পুরোনো পাথরের শেষাশেষি যুগের হাতিয়ার। খুব ছোটো ছোটো পাথরের টুকরোকে গাছের ডাল বা হরিণের শিং-এর সঙ্গে লাগিয়ে ব্যবহার করা হতো

এবং বড়ো বড়ো মাছের হাড়, হরিণের শিং, হাতির দাঁত প্রভৃতি নতুন অনেক জিনিস থেকেও মানুষ এখন নানান প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বিশিষ্ট এবং সূক্ষ্ম অনেক হাতিয়ার তৈরি করতে লাগলো। শুধু তাই নয়, শিকার করতে বা মাংস কাটতে চাঁছতে যে সব হাতিয়ারের দরকার হয়, সেই-সব হাতিয়ার তাড়াতাড়ি ভালোভাবে তৈরি করবার জন্যেও নতুন অনেক-গুলি হাতিয়ার তৈরি হলো। শুধুমাত্র হাতিয়ার তৈরি করবার জন্যেই নতুন এক ধরনের হাতিয়ার দেখা দিলো। কাটা, চাঁছা, চেলা, বিঁধনো—নানান কাজের জন্যে এখন হরেক রকম হাতিয়ার মানুষের হাতে এল। দূরপাল্লায় সজোরে বল্লম ছোঁড়বার জন্যে নতুন এক ধরনের হাতিয়ার এবং তীর-ধনুককের ব্যবহারও এই যুগে চালু হয়েছিলো। হাতিয়ারগুলোতে কাঠের বাঁট লাগানোর রেওয়াজও এই সময়েই চালু হয়।



পুরোনো পাথরের যুগের ছুরি

শিকার এবং সংগ্রহই প্রধান

এ যুগের সমস্ত হাতিয়ার থেকে একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে। শিকারের কাজটাকে আরো বেশি সফল এবং সুনিপুণ করে তোলবার জন্যে এবং গেরস্থালী কাজের আরো বেশি সুবিধার জন্যেই মানুষ হাতিয়ারের উন্নতির প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছে। ইউরোপের ইউক্রেন, মোরেভিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি অঞ্চলে অতিকায় হাতি, গণ্ডার ও অন্যান্য জন্তুর যে রাশি-রাশি হাড় এ যুগের মানুষের বসতির কাছে পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে উন্নত এই

হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে মানুষ শিকারে যে কী বিরাট সাফল্য লাভ করতো তা বোঝা যায়।

এ থেকে এও বোঝা যায় যে, পুরো এ যুগটাতে খাবারের জন্যে পশুপাখি শিকার এবং মাছধরার উপরেই মানুষকে নির্ভর করতে হয়েছে। এ যুগের পাথরের অসংখ্য হাতিয়ারের মধ্যে এমন একটাও পাওয়া যায় না যা মাটি খুঁড়ে চাষবাস করে ফসল ফলাবার কাজে লাগে। চাষবাস করবার পদ্ধতিটা মানুষ তখনো পর্যন্ত শিখে উঠতে পারে নি। ভালোভাবে শিকার সংগ্রহ না করতে পারলে মানুষের পক্ষে তখন বেঁচে থাকাই মুশকিল হতো। কাজেই শিকার করবার কায়দাকে বেশি বেশি ভালো করে তোলবার জন্যেই মানুষ হাতিয়ারের উন্নতির চেষ্টা এই যুগে করেছে।

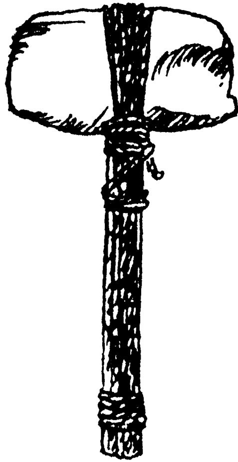
ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় এ যুগের মানুষের ব্যবহৃত যে সব হাতিয়ার এবং বসতির পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় যে বল্লম তীরধনুক বড়শি কোঁচ প্রভৃতি দিয়ে শিকার এবং মাছ ধরবার কলাকৌশলকে উন্নত করে খাবারের বিষয়ে তারা খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পেরেছিলো। এবং এর ফলে তাদের কোনো কোনো দল যে এক জায়গায় থিতিয়ে বসতেও পেরেছিলো তারও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু খাবারের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশি হলেও সেটা এমন পর্যাপ্ত ছিলো না যে কিছু বাড়তি থেকে যাবে। কাজেই খাবারের জন্যে সকলকেই সারা বছর সারা জীবন সমানভাবে পরিশ্রম করতে হতো। তাছাড়া অতিকায় হাতি এবং গণ্ডার শিকার করে যখন খাবারের সংস্থান করতে হতো তখন একজন দুজনের পক্ষে যে সে কাজ করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না তাও বোঝা যায়। সুতরাং পুরুষ ও নারীর কাজের ভাগাভাগি হয়ে গেলেও এ সমাজে সকলকেই সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হতো। সমাজের মধ্যে প্রত্যেকের ছিলো সমান অধিকার এবং সমান দায়িত্ব।

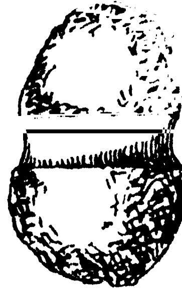
"প্যালিওলিথিক" বা পাথরের এই পুরোনো যুগে, শিকার এবং সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল মানুষের সমাজে ছিলো পুরোপুরি সাম্য অবস্থা।

নতুন পাথরের যুগ

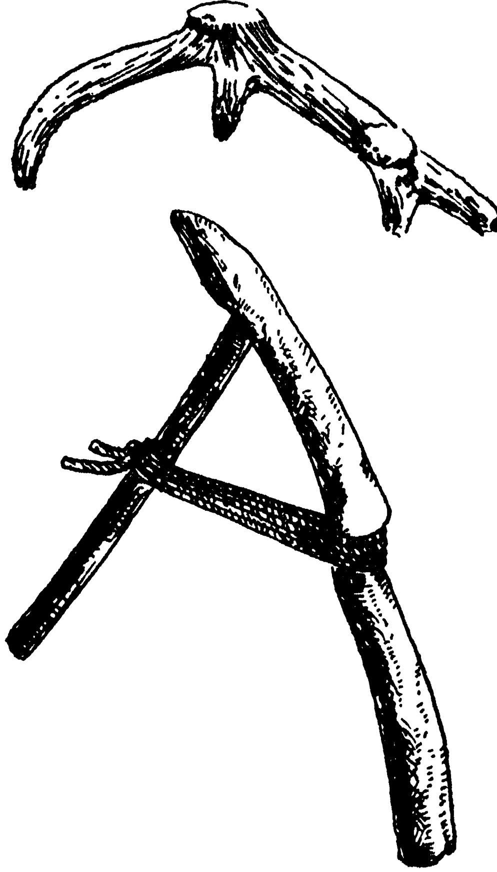
হাতিয়ারের ইতিহাসে এর পরের যে যুগ তাকে বলা হয় "নিওলিথিক" বা পাথরের নতুন যুগ। অবশ্য পুরোনো এবং নতুন পাথরের যুগ, এ দুটির মধ্যবর্তী আরেকটি ধাপের কথাও বলা হয়। সেটা "মেসোলিথিক" বা পাথরের মাঝারি যুগ, অথবা "মাইক্রোলিথিক" বা খুদে পাথরের যুগ।

নতুন পাথরের যুগে মগজ খাটিয়ে, নতুন হাতিয়ার তৈরি করে মানুষ খাবার যোগাড়ের বিষয়ে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করলো। মাটি খুঁড়ে শস্যের বীজ বোনবার জন্যে এবং আগাছা পরিষ্কার করবার জন্যে মাটি খোঁড়বার নতুন হাতিয়ার তৈরি হলো। লম্বা লাঠির মুখে ঘষে-ঘষে-ছুঁচলো-করা পাথরের একটা টুকরো বসিয়ে, কিংবা কোদালের মতো দেখতে হরিণের স্বাভাবিক শিং ব্যবহার করেই গোড়াতে এই কাজগুলো করা হতো। মাটি খুঁড়ে বীজ বোনবার পর যে ফসল হলো তা কেটেকুটে ঘরে তোলবার জন্যে তৈরি হলো কাস্তের মতো একরকম আদিম হাতিয়ার। একটা লাঠি কিংবা পাথরের টুকরোর উপর খাঁজ কেটে, পরে



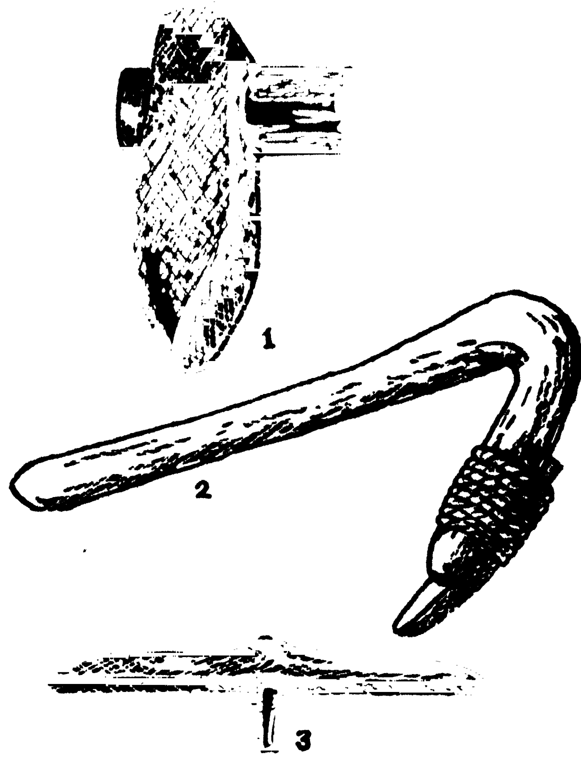


পাথরের হাতুড়ি



মাটি খুঁড়বার হাতিয়ার। নীচেরটি মিশরে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ২৫০০ বছর আগে ব্যবহৃত হতো

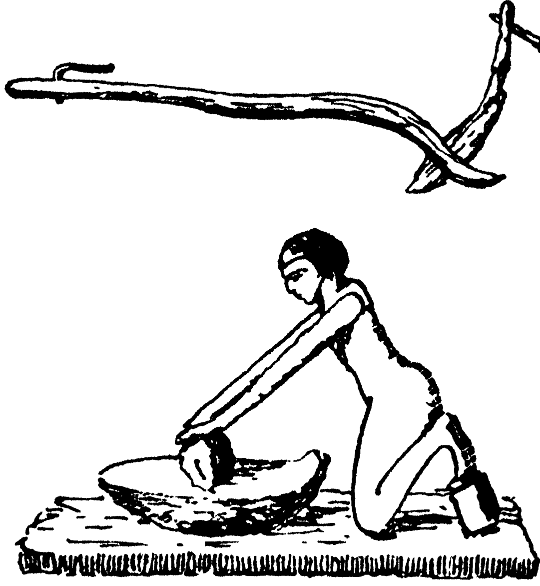
এমনকি মৃত পশুর চোয়াল ব্যবহার করেও ফসল কাটবার কাজ সারা হতো। শস্যকে ঝাড়াইমাড়াই করে ধুলোবালি জঞ্জাল পরিষ্কার করবার জন্যে তৈরি হলো কুলো। তারপর সেই শস্যকে গুঁড়িয়ে পিষিয়ে খাবারের উপযুক্ত করে তোলবার জন্যে দেখা দিলো হামানদিস্তা, শিলনোড়া এবং জাঁতা। একটা চ্যাপটা পাথরের উপর ছোটো গোল আরেকটা পাথর ঘষে বা ঘুরিয়ে এ কাজ করা



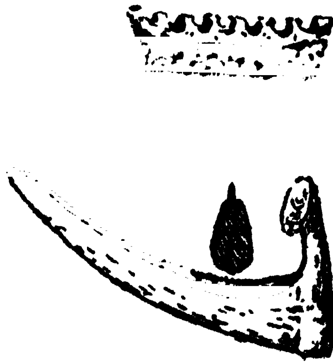
নতুন পাথরের যুগের মাটি খুঁড়ে চাষবাস করবার নানান হাতিয়ার

হতো। হাতুড়ি, বাটালি, নেহাই, তুরপুন প্রভৃতি হাতিয়ারগুলোও এই যুগেরই সৃষ্টি।

পুরোনো পাথরের যুগে হাতিয়ার তৈরির প্রধান কায়দা ছিলো পাথর থেকে পরতের পর পরত তুলে সেই পরতগুলো দিয়ে, কিংবা তার অবশিষ্ট অংশটিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা। নতুন পাথরের যুগে, আগেকার এই পাথরের হাতিয়ারগুলোকে ঘষে মেজে ছুঁচলো ধারালো করে অনেক বেশি কার্যকরী হাতিয়ার তৈরি হতে লাগলো। এই ঘষে মেজে ছুঁচলো ধারালো করাই হলো নতুন পাথরের যুগের সমস্ত হাতিয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য।



নতুন পাথরের যুগের আদিম লাঙল। মধ্য ইউরোপে ব্যবহৃত।
নীচে: শস্য পেষাই করবার জাঁতা



ফসল কাটবার আদিম কাস্তে

খাবারের স্বাচ্ছন্দ্য

নতুন পাথরের যুগে উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়ে চাষবাস শিখে মানুষ তার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, অর্থাৎ খাবারের সমস্যার সুরাহা করে ফেললো। খাবারের জন্যে এতোদিন তাকে প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। চাষবাস শেখবার পর তার এই পরাশ্রয়ী-ভাব কেটে গেল। প্রকৃতির বুকে মানুষ এখন তার ইচ্ছামতো খাবার তৈরি করতে শিখলো। ঠিক এই সময়েই মানুষ আবার বন্য পশুর মধ্যে বেশ কয়েকটিকে গৃহপালিত করে তোলবার কৌশলও শিখেঁছিলো। খাবারের দৈনন্দিন অভাব মানুষের মিটলো। এই প্রথম তার জীবনে খানিকটা সত্যিকারের স্বাচ্ছন্দ্য এলো।

এই স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমশ আরো বাড়িয়ে তোলবার জন্যে মানুষ এখন আরো অনেক নতুন জিনিস আবিষ্কার করলো। প্রকৃতির বুকে যা স্বাভাবিক ভাবে নেই, প্রকৃতির উপকরণ নিয়ে মানুষ এখন নিজের সুবিধার জন্যে সেই সব অনেক জিনিসও আবিষ্কার করলো। কাদামাটি দিয়ে তৈরি করে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি হলো মাটির থালা, ঘটি, বাটি এবং নানান রকমের পাত্র। গাছ-গাছালির আঁশ থেকে কিংবা ভেড়ার পশম দিয়ে পাথরের টেকোর সাহায্যে লম্বা সুতো তৈরি করে তাকে তাঁতে ফেলে কাপড়-চোপড় বুনতেও মানুষ শিখলো। এই যুগের আরো অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা পরে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করবো।

শিকার সংগ্রহ থেকে চাষবাস

পুরোনো পাথরের যুগ থেকে নতুন পাথরের যুগে, শিকার এবং সংগ্রহের যুগ থেকে চাষবাস এবং পশু-পালনের যুগে, সাধারণভাবে

মানুষের সমাজের যে ধারাহিক অগ্রগতি. স্তরে স্তরে মাটি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞানই সেটা তুলে ধরেছে। খাবার যোগাড়ের বিষয়ে সংগ্রহ এবং শিকারের পর্যায় থেকে চাষবাসের পর্যায়ে ধারাবাহিক পরিবর্তনের সবচেয়ে প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে প্যালেস্টাইনের কারমেল পাহাড়ের 'ওয়াদি-এল-নাটুফ নামে জায়গাটি থেকে। জায়গাটির নাম থেকেই এখানকার সেই প্রাচীন অধিবাসীদের নাটুফিয়ান বলে অভিহিত করা হয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অন্তত সাড়ে চার হাজার পাঁচ হাজার বছর আগে নাটুফিয়ানরা শিকার এবং সংগ্রহ করেই মোটামুটি খাবারের সংস্থান করতো। কিন্তু তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলোর মধ্যে হাড়ের-বাঁট-লাগানো করাতের মতো খাঁজ-কাটা পাথরের একরকম হাতিয়ারও পাওয়া গিয়েছে। ঘাস বা ফসল কাটতে-কাটতে কাস্তের ধারের দিকটা যেমন ক্রমশ আরো বেশি ধারালো এবং চকচকে হয়ে ওঠে, পাথরের এই হাতিয়ার-গুলোতেও সেই রকম একটা চকচকে ভাব। সুতরাং এই হাতিয়ারগুলো যে এই ধরনের কোনো কাজেই ব্যবহার করা হতো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ নাটুফিয়ানরা মোটামুটি সংগ্রহ এবং শিকার করে দিন চালালেও, অল্প কিছু চাষবাসের কাজও করতে শুরু করেছিলো। এবং কালক্রমে ক্রমশ ক্রমশ চাষবাস করে ফসল ফলানোই তাদের খাবার সংস্থানের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

মিশরে নীলনদীর পশ্চিমে ফাউয়ুম্ ও মেরিম্‌ডে অঞ্চলে এবং মধ্য ইরানের পশ্চিম সীমান্তে সিয়াল্‌ক্ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যে সব বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানেও এই ধারাবাহিক পরিবর্তন চোখে পড়ে। এ বসতিগুলো সবই যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত চার হাজার বছর আগেকার। যদিও শিকার, সংগ্রহ এবং মাছধরাই ছিলো এদের খাবার যোগাড়ের প্রধান উপায়

তবু এরা যে সবাই কিছু কিছু চাষবাসও করতো, তারও অব্যর্থ প্রমাণ আছে। সবগুলো বসতি থেকেই কাস্তে হিসেবে ব্যবহৃত পাথরের চকচকে হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে—সিয়াল্কের কাস্তেগুলো তো প্রায় হুবহু নাটুফিয়ানদেরই মতো। শুধু কাস্তে নয়, শস্য পেষাই করবার জন্যে পাথরের একরকম জাঁতাও এখানে দেখা যায়। মিশরের এই বসতিগুলো থেকে এমনকি গম এবং বার্লির আদিম পূর্বপুরুষদের শস্যকণাও কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে।

ভারতবর্ষে যদিও পাথরের যুগের প্রত্নতত্ত্বের কাজ খুব বেশি পরিমাণে হয়নি, তবু পুরোনো পাথরের যুগ থেকে নতুন পাথরের যুগে ক্রমপরিবর্তনের ধারা এখানেও কয়েকটি অঞ্চলে বেশ সুস্পষ্ট। দক্ষিণ ভারতে বিশেষত বেলারি, তিন্নেভেলী, সালেম, মাতুরা, হায়দ্রাবাদ—প্রভৃতি জায়গায় মাটি খুঁড়ে স্তরে স্তরে যে সমস্ত হাতিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে, তা থেকে শুধুমাত্র শিকার এবং সংগ্রহের পর্যায় থেকে আস্তে আস্তে চাষবাসও যে খাবার সংস্থানের একটা প্রধান উপায় বলে গৃহীত হতে শুরু করেছে, তা বোঝা যায়। ভারতবর্ষে এই যুগসন্ধিক্ষণ যে ঠিক কতো প্রাচীন, তা সঠিকভাবে এখনো জানা না গেলেও, এটা যে মিশর এবং ইরানের প্রায় সমসাময়িক তা বলা যায়।

চাষবাসে মেয়েদের ভূমিকা

একেবারে গোড়ার যুগে চাষবাসের যে ধরনটা চোখে পড়ে, তা কিন্তু মোটেই আজকের মতো ছিলো না। কারণ চাষবাসের পক্ষে উপযুক্ত প্রথম যে হাতিয়ারগুলোর কথা আগেই বলা হয়েছে, সেগুলো দিয়ে খুব ঢালাও ভাবে চাষবাস করা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। তা ছাড়া, মানুষের সমাজে তখনো পর্যন্ত খাবার সংস্থানের প্রধান উপায়ই ছিলো শিকার, সংগ্রহ বা মাছধরা।

মাটি খোঁড়বার পাথরের একটা হাতিয়ার দিয়ে, কিংবা কোদালের মতো ব্যবহার করা যায় হরিণের এমন স্বাভাবিক শিং দিয়ে অল্প খানিকটা মাটি খুঁড়ে তাতে বুনো ঘাস লতাপাতা বা গাছগাছালি থেকে বেছে-বেছে খাওয়া যায় এমন সব বীজ বুনে নতুন ধরনের খাবার তৈরি করবার চেষ্টা হতো। সুতরাং অবসর সময়ে বসতি বা বাড়ির আশেপাশে ছোটোখাটো জমিতে এই ধরনের চাষবাসের সূত্রপাত হয়েছিলো। আর, সমাজের বেশির ভাগ সমর্থ পুরুষ যখন শিকার বা মাছধরায় ব্যস্ত, তখন একমাত্র মেয়েদের পক্ষেই এ কাজটা করা সম্ভব ছিলো। চাষবাসের আবিষ্কারে মেয়েদের ভূমিকা-ই প্রধান ছিলো। গোড়ার এই যুগটাকে বলা হয় কোদাল দিয়ে চাষবাসের যুগ (*Hoe Cultivation*) বা খামার যুগ (*Garden Cultivation*)।

চাষবাসের গোড়ার কথা হলো বীজ বুনে ফসল ফলাবার কায়দাটা আবিষ্কার করা। কিন্তু একই জমিতে বছরের পর বছর চাষ করতে-করতে দেখা গেলো যে ফসলের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে। অর্থাৎ জমির উর্বরা-শক্তিও কমে আসছে। চাষবাস শুরু হবার কিছুকালের মধ্যেই এটা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। কিন্তু মানুষ এ সমস্যারও সমাধান করে ফেললো। দু-চার বছর পরে জমির উর্বরাশক্তি যখন কমে এলো, তখন আর সেই জমিতেই চাষবাস না করে আরেকটা জমি পরিষ্কার করে চাষবাস শুরু হলো। সেই জমিতে যে ঝোপঝাড় গাছগাছড়া ছিলো সেগুলো কেটেকুটে সাফ করে, আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হতো। এতে একদিকে সেই জমিটা যেমন চাষের জন্যে পরিষ্কার করে নেওয়া হলো, তেমনি পোড়ানো ছাই মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়াতে সেই জমির উর্বরা-শক্তিও অনেক বেড়ে যেতো। এই জমিতে কয়েক বছর চাষ করার পর আবার আগের জমিটাতে

চাষ শুরু হতো। এটাতে যখন চাষ হতো ওটাকে তখন ফেলা রাখা হতো। ঘুরে-ঘুরে চাষবাসের এই পদ্ধতিটা খুবই প্রাচীন। মধ্য ইউরোপের ড্যানিয়ুব নদীর উপত্যকায় নতুন পাথরের যুগের মানুষরা এইভাবেই চাষবাস করতো। ভারতবর্ষে অনেক অধিবাসীদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত এই ধরনের চাষবাস-ই চালু আছে। জমি যখন অপর্যাপ্ত একমাত্র তখনি কেবল এই ধরনের চাষবাস সম্ভব। অবশ্য, গোবর ইত্যাদি ব্যবহার কবে জমিতে কৃত্রিম সার দেবার ব্যবস্থা জানতেও মানুষের বেশি সময় লাগেনি। কারণ ইউরোপের বল্কান এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, এবং গ্রীসে নতুন পাথরের যুগের যে সব সুপ্রাচীন বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোতে যে এই পদ্ধতিতেই জমিকে উর্বরা করা হতো তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

অল্পসল্প মাটি খোঁড়বার সামান্য একটা পাথরের হাতিয়ার দিয়ে বা হরিণের স্বাভাবিক শিং ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে নতুন পাথরের যুগের শুরুতে মানুষের খাবার যোগাড়ের ইতিহাসে যে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেলো তারই অনিবার্য পরিণতি হলো কাঠের কোদাল এবং লাঙলের সাহায্যে ঢালাও ভাবে বড়ো বড়ো জমিতে চাষবাসের মধ্যে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেই মিশরে এবং মেসোপটেমিয়ায় এবং এর কিছু পরে ভারতবর্ষ, সাইপ্রাস, চীন এবং গ্রীসে ষাঁড় বা গাধা দিয়ে লাঙল চালানোর পরিচয় পাওয়া যায়। শিকার এবং সংগ্রহের যুগ তখন মানুষ অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। কোদাল যুগ বা খামার যুগের বদলে রীতিমতো কৃষির যুগ শুরু হয়ে গেল। ফসলের পরিমাণ হু-হু করে বাড়তে লাগলো। কোনো রকমে প্রয়োজন মেটানো আর নয়, মানুষ এখন তার নিজের প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি খাবার তৈরি করতে সক্ষম হলো।

মানুষ এবার সভ্যতার দিকে পা বাড়ালো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাচীন সমাজ

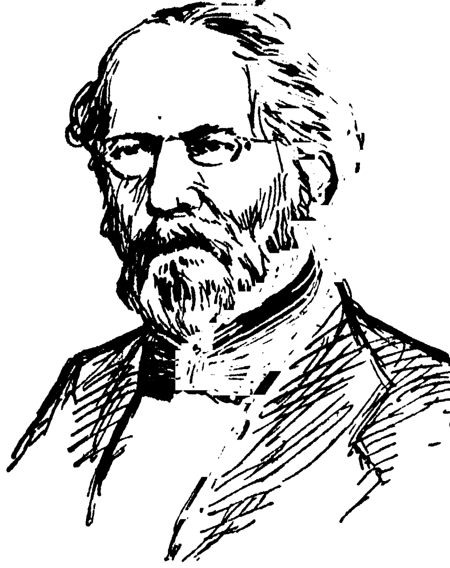
ডারউইনের আবিষ্কার মানুষের চিন্তায় প্রকাণ্ড বিপ্লব এনেছে। জীবজগতে পরিবর্তনের ফলেই যে ক্রমশ উন্নততর প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে সবচেয়ে উন্নত প্রাণী মানুষ,—এসব ধারণা আজকাল আমাদের কাছে প্রায় ঘরোয়া কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ শুরুতে ছিলো আধা-জানোয়ারের মতো, বন্য। তারপর সভ্য হয়েছে—ক্রমশ উন্নত হয়েছে। ওই বন্য অবস্থা থেকে সভ্যতার দিকে কী করে এগুলো? পার হয়ে এলো কোন কোন ধাপ, কোন কোন স্তর?

সভ্য মানুষের এই অসভ্য অতীতটিকে জানবার ব্যাপারে আর-একজন বৈজ্ঞানিক আর-এক বিপ্লব ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কারও প্রায় ডারউইনের মতোই যুগান্তকারী। তবু ডারউইনের মতো সমাদর তিনি পান নি। আজো, এমনকি বড়ো বড়ো বিদ্বানদের কাছেও তাঁর আবিষ্কার অনেকখানি অবহেলার বিষয় হয়ে রয়েছে।

হেনরি লুইস মর্গান

তাঁর নাম মর্গান—হেনরি লুইস মর্গান। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক। জন্ম ২১শে নভেম্বর ১৮১৮, নিউ ইয়র্ক স্টেটের একটি শহরে। ১৮৪০



মর্গান

সালে আইন পাশ করে তিনি ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু আদালতের সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্ক খুব বেশি দিন টিকলো না।

চলতি কথায় আমরা যাদের বলি রেড-ইণ্ডিয়ান—আমেরিকার সেই আদিবাসীদের জীবন তাঁকে টেনেছিলো। তিনি তাদের মাঝে চলে গেলেন।

তাঁর বাকিটা জীবনের বেশির ভাগই কাটলো ওই রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে।

আমেরিকার একদল আদিবাসীর নাম ইরোকোয়া। তাদের সঙ্গে থাকতে-থাকতে মর্গান যেন তাদেরই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠলেন্। আর ওরাও তাঁকে নিজেদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করলো। আদিবাসীরা কিন্তু চট করে বাইরের লোককে নিজেদের আত্মীয় করে নেয় না। মর্গানকে নিয়েছিলো,—১৮৪৭ সালে, অক্টোবর মাসে। এই ভাবে নিজেদেরই একজন হিসেবে গ্রহণ

করবার সময়ে তারা মর্গানের একটা নতুন নাম দিলো : "তা-ইয়া-দা-ও-উব্-রুব্"। ওদের ভাষায় ওদের মতো নাম।

তাহলে, মর্গানের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্কটা বড়ো কম ঘনিষ্ঠ নয়। সভ্য মানুষ অসভ্য মানুষদের ভালো করে জানবার জন্মে একেবারে তাদেরই একজন হয়ে গেলো! আর এই ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের ভিত্তিতেই মর্গান আদিবাসীদের কথা লিখলেন কয়েকটি বইতে।

তাঁর সবচেয়ে নামকরা বই হলো, "প্রাচীন সমাজ"। ইংরেজীতে *Ancient Society, or Researches in the lines of Human Progress from Savagery through Barbarism, to Civilization*। মস্ত বড়ো নাম। কিন্তু অনেক কথাই এর মধ্যে বলা রয়েছে। বাঙলায় নামটা হবে: প্রাচীন সমাজ, বা বন্য অবস্থা থেকে বর্বর অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে সভ্যতার দিকে মানুষের অগ্রগতি-সংক্রান্ত গবেষণা। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৭-এ।

এ-ছাড়া মর্গানের লেখা বাকি বই হলো :

১৮৫১ : দি লিগ্ অব্ দি ইরোকোয়া।

১৮৬৯ : সিস্টেম্স্ অব্ কন্স্যান্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অব্ দি হিউম্যান ফ্যামিলি।

১৮৬৮ : দি আমেরিকান বিভার অ্যাণ্ড হিস্ ওয়ার্কস।

১৮৮১ : হাউসেস্ অ্যাণ্ড হাউস-লাইফ্ অব্ দি অ্যামেরিকান অ্যাবরিজিন্।

তাঁর জীবন সম্বন্ধে বলবার মতো বাকি কথা খুব বেশি নয়। ১৮৬১ সালে তিনি নিউ ইয়র্ক অ্যাসেম্ব্লির সভ্য হন। ১৮৫৮-১৮৫৯ পর্যন্ত তিনি নিউ ইয়র্ক সিনেটের সভ্য ছিলেন। ১৮৮০-তে তিনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন্ ফর দি অ্যাড্ভান্সমেন্ট অব্ সায়েন্স-এর—অর্থাৎ আমেরিকার বিজ্ঞান-পরিষদের—সভাপতি হন।

১৭ই ডিসেম্বর ১৮৮১ তারিখে নিউ ইয়র্কের রচেস্টার শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রাচীন মানুষের কথা

মর্গান ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের নানা বিভাগ, নানা শাখা। তার মধ্যে কোন শাখাটি নিয়ে মর্গানের গবেষণা? তার নাম নৃতত্ত্ব—ইংরেজিতে অ্যান্থ্রপলজি। মানুষ বা নরসংক্রান্ত তত্ত্ব, তাই নৃতত্ত্ব।

মানুষ সম্বন্ধে যাবতীয় কথা এ-বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। তার মধ্যে মর্গান যে-দিকটার কথা বিশেষ করে আলোচনা করেছেন তা হলো মানব-সমাজের কথা। অর্থাৎ কিনা, নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানেরও নানান বিভাগ আছে। তার মধ্যে একটি বিভাগকে বলা হয় সামাজিক নৃতত্ত্ব বা সোস্যাল অ্যান্থ্রপলজি। বিশেষ করে এই বিভাগটিতেই মর্গানের আবিষ্কার।

আর সে আবিষ্কারই সভ্য মানুষের অসভ্য অতীত-সংক্রান্ত আমাদের ধারণায় প্রকাণ্ড বিপ্লব এনেছে: মানুষ কী করে আধা-জানোয়ারের মতো বন্য অবস্থা থেকে শুরু করে কোন্ কোন্ ধাপ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সভ্যতার স্তরে পৌঁছলো,—এ-বিষয়ে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা পেলাম।

কথাটা শুনতে খটকা লাগবে। কেননা প্রাচীন মানুষ সম্বন্ধে আমাদের যে-জ্ঞান তা তো প্রত্নতত্ত্বের কাছ থেকে পাওয়া: ধুলো সরিয়ে, মাটি খুঁড়ে প্রাচীন মানুষ আর তাদের কীর্তির যে-সব টুকরো-টাকরা চিহ্ন পাওয়া যায় সেগুলিকে পরীক্ষা করেই প্রত্নতত্ত্বে প্রাচীন মানুষদের কথা আবিষ্কার করা হয়। এইভাবেই তো আমরা ইতিপূর্বে প্রাচীন মানুষদের কাহিনীকে নতুন পাথর যুগ, পুরোনো পাথর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, ইত্যাদি অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

তা ঠিক। কিন্তু ওই প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে নৃতত্ত্বের জ্ঞান মেলাতে পারলেই প্রাচীন মানুষদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক পূর্ণাঙ্গ হবে। কেন? সে-কথা শুরু করবার আগে মর্গানের আবিষ্কারটার কথা ভালো করে দেখা যাক।

মানুষের অসমান উন্নতি

আজকের পৃথিবীতে মানুষ অনেকখানি এগিয়েছে, সভ্যতার চুড়োয় পৌঁছতে চলেছে। কিন্তু কথা হলো, সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষই কি এক-তালে সমান ভাবে এগিয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। ইংরেজ, জার্মান, ফরাসীদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা আমেরিকার আদিবাসীদের তুলনা করলেই দেখা যাবে তফাতটা কতোখানি! এই হলো অসমান উন্নতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

অসমান উন্নতি মানে?

সব-মানুষই সমান ভাবে একতালে এগোয় নি। কোথাও বা মানুষ এগিয়ে গিয়েছে অনেকখানি, কোথাও বা পড়ে রয়েছে অনেক পিছনে। যারা পিছনে পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যে অনেক দলই এখনো পর্যন্ত সভ্যতার অবস্থাতেই উঠে আসতে পারে নি। অসভ্য মানুষ; এদেরই আমরা সাধারণত আদিবাসী বলে থাকি। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে নানা জায়গায় আজো এ-রকম অসভ্য আদিবাসীদের পরিচয় পাওয়া যায়। মর্গানের গবেষণা প্রধানত এদের নিয়েই।

আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের কথা ভেবে দেখা যাক। এরা সবাই অসভ্য অবস্থায় আটকে রয়েছে। কিন্তু তবুও সমস্ত রেড-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থাই সমান নয়। কোনো দল অসভ্যতার অনেক নিচু স্তরে আটকে রয়েছে, কোনো দল আবার এগিয়ে এসেছে সভ্যতার প্রায় কাছাকাছি।

মর্গান দেখলেন, মেক্সিকো, নিউ মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা এবং পেরু-র আদিবাসীরা অসভ্য হলেও সভ্যতার দিকে অনেকখানিই এগিয়ে এসেছে। তারা পশুপালন করতে শিখেছে, চাষবাস করতে শিখেছে, কিন্তু লোহার ব্যবহার জানে না, লেখার অক্ষর আবিষ্কার করতে পারে নি।

এদের চেয়েও যেন একধাপ পিছিয়ে পড়ে রয়েছে মিসৌরি নদীর পুব-পাড়ের রেড-ইণ্ডিয়ানরা। ওরা তখনো পশুপালন বা চাষবাস করতে শেখে নি ; যদিও মৃৎপাত্র তৈরি করতে শিখেছে।

তাদের চেয়ে আরো একধাপ পিছিয়ে পড়ে আছে কলম্বিয়া-উপত্যকা আর হাড্‌সন্‌-বে-টেরিটারির আদিবাসীরা। তারা তখনো মাটির পাত্র গড়তে শেখে নি ; তবে তীরধনুকের ব্যবহার শিখেছে, তারই সাহায্যে শিকার করে খায়।

আজকের পৃথিবীতে অসভ্যতার আরো নিচু-স্তরে আটকে পড়ে থাকা আদিবাসীদের সন্ধান পাওয়া যায় নাকি ? যায় ; কিন্তু মর্গান বললেন, তার জন্যে আমেরিকা ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া আর পলিনেসিয়ায় যেতে হবে। সেখানকার আদিবাসীদের অবস্থা আরো অনুন্নত—প্রায় আধবুনো।

অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার এই আদিবাসীদের চেয়েও আরো অনুন্নত কোন মানবদলের পরিচয় পাওয়া যায় নাকি ? না ; অন্তত তাঁর সময়ে এর চেয়েও অনুন্নত মানুষদের খবর পাওয়া যায় নি। তবে মর্গান বললেন, মানুষ যেহেতু জানোয়ারের অবস্থা থেকেই শুরু করেছিলো সেই-হেতু পৃথিবীতে কোনো-না-কোনো কালে এদের চেয়েও অনুন্নত, বুনো, আধা-জানোয়ারের মতো মানুষদের পরিচয় নিশ্চয়ই ছিলো। আজকের পৃথিবীতে তেমন কোনো মানবদলের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া না-গেলেও ওদের কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

তাহলে, অসভ্য মানুষদের মধ্যেও নানা-স্তর। তাদের মধ্যেও উন্নত-অনুন্নতর তফাত রয়েছে—অর্থাৎ কিনা ওই অসমান উন্নতিরই নিয়ম।

যাদের চাক্ষুষ দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু স্তরে অস্ট্রেলিয়া আর পলিনেসিয়ার আদিবাসী; সবচেয়ে উঁচু স্তরে মেক্সিকো, নিউ মেক্সিকোর আদিবাসী।

মর্গান এদের খুব খুঁটিয়ে, ভালো করে, পরীক্ষা করলেন। আর দেখলেন, এই যে বিভিন্ন মানবদল বিভিন্ন স্তরে আটকে পড়ে রয়েছে তার পিছনেও একটা নিয়মের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কী নিয়ম? স্তরগুলি ঠিক পরের পর এবং পরের পর হতে বাধ্য। যেন সিঁড়ি ভেঙে উপরের দিকে উঠে আসার মতো। নিচের ধাপ না পেরুলে উপরের ধাপে পৌঁছোনোই সম্ভব নয়; তাই উপরের ধাপে যারা পৌঁছেছে তারা আগে অনিবার্য ভাবেই নিচের ধাপে ছিলো।

কলম্বিয়া উপত্যকার আদিবাসীরা এর আগে ঠিক কী অবস্থায় ছিলো? আজকের দিনেও পলিনেসিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা যে অবস্থায় রয়েছে। মিসৌরি নদীর পুব-পাড়ের রেড-ইণ্ডিয়ানরা এর আগে কোন স্তরে ছিলো? কলম্বিয়া উপত্যকার আদিবাসীদের যে-স্তরে দেখা গেলো। মেক্সিকো আর নিউ মেক্সিকোর আদিবাসীরা এর আগে ঠিক কোন স্তরে ছিলো? মিসৌরি নদীর পাড়ের ওই আদিবাসীদের যে অবস্থায় দেখা গেলো। তাহলে অসভ্য মানুষেরা এই যে অনুন্নতির বিভিন্ন স্তরে আটকে পড়ে আছে এর পিছনে একটা বাঁধাধরা নিয়মের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে: একটি স্তরের পর অপর একটি স্তর, আগের স্তরটা না পেরিয়ে পরের স্তরে উঠে আসা যায় না,—এ-রকমটা হতে বাধ্য।

শুধু তাই নয়। মর্গানের গবেষণা আরো এক বিস্ময়কর কথা প্রকাশ করলো।

প্রাচীন গ্রীক আর লাতিন সাহিত্যে মর্গান মহা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রশ্ন তুললেন: হোমারের যুগে গ্রীকদের অবস্থা ঠিক কী রকম ছিলো? কী রকম ছিলো রোম-নগর প্রতিষ্ঠা করবার ঠিক মুখোমুখি অবস্থায় ইতালিয়ানদের অবস্থা? কী রকম ছিলো সীজার-এর সময়কার জার্মানদের অবস্থা?

গ্রীক আর লাতিন সাহিত্য বিচার করে তিনি দেখালেন, আমেরিকার অসভ্য আদিবাসীদের মধ্যে মেক্সিকো, নিউ মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতির আদিবাসীরা যে-অবস্থায় রয়েছে তার ঠিক পরের অবস্থা—ঠিক পরের ধাপ—হলো ওই প্রাচীন গ্রীক ইতালিয়ান্ আর জার্মানদের অবস্থা। তার মানে, মেক্সিকো, নিউ মেক্সিকো, প্রভৃতির আদিবাসীরা যদি আর-এক ধাপ এগুতে পারতো তাহলে তারাও ওই হোমারের যুগের গ্রীকদের, বা সীজারের সময়কার জার্মানদের অবস্থায় উঠে আসতো। কিন্তু ওরা তা পারে নি। কলম্বাসের সাঙ্গোপাঙ্গদের আক্রমণে ওদের অগ্রগতি বন্ধ হয়েছিলো—ইউরোপবাসীদের পক্ষে আমেরিকা জয়ের কাহিনী পরে তোলা হবে।

তাহলে, হোমারের সাহিত্যে গ্রীকদের যে-অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তার আগে ওদের পূর্বপুরুষেরা ঠিক কোন অবস্থায় ছিলো? মেক্সিকোর আদিবাসীরা আজো যে-অবস্থায় রয়েছে। তারও আগে ওই গ্রীকদের পূর্বপুরুষেরাই কোন অবস্থায় ছিলো? মিসৌরির কিনারায় রেড-ইণ্ডিয়ানদের যে-অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেলো। আবার তারও আগে ওই গ্রীকদেরই পূর্বপুরুষেরা কোন অবস্থায় ছিলো? কলম্বিয়া-উপত্যকায় রেড-ইণ্ডিয়ানদের যে-অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেলো।

তারও আগে? অস্ট্রেলিয়া আর পলিনেসিয়ার আদিবাসীদের মতো অবস্থা। আর তারও আগে ওই গ্রীকদেরই পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয়ই আরো বুনো আধাজানোয়ারের দশাতেই ছিলো—কিন্তু সে-রকম দশায় আটকে-পড়ে-থাকা আদিবাসীদের পরিচয় আজকের পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হোমারের যুগের গ্রীকদের অবস্থা থেকে উন্নত হতে-হতে পরের যুগের মানুষেরা কী ভাবে সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে অনেক অনেক উপরে উঠে এসেছে সে-কাহিনী তো ঐতিহাসিকেরা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত মানুষ ঠিক পরের পর কোন কোন ধাপ পেরিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো তা বোঝবার ব্যাপারে মর্গানের ওই আবিষ্কার একেবারে যুগান্তকারী। মর্গান যেন বললেন, সভ্য মানুষের অসভ্য অতীতটা ঠিক কী রকম ছিলো তা আজো আমাদের পক্ষে একেবারে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব।

তাহলে, আজ আমরা যতোখানিই সভ্য হয়ে উঠি না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা আধাজানোয়ারের মতো বন্য অবস্থা থেকে শুরু করেই কয়েকটি নির্দিষ্ট বা বাঁধাধরা পরের পর ধাপ পার হয়ে শেষ পর্যন্ত সভ্যতার আঙিনায় এসে পড়েছে। আর মর্গান দেখালেন, সভ্যতার স্তরে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত ওই নির্দিষ্ট আর বাঁধাধরা ধাপগুলি যে ঠিক কী রকম তা আজও আমাদের পক্ষে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব। কী ভাবে? আজকের দিনেও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে অসভ্য আদিবাসীদের দল অসভ্যতার যে-সব বিভিন্ন স্তরে আটকে পড়ে রয়েছে সেগুলিকে পরীক্ষা করলে। সমস্ত দেশের সমস্ত সভ্য জাতির পূর্বপুরুষদের বেলাতেই এই এক কথা।

বন্য থেকে সভ্য

এই যে পরের-পর নির্দিষ্ট স্তর—মর্গান এগুলির বাঁধাধরা নাম দিয়েছেন।

মানুষের কাহিনীকে মর্গান প্রধানত তিনভাগে ভাগ করলেন—স্যাভেজারি (*Savagery*), বার্বারিস্‌ম্‌ (*Barbarism*) এবং সিভিলাইজেশন্ (*Civilization*)। বাঙলায় আমরা বলবো, বন্য, বর্বর আর সভ্য দশা।

এর মধ্যে আবার বন্য ও বর্বর অবস্থার উভয়কেই তিনি তিনটি করে ভাগে ভাগ করলেন এবং দেখালেন প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য কী কী এবং কোথায় কোথায় তার উদাহরণ দেখা যায়। সংক্ষেপে এই স্তর-বিভাগ হলো :

১ : বন্য দশা

সবচেয়ে আদিম অবস্থা থেকে মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখার আগে পর্যন্ত এই বন্য দশা। আদিবাসীদের মধ্যে যারা এখনো মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখে নি তারা সকলেই বন্য দশায় আটকে রয়েছে। এ-দশার তিনটি উপস্তর হলো :

ক : বন্য দশার নিম্ন স্তর

পৃথিবীতে মানুষের শৈশব থেকে এই স্তরের শুরু। এ-অবস্থায় মানুষের মুখে স্পষ্ট ভাষা ফুটেছে এবং প্রধানত ফলমূল সংগ্রহ করেই মানুষের জীবন কেটেছে। মাছ ধরতে শেখা এবং আগুনের আবিষ্কার থেকেই এ-স্তরের সমাপ্তি। অসভ্য মানুষদের মধ্যে এতো পিছনের স্তরে আজ আর কাউকেই আটকে থাকতে দেখা যায় না।

খ : বন্য দশার মধ্য স্তর

এই স্তর মাছ ধরতে শেখা আর আগুন আবিষ্কার থেকেই শুরু এবং তীরধনুক আবিষ্কারেই শেষ। অস্ট্রেলিয়া আর পলিনেসিয়ার আদিবাসীদের এই স্তরে আটকে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

গ : বন্য দশার উচ্চ স্তর

তীর-ধনুক আবিষ্কার থেকে এর শুরু, মাটির পাত্র আবিষ্কারেই এর শেষ। আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কলম্বিয়া উপত্যকার আর হাড্‌সন-বে এলাকার আদিবাসীরা এই স্তরে আটকে পড়েছিলো। এর পর বন্য দশার শেষ, বর্বর-দশার শুরু।

২ : বর্বর দশা

মাটির পাত্র তৈরি করতে শেখা থেকে বর্বর-দশা শুরু এবং লেখার হরফ আবিষ্কারেই এ-দশার শেষ। যে-সব আদিবাসীরা লেখার হরফ আবিষ্কার করতে শেখে নি, অথচ মৃৎপাত্র গড়তে শিখেছে তাদের সবাইকেই বর্বর দশায় ফেলা হবে। এর তিনটি প্রধান উপস্তর হলো :

ক : বর্বর দশার নিম্ন স্তর

মৃৎপাত্র তৈরি করতে শেখা থেকে এ-স্তরের শুরু এবং পশুপালন বা চাষবাস করতে শেখার ঠিক মুখোমুখি অবস্থায় এর শেষ। আমেরিকায় মিসৌরি নদীর পুব-পাড়ের রেড-ইণ্ডিয়ানরা এই স্তরে আটকে পড়েছিলো। ওরা তখন মৃৎপাত্র করতে জানতো, কিন্তু পশুপালন বা চাষবাস শেখে নি।

খ : বর্বর দশার মধ্য স্তর

চাষবাস কিংবা পশুপালন করতে শেখা থেকেই এ-অবস্থার শুরু এবং লোহা ব্যবহার করতে শেখাতেই এর শেষ। মর্গান চাষবাস

কিংবা পশুপালন বলছেন কেন? কেননা, সব-জাতই যে চাষবাস শিখে বা পশুপালন শিখে একইভাবে বর্বর দশার মধ্যস্তরে পৌঁছেছিলো তা বলা ঠিক নয়। ব্যাপারটা নির্ভর করেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর: যেখানে পালন করবার মতো পশুর যোগান বেশি সেখানকার মানুষ পশুপালন শিখেই বর্বর-দশার এই স্তরটিতে উঠে এসেছে; আবার যেখানে চাষবাসের পক্ষে ভালো উর্বর জমি সেখানের মানুষ চাষবাস আবিষ্কার করেই বর্বর দশার মধ্য স্তরে পৌঁছেছে। অবশ্য যারা পশুপালন শিখলো তারা যে শুধুই পশুপালন শিখে রইলো তা নয়, ক্রমশ তারা চাষবাসও শিখতে লাগলো—সন্দেহ করা হয় যে তারা গৃহপালিত পশুর খাদ্যের যোগান বাড়ানোর চেষ্টাতেই ক্রমশ চাষবাস আবিষ্কার করেছিলো। অপরদিকে, যারা চাষবাস শিখে বর্বর দশার মধ্য স্তরে পৌঁছুলো তারাও ক্রমশ পশুপালন করতে শিখলো—চাষবাস শিখতে পারার পর তারা ক্রমশ গৃহপালিত পশুকে চাষের কাজে নিয়োগ করে এই চাষের কাজকেও আরো অনেক উন্নত করে তুললো। পশুপালন আর চাষবাসের উপর নির্ভর করবার এই যে তফাত, এটা খুব জরুরি। পরে এই নিয়ে আরো আলোচনা উঠবে।

নিউ মেক্সিকো, আর পেরু-র আদিবাসীদের দেখা গিয়েছিলো বর্বর দশার এই মধ্য স্তরটিতে আটকে পড়ে থাকতে।

বর্বর দশার উচ্চ স্তর

লোহার ব্যবহার আবিষ্কার থেকেই এই স্তরটির শুরু, ধ্বনি-সাংকেতিক লিপি (ফোনেটিক অ্যাল্‌ফাবেট) আবিষ্কার থেকেই এ-অবস্থার শেষ। ধ্বনি-সাংকেতিক লিপি মানে হলো এক-একটা আওয়াজের জন্যে এক-একটা অক্ষর ব্যবহার করবার ব্যবস্থা—ছবি

এঁকে বা ওই রকম কোনো আদিম উপায়ে লেখবার চেষ্টা নয়। লিপি আবিষ্কারের ইতিহাস পরে হবে।

মর্গান বললেন, প্রাচীন গ্রীক আর লাতিন সাহিত্য থেকে বোঝা যায় হোমারের সময়কার গ্রীকরা বা রোম নগর প্রতিষ্ঠা করবার মুখোমুখি সময়কার ইতালিয়ানরা বা সীজারের সময়কার জার্মানরা এই বর্বর দশার উচ্চ স্তরেই ছিলো।

নৃতত্ত্ব আর পুরাতত্ত্ব

একটু আগে বলছিলাম, পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারের সঙ্গে নৃতত্ত্বের আবিষ্কার মিলিয়ে দেখতে পারলেই প্রাচীন যুগের কথাটা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারা সম্ভব। কেন বলছিলাম, সে-কথা এবার মর্গানের সিদ্ধান্তটি মনে রাখলে ভালো করে বুঝতে পারা যাবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরাও বন্য দশার নিম্ন স্তর থেকে শুরু করে ক্রমশ বন্য দশার মধ্য স্তরে উঠে এসেছিলেন। তখন তাঁদের অবস্থা ঠিক কী রকম? কী রকম জীবনধারণ-পদ্ধতি? কী রকম সমাজের গড়ন? মর্গানের মতে, তা স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব। কী ভাবে? অস্ট্রেলিয়া আর পলিনেসিয়ার আদিবাসীদের পরীক্ষা করলে।

তারপর তাঁরা উঠে এলেন বন্য দশার উচ্চ স্তরে, তারপর বর্বর দশার নিম্ন, তারপর মধ্য স্তরে। ওই স্তরগুলিতে আটকে-পড়ে-থাকা অসভ্য মানুষদের পরীক্ষা করে আমরা তাহলে আমাদেরই কয়েক সহস্র বছরের পুরোনো ইতিহাসকে স্বচক্ষে দেখতে পারি।

এ-যেন আফ্রিকার উপকূলে পাওয়া সেই টিবি-পাখনাওয়ালা পরমাশ্চর্য মাছটিকে পরীক্ষা করবার মতো : পাঁচ-শো কোটি বছর আগেকার পৃথিবীতে তার স্থান, তবুও যে-করে হোক আজকের

পৃথিবীতেও তা টিকে রয়েছে—সমুদ্রের জলে জীবন্ত ফসিলের মতো। তেমনি এই 'সব অসভ্য আদিবাসীরাও। এরা আসলে অতীত পৃথিবীর মানুষ, এদের মধ্যে আমাদেরই অতীত ইতিহাসটা আজো বেঁচে রয়েছে।

নৃতত্ত্বের এই আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বের জ্ঞানকে অনেক পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে না কি? ধুলো সরিয়ে, মাটি খুঁড়ে প্রাচীন মানুষদের যে-সব চিহ্ন আমরা খুঁজে পেয়েছি তা থেকে মানুষের আদিম অতীত সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা সম্ভব হয়েছে, আরো কথা বোঝা সম্ভব হবে যদি আমরা নৃতত্ত্বের আলোয় ওই চিহ্নগুলির ব্যাখ্যা খুঁজি। একটা নমুনা দেখা যাক।

প্রত্নতত্ত্বের দিক্ থেকে আমরা পুরোনো পাথরের যুগ বলে একটা অতীত যুগের কথা আলোচনা করেছি। সে-যুগে স্থূল আর ভোঁতা পাথরের হাতিয়ারই মানুষের একমাত্র সম্বল। আজকের দিনেও অস্ট্রেলিয়া আর পলিনেসিয়ার আদিম অধিবাসীদের অবস্থা কিন্তু তাই। অর্থাৎ, বন্য দশার মধ্য স্তরে যারা আটকে পড়ে আছে তারা আসলে পুরোনো পাথরের যুগের মানুষ, অসমান উন্নতির দরুন তারা সভ্য মানুষদের সঙ্গে সমান-পাল্লায় এগুতে পারে নি। এদের স্বচক্ষে পরীক্ষা করতে পারা যায়, প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায় এদের সমাজের গড়নটা কী রকম, কী রকম এদের ভাবনা-চিন্তা ধ্যানধারণা, ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক মাটি খুঁড়ে পুরোনো পাথরের যুগের যে-মানুষদের চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন তাদের কথা অমন প্রত্যক্ষ ভাবে জানা যায় না। তাই, তাদের সমাজের গড়ন কী রকম ছিলো, কী রকম ছিলো তাদের ভাবনা-চিন্তা, ধ্যানধারণা,—এই রকম নানান ব্যাপারে তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানে ফাঁক থেকে যায়। নৃতত্ত্বের দিক থেকে—অর্থাৎ কিনা আজকের দিনেও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ওই যে-সব

মানবদল আদিম অবস্থায় আটকে আছে তাদের সম্বন্ধে পাওয়া জ্ঞান দিয়ে—আমরা পুরাতত্ত্বের ওই ফাঁকগুলি হয়তো পূরণ করতে পারবো।

এইদিক থেকে আদিবাসী-সংক্রান্ত মর্গানের আবিষ্কার প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানে সত্যিই যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। আমাদের নিজেদের অতীতকে ঠিকমতো চিনতে হলে আমাদের আশপাশের অসভ্য মানুষগুলির কথা ভালো করে জানতে হবে।

সমাজের গড়ন : ক্লান আর ট্রাইব

আমাদের পূর্বপুরুষদের সমাজের গড়নটা কী রকম ছিলো? এ-প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে মর্গানকে অনুসরণ করে অসভ্য আদি-বাসীদের সমাজ-ব্যবস্থাটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

মর্গান দেখলেন, বন্যদশার মধ্য স্তর থেকে শুরু করে বর্বর দশার মধ্য স্তর পর্যন্ত আগাগোড়াই হলো জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ। বর্বর দশার মধ্য স্তর থেকেই এই জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের ভাঙন ধরবার লক্ষণ দেখা যায়, যদিও অবশ্য তার অনেক পরেও—যেমন, বর্বর-দশার উচ্চ-স্তরেও গ্রীক আর রোমানদের মধ্যেও—ওই জ্ঞাতি-ভিত্তিক সমাজের নানা লক্ষণ টিকে থেকেছিলো। কিন্তু তখন সে-লক্ষণগুলির অবস্থা ফাঁপা খোলসের মতো— যেমন শাঁখ মরে যাবার পরেও শাঁখের ফাঁপা খোলসটা পড়ে থাকে, আমরা ফুঁ দিয়ে বাজাই।

তাহলে, প্রাচীন সমাজের আদি-অকৃত্রিম রূপ বলতে এই জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজই। সে সমাজের রূপটা কী রকম?

প্রথমত কয়েকটি ছোটো দল। দলের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আত্মীয়-সম্পর্ক—জ্ঞাতি-সম্পর্ক। দলের সকলের বিশ্বাস, একই পূর্বপুরুষ থেকে তাদের উৎপত্তি। মর্গান এ-হেন দলের নাম দিয়েছিলেন গেন্‌স্ বা gens—বহুবচনে গেনটিস। আর এইরকম

গোষ্ঠীই প্রাচীন-সমাজের আসল ভিত্তি বলে মর্গান সে-সমাজকে বলবেন, গেনটাইল্ সোসাইটি। জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ।

পরের নৃতত্ত্ববিদেরা গেন্স্ শব্দের বদলে ক্লান বা clan শব্দ ব্যবহার করেন। আমরাও এখানে ক্লান শব্দই রাখবো।

এই রকম কয়েকটি করে ক্লান মিলে একটি করে ট্রাইব। যেমন ধরা যাক, রেড-ইণ্ডিয়ানদের একটি ট্রাইব—তার নাম সেনেকা। সেনেকা ট্রাইবের মধ্যে অনেকগুলি ক্লান: ভালুক, নেকড়ে, বীবর, কাছিম, হরিণ, স্নাইপ-পাখি, হেরন-মাছ, বাজপাখি। ক্লানগুলির নাম এ-রকম জন্তুজানোয়ারের মতো কেন—সে-কথা পরে তুলবো। সবগুলি ক্লান মিলে সেনেকা ট্রাইব।

অনেক সময় ট্রাইব আর ক্লানের মাঝে আর-একটি ভাগ থাকে। তাকে বলে ফ্রাত্রি। ফ্রাত্রি মানে ভাই-ভাই সম্পর্ক—ভ্রাতৃত্ব। ট্রাইবটি দুটি ফ্রাত্রিতে বিভক্ত; প্রতি ফ্রাত্রি কয়েকটি করে ক্লানের সমষ্টি। সেনেকা ট্রাইবের যে-আটটি ক্লানের কথা বললাম, তার মধ্যে প্রথম চারটি ক্লান এক নম্বর ফ্রাত্রির অন্তর্গত, দ্বিতীয় চারটি দু-নম্বর ফ্রাত্রির অন্তর্গত। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ফ্রাত্রি বলে এই মধ্যবর্তী বিভাগ নেই।

বন্য দশার মধ্য স্তর থেকে বর্বর দশার মধ্য স্তর পর্যন্ত এই রকম জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ। উপরের পর্যায়ে—বর্বর দশার মধ্য স্তরে দেখা যায় অনেকগুলি ট্রাইব মিলে আরো বড়ো একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। তাকে বলে, কন্‌ফেডারেসি অব্ ট্রাইবস। রেড-ইণ্ডিয়ানদের এইরকম একটি কন্‌ফেডারেসির নাম ইরোকোয়া। এদের সঙ্গেই মর্গানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো—ইরোকোয়াদের সেনেকা ট্রাইবই তাঁকে জ্ঞাতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।

ইরোকোয়াদের সংগঠনটা কী রকম তাই দেখা যাক।

ইরোকোয়াদের কন্‌ফেডারেসি

তার অন্তর্গত

ট্রাইব	ফ্রাত্রি	ক্লান
১ : সেনেকা	১	ভালুক, নেকড়ে, বীবর, কাছিম
	২	হরিণ, স্নাইপ, হেরন্, বাজপাখি
২ : কেউগা	১	ভালুক, নেকড়ে, কাছিম, স্নাইপ, ইলমাছ
	২	হরিণ, বাজপাখি, বীবর
৩ : অননডগা	১	ভালুক, বীবর, কাছিম, স্নাইপ, বল
	২	হরিণ, ভালুক, ইলমাছ
৪ : টুসকারোরা	১	ভালুক, বীবর, বড়ো-কাছিম, ইলমাছ
	২	সাদা-নেকড়ে, হলদে-নেকড়ে, ছোট-কাছিম, স্নাইপ
৫ : মোহক	ফ্রাত্রি নেই	ভালুক, নেকড়ে, কাছিম
৬ : ওনেইডা	ফ্রাত্রি নেই	ভালুক, নেকড়ে, কাছিম

তাহলে, ইরোকোয়াদের এই সমাজ-সংগঠনের মূলে রয়েছে ক্লান। কয়েকটি করে ক্লান মিলে ফ্রাত্রি বলে আরো বড়ো একটি সংগঠন গড়ে তুলছে, দুটি করে ফ্রাত্রি মিলে এক-এক ট্রাইব, মোট ছটি ট্রাইব মিলে ইরোকোয়াদের কন্‌ফেডারেসি অব্‌ ট্রাইবস্‌। অবশ্য সব ট্রাইবের বেলাতেই ফ্রাত্রি বলে ওই অন্তর্বর্তী বিভাগটি নেই এবং পৃথিবীর সমস্ত আদিবাসীরাই ইরোকোয়াদের মতো কন্‌ফেডারেসি অব্‌ ট্রাইবস্‌-এর পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে নি।

এবার দেখা যাক, এ হেন ট্রাইব্যাল-সমাজের শাসন-পরিচালনের কাজ চলে কী করে।

এ-সমাজের মূলে রয়েছে ক্লান। তাই ক্লানের কথা থেকেই শুরু করতে হবে।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা

ক্লানের সভা বসে। ক্লানের কাজ কী ভাবে চলবে-না-চলবে সে বিষয়ে এই সভাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভার সভ্য বলতে কারা? ক্লানের সকলে—অর্থাৎ সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং স্ত্রীলোক। এ-সভায় প্রত্যেকেরই সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব। তাই ক্লানের মধ্যে সাম্য আর স্বাধীনতার অপরূপ বিকাশ—সকলেই স্বাধীন, সমান, আর তা ছাড়া সকলের মধ্যেই সত্যিকারের ভাই-ভাই সম্পর্ক—কেননা, আমরা আগেই দেখেছি, ক্লানের সকলেরই ধারণা যে তারা একই পূর্বপুরুষের বংশধর, পরস্পরের জ্ঞাতি।

পরের যুগের ইতিহাসে মানুষ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা অনেক বলেছে। কিন্তু ওই প্রাচীন সমাজে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা যে-রকম পরিপূর্ণ আর যতোখানি বাস্তব ছিলো তা প্রাচীন সমাজ ভেঙে যাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ আর কোথাওই প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।

ক্লানের সর্দার নেই? মোড়ল নেই? আছে। সর্দারের দায়িত্ব যুদ্ধের সময় ক্লানের নেতৃত্ব করা, মোড়লের দায়িত্ব শান্তির সময়ে ক্লানের কাজ পরিচালনা করা। কিন্তু মোড়ল আর সর্দার আছে বলেই ক্লানের মধ্যে ছোটোয়-বড়োয় তফাত কল্পনা করবার কারণ নেই।

প্রথমত, ক্লানের সবাই—সমস্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোক—সভায় বসে তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো একজন বিজ্ঞকে মোড়ল হিসেবে

নির্বাচন করে। সর্দার অবশ্য ক্লানের বাইরের কেউ—অপর ক্লানের কেউ—হতে পারে। কিন্তু তাকেও ওই ভাবে সকলে মিলে একসঙ্গে মত দিয়ে নির্বাচন করবে। দ্বিতীয়ত, কোনো মোড়ল বা সর্দারের কাজ যদি সন্তোষজনক না হয়, কিংবা তার ব্যবহারে যদি কোনো অন্যায় বা ভুলচুক ধরা পড়ে, তাহলে আবার ক্লানের সভা বসবে, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করবে মোড়ল বা সর্দারকে খারিজ করে নতুন মোড়ল বা নতুন সর্দার নির্বাচন করবার। খারিজ হয়ে গেলে আগে যে-ছিলো মোড়ল বা সর্দার সে হয়ে যাবে ক্লানের এক সাধারণ সভ্য মাত্র। তাছাড়া সর্দার বা মোড়ল অবস্থাতেও তার শুধু দায়িত্বই বেশি; কিন্তু অধিকারের দিক থেকে তার অবস্থা ক্লানের বাকি সবাইকার সঙ্গে সমান-সমান।

ক্লানের মধ্যে প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হলো পরস্পরকে সাহায্য করা, পরস্পরকে রক্ষা করা। এইখানে একটা কথা আছে। আমরাও পরস্পরকে সাহায্য বা রক্ষা করবার কথা বলি; কিন্তু আমরা বলি এটা করা উচিত—না-করা অনুচিত। ক্লানের বেলায় কিন্তু এ-রকম উচিত-অনুচিতের ধারণা ফুটে ওঠে নি। ওদের কাছে ওইটেই হলো স্বাভাবিক, তাই ওটা না-করবার কোনো প্রশ্ন নেই। স্বাভাবিক মানে? যেমন আমাদের কাছে তৃষ্ণার সময় জলপান করা উচিত কি-অনুচিত এ প্রশ্ন ওঠে না, বুক ভরে শ্বাস নেওয়া উচিত কি অনুচিত এ প্রশ্ন ওঠে না,—তেমনিই ওরা ক্লানের পরস্পরকে সাহায্য করা-না-করা নিয়ে কোনো-রকম প্রশ্ন তুলতেই শেখে নি। তাই ওদের কাছে এটাই হলো সহজ স্বাভাবিক—বুক ভরে শ্বাস নেবার মতো। এর একটা কারণ আছে। সভ্য ও উন্নত অবস্থার মানুষদের তুলনায় ওরা অনেকখানি অসহায়, অনেকখানি নিরুপায়। তাই ও-অবস্থায় পরস্পরের সহযোগিতার উপর নির্ভর না-করে বাঁচবারই উপায় নেই। ফলে, সহযোগিতাটাই স্বাভাবিক—

কর্তব্যবোধ হিসেবে সহযোগিতার কথা ওদের পক্ষে শেখবার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা আজ যাকে সুনীতি বলি, কর্তব্য বলি, উচিত বলি,—ওদের পক্ষে তা জীবনেরই একটা অঙ্গ। যেন সহজ বৃত্তির মতো। ফলে, ওদের ওই সহজাত সরল নীতিবোধটা দেখে আমরা হয়তো অনেক সময় অবাক হয়ে যাই ; কিন্তু সেই সঙ্গেই এ কথাও মনে রাখা দরকার যে এই সহজ সরল নীতিবোধ ওদের জীবনের দৈন্যেরই পরিণাম : ওরা অমন নিরুপায় আর অসহায় বলেই ওদের পক্ষে পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভর না করে যেন বাঁচবারই উপায় নেই।

এইদিক থেকেই ওদের সঙ্গে সভ্য মানুষদের আরো একটা মস্ত তফাত বুঝতে পারা যাবে। সভ্য-সমাজের মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি : এ-জমি আমার, এ-জিনিস আমার,—আমার সম্পত্তি কেউ যাতে কেড়ে নিতে না পারে তার জন্যে আইন আদালত হাকিম সেপাই। ক্লান-সমাজে কিন্তু এ রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিশেষ কিছু থাকবার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা এই সব অনুন্নত মানুষদের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির অবস্থাটা এমনই করুণ যে তাই দিয়ে খুব ধনদৌলত সৃষ্টি করা যায় না। প্রত্যেকেরই দিন-আনি-দিন-খাই ধরনের অবস্থা, উদ্‌বৃত্ত বলে বিশেষ কিছুই থাকে না, তাই সঞ্চয়ের সম্ভাবনাও নেহাতই কম। তাছাড়া, কেউ একজন মারা যাবার পর তার যেটুকু সামান্য জিনিস-পত্তর তার উত্তরাধিকারী হবে পুরো ক্লান। তাই বিষয়-সম্পত্তির দিক থেকেও ক্লানের মধ্যে বড়োয়-ছোটোয়, বড়োলোকে-গরিবলোকে, তফাত ফুটে ওঠে নি।

এবার ক্লান ছেড়ে পুরো ট্রাইবের কথা ভেবে দেখা যাক। কয়েকটি ক্লান মিলে একটি ট্রাইব। ক্লানের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে-রকম সহযোগিতা ট্রাইবের বিভিন্ন ক্লানগুলির মধ্যেও সেই

রকমের সহযোগিতাই। তাই ক্লানের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে যে রকম সভা বসে তেমনি পুরো ট্রাইবের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যেও একটি সমিতি থাকে। ট্রাইবের এই সমিতিতে প্রত্যেক ক্লানের প্রতিনিধি থাকে—ক্লানের মোড়ল ও সর্দারই হলো সেই প্রতিনিধি। এরা একসঙ্গে বসে পুরো ট্রাইবের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এই সমিতির বৈঠকটা গোপন ব্যাপার নয়। সমিতির যখন বৈঠক বসে তখন বিভিন্ন ক্লানের সাধারণ সভ্যরাও সে-বৈঠক ঘিরে জড়ো হয়—বা হতে পারে—এবং এমনকি বক্তৃতা দিয়ে সমিতির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। সমিতির বৈঠকটা এমন খোলাখুলি ভাবে হয় বলেই পুরো ট্রাইবের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবার সুযোগ পায়। তেমনি আবার অনেকগুলি ট্রাইব মিলে যখন একটি কন্‌ফেডারেসি অব্‌ ট্রাইবস্‌ গড়ে ওঠে তখন ওই ট্রাইবগুলির সমবেত স্বার্থ পরিদর্শন করবার জন্যে আরো উচ্চতম সভার ব্যবস্থা করা হয়—সে-সভায় প্রত্যেক ট্রাইবেরই প্রতিনিধি থাকবে।

তাহলে, ট্রাইবের এই সংগঠন ও বৈশিষ্ট্য দেখেই বুঝতে পারা যায় যে যতোদিন পর্যন্ত ট্রাইব্যাল-সমাজ অক্ষুণ্ণ থেকেছে ততোদিন পর্যন্ত বড়োয়-ছোটোয়, ধনী-দরিদ্রে তফাত ফুটে ওঠবার সুযোগ পায় নি। তাই ট্রাইব্যাল-সমাজের আদি-অকৃত্রিম রূপটিকে বলা হয় আদিম সাম্য-সমাজ।

টোটেম বিশ্বাস ও বহির্বিবাহ

প্রাচীন সমাজের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এবার দেখা যাক।

মোট আটত্রিশটি ক্লান নিয়ে ইরোকোয়াদের কন্‌ফেডারেসি। এগুলির নাম ভারি অদ্ভুত : মাত্র একটি ছাড়া সবগুলিরই নাম

নেওয়া হয়েছে জন্তুজগৎ থেকে—ভালুক, নেকড়ে, হরিণ, কাছিম, ইত্যাদি। অবশ্য অন্য ট্রাইবদের বেলায় দেখতে পাওয়া যায় জন্তুজানোয়ার ছাড়াও গাছগাছড়ার নাম থেকে ক্লানের নামকরণ হতে পারে। ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে সুপুরি, নারিকেল, ডুমুর, জাম, ইত্যাদি নাম একটুও বিরল নয়।

আরো মজার ব্যাপার আছে। ক্লানের সবাইকার ধারণায় তারা সবাই একই আদি-নারীর বা আদি-পুরুষের বংশধর, কিন্তু সেই আদিনারী বা আদিপুরুষ বলতে ওই জন্তুজানোয়ার বা গাছগাছড়াই—যার নাম থেকে পুরো দলের নামকরণ হয়েছে। জন্তুজানোয়ার বা গাছগাছড়া থেকে কী ভাবে মানব-দলের আবির্ভাব হতে পারে—সে বিষয়ে সাধারণত কোনো রকম পৌরাণিক বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। কাছিম ক্লানের লোকেরা হয়তো বলবে, পুরাকালে এক পুকুরের মধ্যে এক কাছিম বাস করতো। একবার প্রখর গ্রীষ্মের তাপে পুকুরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। তখন সে কাছিম পাড়ে উঠে ফেলে দিলো তার গায়ের খোলস আর খোলসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি মানুষ—তারই সন্তানেরা আজ ওই কাছিম ক্লানের বংশধর।

এ বিশ্বাস যে ক্লানের মধ্যে কী ভাবে এবং কেন জন্মালো তা নিয়ে অবশ্য আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, নানান রকমের থিয়োরি বা মতামত দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছে। এখনো এ-নিয়ে চূড়ান্ত কথা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু যেটা আশ্চর্যের বিষয় তা হলো এইভাবে জন্তুজানোয়ার বা গাছগাছড়া থেকে ক্লানের নামকরণ-ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রায় সব ট্রাইবেরই মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থার মূলে যে বিশ্বাস তাকে বলে টোটেম বিশ্বাস, কেননা ওই জন্তু বা গাছ—যার নাম থেকেই পুরো ক্লানের নামকরণ—হলো ক্লানটির টোটেম। হরিণ ক্লানের টোটেম হলো হরিণ,



আদিম গুহাচিত্র : মানুষ জন্তুজানোয়ার সেজে নাচছে। এর পিছনে টোটেম বিশ্বাসের পরিচয় স্পষ্ট। অতএব, নৃতত্ত্বে যা জানা গেলো তারই সাহায্যে প্রত্নতত্ত্বের এই নিদর্শনটিকে বোঝবার সুযোগ হলো: আদিম যুগের মানুষের মনে আজকালকার অসভ্য মানুষদের মতোই টোটেম বিশ্বাস ছিলো।

সূর্যমুখী-ক্লানের সূর্যমুখী ফুল। টোটেম শব্দটাকে আমেরিকার ওজিবওয়া বলে আদিবাসীদের ভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সব ট্রাইবই এক পর্যায়ে নয়। যতো পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ের ট্রাইব ততোই প্রকট তার টোটেম বিশ্বাস। ফলে টোটেম-বিশ্বাসের সবচেয়ে আদি-অকৃত্রিম রূপটিকে দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেই—আধুনিক যুগেও ওরা বন্য-দশার মধ্য স্তরে আটকে থেকেছে। অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মধ্যেও এ-বিশ্বাস রয়েছে, তবে অবশ্য অমন প্রকট ভাবে নয়। তাই টোটেম-বিশ্বাসকে ঠিকমতো চিনতে হলে অস্ট্রেলিয়ার আদি-বাসীদের থেকেই আলোচনা শুরু করা ভালো।



বাঁ পাশে মিশরের এবং ডান-পাশে ভারতের দেবমূর্তি—দেবতার পরিকল্পনায় এ-জাতীয় জীবজন্তুর অঙ্গ থেকে অনুমান করা যায় যে এই সব ধর্মবিশ্বাসের পিছনে টোটেম বিশ্বাসের ইতিহাস লুকোনো আছে।

একটি ট্রাইবের মধ্যে একটি ক্লানের নাম ক্যাঙারু। ক্লানের সবাইকার ধারণায়, ক্যাঙারুই তাদের পূর্বপুরুষ—ক্যাঙারু থেকেই তাদের সবাইকার জন্ম। আর তাই, তারাও ক্যাঙারু। ওদের যদি শুধোনো যায় তোমরা কে? ওরা বলবে, আমরা হলুম ক্যাঙারু—আমরা সবাই ক্যাঙারু।

তেমনি আবার সূর্যমুখী-ক্লানের সবাই বলবে, আমরা সবাই সূর্যমুখী ফুল। সূর্যমুখী ফুল থেকেই আমাদের সবাইকার জন্ম।

নিয়ম হলো, ক্লানের কেউই তাদের টোটেমকে মারতে পারবে না, খেতে পাবে না। কাছিম ক্লানের কেউই কাছিম খাবে না, হরিণ ক্লানের কেউই হরিণ খাবে না।

দ্বিতীয়ত, ক্লানের মধ্যে বিয়ে করা চলবে না। হরিণ-ক্লানের কেউই হরিণ-ক্লানের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে করতে হবে ক্লানের বাইরে—হরিণের সঙ্গে মাগুর মাছের বিয়ে হবে,

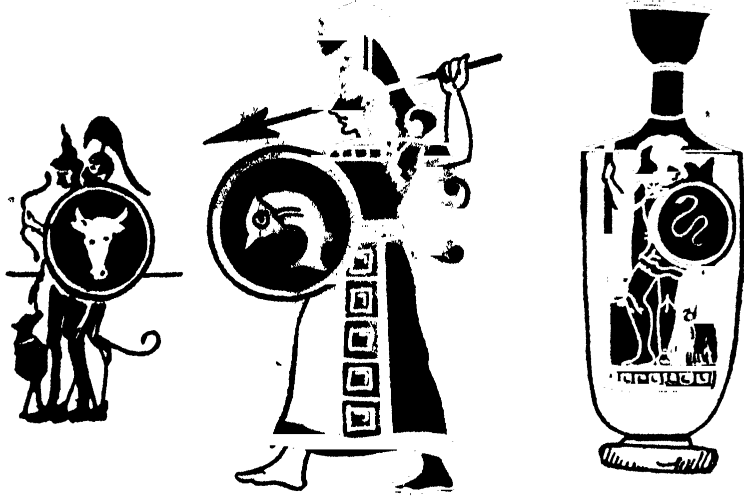


প্রাচীন মিশরের দুটি দেবতা—টোটেম-বিশ্বাস থেকেই উভয়ের জন্ম; কিন্তু একটি অপরটির বাহন হয়েছেন দেখে বোঝা যায়, যাদের টোটেম ছিলো বাজপাখি তারাই হরিণ-টোটেম-দলকে হারিয়ে দিয়েছে। এ-থেকে আমাদের দেশের দেবদেবীদের বাহনগুলির কথাও বোঝবার চেষ্টা করা চলে নাকি?

সূর্যমুখীর বিয়ে হবে, কেবল হরিণের নয়। এই নিয়মটির নাম বহির্বিবাহ, ইংরেজীতে বলে এক্সোগ্যামি।

তাহলে টোটেম ব্যবস্থার সঙ্গে দুরকম নিষেধ ব্যবস্থারও পরিচয় পাওয়া যায়: টোটেম ভক্ষণ নিষিদ্ধ, একই টোটেমের কাউকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। ট্রাইব্যাল সমাজের এ-জাতীয় নিষেধ ব্যবস্থার সঙ্গে কোন যুক্তিতর্কের সম্পর্ক নেই। নিষেধ। ব্যস। মানতেই হবে। এ-ধরনের নিষেধকে বলে 'টাবু'—টাবু শব্দটাও ওজিবওয়া বলে আদিবাসীদের ভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্লান-সমাজে সবচেয়ে বড়ো মহাপাতক বলতে প্রধানত দুরকম। এক হলো, ক্লানের কারুর পক্ষে ক্লানেরই কাউকে হত্যা করা। দ্বিতীয় হলো, ক্লানের কারুর পক্ষে ক্লানেরই কাউকে বিয়ে করা। আর ক্লান সমাজে সবচেয়ে বড়ো শাস্তি হলো বহিষ্করণ—ক্লান



প্রাচীন গ্রীসের কয়েকটি ছবি : যোদ্ধাবা ঢালের উপর নিজেদের দলের টোটেম এঁকে রাখতো। তাহলে গ্রীক যুগ পর্যন্ত টোটেম-বিশ্বাসের রেশ ছিলো।

থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। এ-শাস্তি যে কী ভয়ানক তা ওই মানুষগুলির বাস্তব অবস্থাটা মনে না-রাখলে বোঝা যাবে না। এ-অবস্থায় কারুর পক্ষেই একা-একা বাঁচা সম্ভব নয়; দলের সকলেব সঙ্গে মিলে, দলের সকলের উপর নির্ভর করে, পুরো দলের সহযোগিতার নির্ভরে বাঁচবার চেষ্টা করলে তবেই বাঁচা সম্ভব। তাই দেখা গিয়েছে, দল থেকে বিতাড়িত হলে মানুষটা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে-ঘুরতে পাগল হয়ে যায় আর শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

হিন্দুসমাজের গোত্র-ব্যবস্থা

এইবার ভেবে দেখা যেতে পারে, আমাদের হিন্দুসমাজের গোত্র-ব্যবস্থাটি কোথা থেকে এলো? এক-একটি জাতির মধ্যে নানান গোত্র রয়েছে। যেমন দেখা যায়, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কাশ্যপ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র, ইত্যাদি। কাশ্যপ কথাটা কাছিম থেকে এসেছে, ভরদ্বাজ একরকমের পাখি। তাহলে এই গোত্র-নামগুলির পিছনেও







প্রাচীন মিশরের দেবদেবী। এর থেকেই বোঝা যায় প্রাচীন মিশরের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে টোটেম-বিশ্বাসের পরিচয় কতো স্পষ্ট ছিলো।

জন্তুজানোয়ারের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আরো কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমত গোত্র-ব্যবস্থা অনুসারে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। টাবু। কাশ্যপ গোত্রের সঙ্গে কাশ্যপ গোত্রের কারুরই বিয়ে হবে না—অন্য গোত্রের কাউকে বিয়ে করতে হবে। দ্বিতীয়ত গোত্রের সকলের কাছে গোত্র-বর্ণিত জানোয়ারটি টাবু: কাশ্যপ গোত্রের কেউ কাছিম খেতে পাবে না, কাছিম মারতে পারবে না। নিষেধ আছে।

তাহলে, হিন্দুসমাজের এই গোত্র-ব্যবস্থা এলো কোথা থেকে? নিশ্চয়ই ক্লান-সমাজের টোটেম বিশ্বাস থেকে। আমরা পরে দেখতে পাবো, আমাদেব হিন্দুসমাজে ট্রাইব্যাল-সমাজের এই বকম আরো অনেক স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। এর থেকেও বুঝতে পারা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষেরাও পৃথিবীর সমস্ত সভ্য মানুষদের পূর্বপুরুষদের মতোই ওই প্রাচীন সমাজেই, ওই টোটেম বিশ্বাস নিয়েই, জীবন যাপন করতেন এবং যে কোনো কারণেই হোক আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই আদিম বিশ্বাসের জের আজো আমাদের মন থেকে মুছে যায় নি।

প্রাচীন মানুষদের মনের বিশ্বাস আরো একটু ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

ধর্ম, বিজ্ঞান ও জাদুবিশ্বাস

ধরা যাক, আকাশে মেঘের চিহ্ন, অনাবৃষ্টির আশঙ্কা। বৃষ্টি না হলে ফসল ফলবে না। ফসল না ফললে মানুষ বাঁচবে না।

উপায় কি?

উপায়ের নির্দেশ তিন রকমের হতে পারে। সেই তিনটির কথা বুঝলে ধর্ম, বিজ্ঞান আর জাদুবিশ্বাসের তফাতটা দেখতে পাওয়া যাবে।

একজন বললো, হরি হে রক্ষা করো। সে প্রার্থনা করলো, মানত করলো, মিনতি জানালো দেবতার পায়ে। তার বিশ্বাস এতে দেবতার করুণা জাগবে, ভগবান খুশি হবেন। তাঁর মনে করুণা জাগলে বৃষ্টি পাওয়া যাবে। কেননা, বৃষ্টি যে হয় তা তাঁরই ইচ্ছায়।

এই লোকটির নাম হলো ধার্মিক। এই লোকটি যে কথায় বিশ্বাস করে তাকে বলে ধর্ম। ধর্মের মূল কথা হলো, তুনিয়া চলে ঈশ্বরের ইচ্ছেয়—তাঁর ইচ্ছে না হলে কোথাও কিছু একচুল নড়বে না, কোনো ঘটনাই ঘটতে পারে না। মিনতি করে, মানত করে, উপাসনা করে তাঁব মন পাওয়া যায়।—অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

আর একজন হয়তো বেরিয়ে আসবে তার গবেষণাগার থেকে। বলবে, অনেক দেখে অনেক পরীক্ষা করে আর অনেক ভাবে মাথা খাটিয়ে বৃষ্টি হবার নিয়ম আবিষ্কার করেছি। এই নিয়মগুলির উপর নির্ভর করেই এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে আকাশে মেঘ জমতে বৃষ্টি হতে বাধ্য হয়। লোকটি হয়তো অনেক রকম জটিল যন্ত্রপাতিও বানিয়েছে, তারই সাহায্যে সে আকাশে বৃষ্টি ঝরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।

একে বলবো, বৈজ্ঞানিক। যে-কথায় তার বিশ্বাস তার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মূল কথা হলো, তুনিয়াটা নিয়মের রাজ্য। এখানে যে কোনো ঘটনাই ঘটুক না কেন তা নির্দিষ্ট নিয়মের দরুন ঘটে—কারুর ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর কোনো ঘটনাই নির্ভর করে না। প্রকৃতির নিয়মকে ঠিকমতো জানতে পারলে সেগুলির উপর নির্ভর করেই প্রকৃতিকে মানুষ দরকারমতো বদল করতে পারে।

এই তুটি লোকের কথাই আমরা বেশ সহজে বুঝতে পারি। অর্থাৎ বিজ্ঞান কী আর ধর্ম কী তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। কিন্তু প্রাচীন মানুষ এই তুরকমের একরকম কথাও বুঝতে

শেখে নি। তার মনে যে বিশ্বাস তা হলো না ধর্ম, না বিজ্ঞান। সে হয়তো মাদল বাজিয়ে ডাক দেবে দলের বাকি সকলকে। আর তারপর হয়তো সবাই মিলে আকাশের দিকে জলের ছিটে ছড়াতে ছড়াতে বৃষ্টির একটা নকল তোলবার চেষ্টা করবে। হয়তো দল-বেঁধে গান শুরু করবে ; সে গানের মূল কথা হবে আকাশ কালো করে মেঘ এসেছে, বৃষ্টি নেমেছে। গানের সঙ্গে তালে তালে নাচও। সে নাচের ভঙ্গিকে ভালো করে নজর করলে আমরা দেখবো তার মধ্যেও বৃষ্টি পড়বার, বৃষ্টিতে ভেজার, বা বৃষ্টির জলে শিসগুলির দোলবার নকল তোলবার আয়োজন করা হয়েছে।

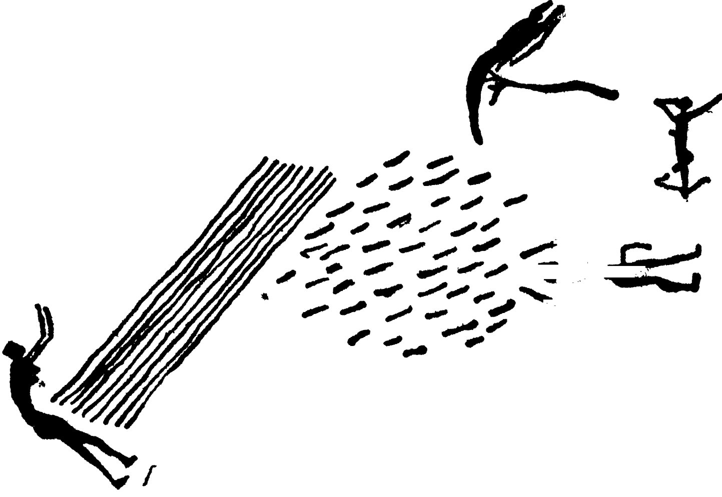
কিংবা ওরা অন্য রকম ব্যবস্থাও করতে পারে : হয়তো হাঁড়িতে জল ভরে হাঁড়ির গায়ে ফুটো করে হাঁড়িটাকে গাছের ডগায় টাঙিয়ে দিলে। হাঁড়ির ফুটো দিয়ে ঝিরঝির করে জল পড়বে— বৃষ্টি পড়ার মতো, বৃষ্টিরই যেন নকল। আর ওরা ভাববে, এইভাবে নকল বৃষ্টি সৃষ্টি করেই আসল বৃষ্টিকেও আয়ত্তে আনা যাবে।

এরই নাম হলো জাদু। ধর্মও নয়, বিজ্ঞানও নয়। জাদু বিশ্বাস আর জাদু অনুষ্ঠান। ইংরেজিতে বলে ম্যাজিক। কিন্তু ম্যাজিক বলতে সাধারণত যে-রকম হাত-সাফাইএর খেলা বোঝা হয়, তা নয়।

জাদুবিশ্বাস দু রকমের হতে পারে। ইংরেজিতে বলে কন্‌টেজিয়াস্ ম্যাজিক আর ইমিটেটিভ্ ম্যাজিক। তফাতটা কী রকম তাই দেখা যাক।

ধরা যাক, সমস্যা হলো, শত্রুকে বধ করবার। জাদুবিশ্বাসের দিক থেকে দুরকমের ব্যবস্থা হতে পারে।

এক : শত্রুর চুল বা নখ বা কাপড়ের খুঁট কেটে এনে তাইতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। বিশ্বাসটা হলো, শত্রুর অংশটিকে



আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্র ; এর মূলেও রয়েছে
বৃষ্টি-ঝরানো-মূলক জাদু-বিশ্বাস।

পুড়িয়ে দিতে পারলে শত্রুও পুড়ে খাক হয়ে যাবে। এ হলো, কন্টেজিয়াস্ ম্যাজিক।

দুই : শত্রুর একটা মূর্তি তৈরি করা হলো। হয়তো মোমের মূর্তি। কিংবা হয়তো কুশের তৈরি মূর্তি। যাকে বলে, কুশপুত্তলী। তারপর এই মোমের মূর্তিটির গায়ে তীর বিঁধিয়ে, কিংবা ওই কুশপুত্তলীকে পুড়িয়ে ফেলেই কল্পনা করা হলো যে এইভাবে শত্রুকে তীর মারবার একটা নকল তুলেই, কিংবা শত্রুকে দগ্ধ করবার একটা নকল তুলেই আসল শত্রুকেও সত্যিসত্যিই বিনাশ করা যাবে। একে বলা হয় ইমিটেটিভ্ ম্যাজিক।

জাদুবিশ্বাসের এই দুরকম নমুনার মধ্যে প্রাচীন মানুষদের ভিতর দ্বিতীয়টিরই প্রচলন বেশি।

'মেক্সিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপূজোয় মেয়েরা এলোকেশী হয় —শস্য যেন এলোকেশের মতো গোছাগোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়'।

শণ বোনবার পর কোথাও কোথাও চাষীরা কোদালগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে নাচতে শুরু করে। তাদের বিশ্বাস, শণ-এর শিষও কোদালের অনুকরণে আকাশকে স্পর্শ করবে।

আবার ওই জাদুবিশ্বাসেরই রেশ টেনে আমাদের গাঁয়ের লোকেরা বলে, জোড়া ফল খেলে যমজ ছেলে হবে।

এ-সবই হলো জাদুবিশ্বাসের নমুনা—ইমিটেটিভ্ ম্যাজিক। এ-রকম জাদুবিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে, অনুকরণ। মানুষ যা ঘটাচ্ছে প্রকৃতি তারই অনুকরণ করবে। কিংবা উলটো দিক থেকে, প্রকৃতিতে একটা কিছু ঘটলে মানুষের মধ্যেও তার অনুকরণে কিছু ঘটে যাবে—জোড়া ফল খেলে যমজ সন্তান হবে।

জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের আকাশ-পাতাল তফাত। কেন না, জাদুবিশ্বাসের মধ্যে প্রার্থনা, উপাসনা, মানত, মিনতির কোনো স্থান নেই। কোনোভাবে কারুর মনে করুণা জাগিয়ে সিদ্ধি লাভ করবার প্রশ্ন ওঠে না। তার বদলে জাদুবিশ্বাসের মূল কথাটা যেন অমোঘ নিয়মেরই কথা—কারুর ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর প্রকৃতির কোনো ঘটনাই নির্ভর করছে না। ঠিকমতো যদি বৃষ্টির নকল তোলা যায় তাহলে বৃষ্টি হবেই হবে—কারুর ইচ্ছে কারুর অনিচ্ছের উপর তা নির্ভর করে না।

নিয়মের উপর এই যে অটল বিশ্বাস—এইদিক থেকে বরং জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানেরই মিল বেশি। তবুও বিজ্ঞান আর জাদুর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। কেননা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বাস্তব-নিয়মকানুন আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা হচ্ছে—তার তুলনায় জাদুবিশ্বাসের মূলে যে ধরনের নিয়মের কল্পনা, তা নেহাতই আজগুবি, নেহাতই অসম্ভব। আকাশে জলের ছিটে ছুঁড়ে বৃষ্টির একটা নকল তুলতে পারলেই সত্যিকারের বৃষ্টি পড়বে

না, মেয়েরা যদি চুল এলো করে গোছাগোছা শস্যের নকল তোলে শস্য সত্যিই গোছা-গোছা হয়ে উঠবে না।

অথচ, যতো আজগুবি আর যতো অসম্ভবই হোক না কেন,—আদিম মানুষদের বিশ্বাস বলতে এই জাদুবিশ্বাসই। তারা না-জানে বিজ্ঞান, না-জানে ধর্ম। জানে শুধু এই জাদুই। এই জাদুর সঙ্গেই ওদের জীবন-মরণের সম্পর্ক। এ-রকম বিশ্বাস কেন?

পৃথিবীর উপর আধুনিক মানুষের দখল অনেক বেড়েছে। তাই আধুনিক মানুষদের জীবনে সংকট বা অনিশ্চয়তা তুলনায় কম। আদিম মানুষদের অবস্থা অনেকখানিই অসহায়ের মতো। কেননা তাদের হাতিয়ার তুচ্ছ, পৃথিবীর উপর দখল অতি সামান্য। আর, অমন অসহায় অবস্থা বলেই তাদের পক্ষে অনেক বেশি মনের বল দরকার। জাদুবিশ্বাস তাদের কাছে ওই মনের বলের যোগান দিতে পারে। কী করে? অনুকরণের সাহায্যে কামনাকে সফল করবার আয়োজন—যতো কাল্পনিক ভাবেই তা হোক না কেন। আর কামনা সফল হওয়ার এই ছবিটিকে মনের সামনে বাঁচিয়ে রেখে, তার থেকে প্রেরণা পেয়ে, ওরা সত্যিই কামনাকে সফল করবার দিকে ভালো করে এগুতে পারে বইকি!

পলিনেসিয়ার একজাতের আদিবাসীদের বলে মাওরি। তাদের মধ্যে একরকম নাচ আছে, তাকে বলে আলু-নাচ। আলুর চারাকে বাঁচিয়ে রাখার, বড়ো করার কামনায় এই নাচ। পুব-হাওয়ার উপর নির্ভর করে আলুর চারা। মেয়েরা তাই খেতে গিয়ে নাচতে শুরু করে—সে-নাচের দোলায় হাওয়ার আর বৃষ্টির আর ফুল ফোটার আর ফসল ফলার অনুকরণ। নাচতে-নাচতে ওরা গান শুরু করে; সে-গানের ভাষায় ওরা আলুর চারাদের ডেকে বলে ওদের নকল করতে। ওদের নাচে, ওদের গানে ওদের ওই কামনাকে সফল করবারই কল্পনা।



প্রাচীন মিশরের নাচের ছবি।







আদিম যুগের গুহাচিত্র—নাচের ছবি। এইভাবে নাচের মধ্যে কামনা-সফল হওয়ার একটা নকল তুলে বাস্তবিকই কামনাকে সফল করবার পরিকল্পনা—অর্থাৎ, জাদুবিশ্বাস।

কথা হলো, এর দরুন কি সত্যিই ভালো ফসল ফলবে? ওই নাচের আর গানের কি সত্যিই কোনো প্রভাব পড়বে আলুর চারাগুলির উপর? সরাসরি নিশ্চয়ই কোনো প্রভাব পড়তে পারে না। তবু ওই নাচের আর গানের দরুন একটা পরোক্ষ প্রভাব ফসলের উপরও পড়ে। কেমনা, ওই যে-মেয়েরা আলুখেতে কাজ করতে বেরিয়েছে ওদের মনের উপর জাদুবিশ্বাসটির প্রভাব সত্যিই প্রচণ্ড—ওই অনুকরণের মধ্যে কামনা সফল হবার ছবিটিকে দেখতে দেখতে আর তারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওরা চাষের কাজে অনেক ভালো করে আত্মনিয়োগ করতে পারে। তাই পরোক্ষ ভাবে কাজটার উপরেও একটা প্রভাব পড়ে বই কি। ফলে জাদু-বিশ্বাস যতো অসম্ভব আর আজগুবিই হোক না কেন, মানবোন্নতির ওই পর্যায়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে তা সাহায্য করেছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

পৃথিবীতে আজো যারা পিছিয়ে-পড়া পর্যায়ে আটকে রয়েছে তাদের দিকে চেয়ে দেখলে আমরা সর্বত্রই এই জাদুবিশ্বাসের পরিচয় স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আর আমাদের পূর্বপুরুষেরাও এককালে ওই পর্যায় পার হয়ে এগিয়েছিলো বলেই আমরা যতোই পিছু হটে প্রাচীন সংস্কৃতির দিকে ফিরে যাই ততোই এই জাদুবিশ্বাসের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, একটা নমুনা হলো আমাদের দেশের অথর্ব-বেদ সংহিতা—এর প্রায় সবটুকুই জাদুবিশ্বাস বা ম্যাজিক। একটু পরেই আমরা বৈদিক সাহিত্যের কথা তুলবো আর সেই প্রসঙ্গেই অথর্ববেদের কথাও আলোচনা করবো।

বাঙলার ব্রত

আমাদের গোত্র-ব্যবস্থায় প্রাচীন পর্যায়ের টোটেম-বিশ্বাস আর বহির্বিবাহ ব্যবস্থার রেশ থেকে গিয়েছে। তেমনি বাঙলার

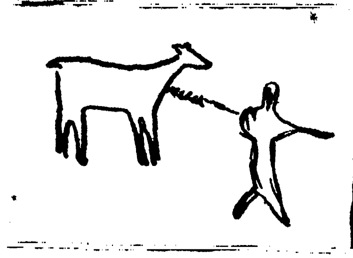




আদিম মানুষের গুহাচিত্র : এর পিছনে যুদ্ধে গো-সম্পদ লাভের কামনা সফল করবার আয়োজন। অর্থাৎ, জাদু-বিশ্বাস।

ব্রতগুলির মধ্যে স্পষ্ট রেশ রয়েছে ওই আদিম জাদুবিশ্বাসের। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত' বলে একটি ছোট্ট বই লিখেছেন। সেই বইটি অবলম্বন করেই আমরা ব্রতর কথা আলোচনা করবো।

ব্রত আর যাই হোক, প্রার্থনা, মানত বা উপাসনা নয়। ধর্ম নয়। ব্রতর মূল কথা হলো কামনা। কিন্তু সে-কামনার সফলতার জন্যে দেবতার কাছে কৃপাভিক্ষা করা নয়, তার বদলে ছবিতে,



ভারতের হোসেঙ্গাবাদ জেলায় পাওয়া গুহাচিত্র: এইভাবে ছবির মধ্যে হরিণ শিকারের নকল তুলে বাস্তবে হরিণ-শিকার সহজসাধ্য করবার পরিকল্পনা।

ছড়ায়, গানে, নাচে এবং নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই কামনা সফল হবার একটা নকল তোলবার আয়োজন। অবশ্য কোনো কোনো ব্রতর মধ্যে দেবতার কথা, দেবতার কাছে কৃপাভিক্ষা করবার কথা দেখা যায়। কিন্তু এগুলি আসল ব্রত নয়; অনেক পরের যুগের কৃত্রিম ব্রত। আসল ব্রতগুলি পুরাণের চেয়েও পুরোনো—হয়তো বেদের সমসাময়িক। সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে টিকে রয়েছে।

যেগুলি খাঁটি ব্রত—আদি অকৃত্রিম ব্রত—সেগুলির মূল হলো কামনা সফল হওয়ার একটা নকল তোলা—নানান ভাবে এই নকল তোলবার চেষ্টা করা হয়। হয়তো আলপনায় কামনা সফল হবার ছবিটি এঁকে দেওয়া হলো, কিংবা হয়তো গানের মধ্যে নাচের মধ্যে ছড়ার মধ্যে বা অন্যান্য নানান ক্রিয়ার মধ্যে কামনা সফল হওয়ার এই কথাটিই ফুটিয়ে তোলার আয়োজন করা হলো।

একটা নমুনা দেখা যাক।

বৃষ্টির কামনা করে বসুধারা ব্রত। বৃষ্টির কামনা কেন? কেন না তখন জ্যৈষ্ঠের কাঠফাটা রোদ, মাটি তেতে উঠেছে, জল ফুরিয়ে গিয়েছে।

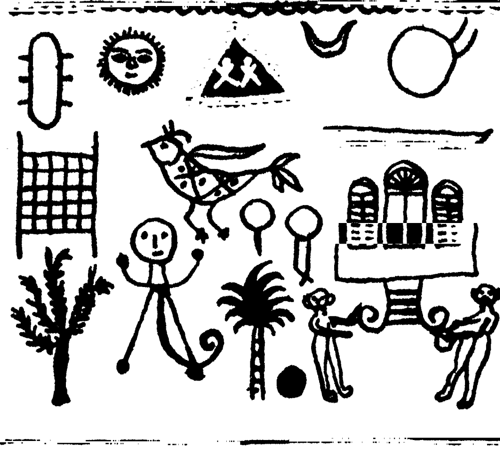
কালবৈশাখী আগুন ঝরে !
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে।
গঙ্গা শুকুশুকু, আকাশে ছাই !

তাই সেদিনের বসুধারা ব্রতের ছড়ায় শুধু জল আর জল। "অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আমাদের যদিই বা এখন কোনদিন চঞ্চল করে তবে হয়তো 'হরি হে রক্ষা করো' বলি মাত্র; কিন্তু ঋতুবিপর্যয়ের মানে যাদের কাছে ছিলো প্রাণসংশয়, সেই তখনকার মানুষেরা কোনো অনির্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা কেবল মুখে জানিয়ে তৃপ্ত হতে বা নিশ্চিন্ত হতে পারতো না; সে 'বৃষ্টি দাও' বলে ক্ষান্ত হচ্ছে না; সে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে, ফসল ফলিয়ে দেখতে চলেছে।······এখনকার মানুষ এ-রকম বিশ্বাস করে না, ব্রতও করে না।"

ব্রতর মধ্যে কী ভাবে বৃষ্টি সৃষ্টি করবার আয়োজন? "বৃষ্টি কামনা করে দল বেঁধে তারা মাটির ঘটকে মেঘরূপে কল্পনা করে শিকের খোঁচায় ফুটো করে বট পাকুড় ইত্যাদি গাছের মাথায় জলধারা দিয়ে বসুধারা ব্রতটি করছে।" আর এইভাবে বৃষ্টির একটা নকল সৃষ্টি করেই মনে মনে বিশ্বাস করছে যে বৃষ্টি এবার হবেই হবে, হতে বাধ্য। আর ব্রতের ছড়ার মধ্যে কামনা সফল হবার ওই ছবিটিই ফুটে উঠছে :

তিনকুলে পড়বে জলগঙ্গার ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে, অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে।

অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে, নৃত্যে; এককথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা।" অর্থাৎ কিনা, ব্রতগুলির মূল কথা হলো জাদুবিশ্বাস—প্রাচীন সমাজের প্রাচীন বিশ্বাস। সে-সমাজে মানুষ একা বাঁচে না—দশেমিলে এক হয়ে



সেঁজুতি ব্রতর আলপনা। এইভাবে মনের কামনার নকল তুলে বাস্তবিকই কামনা সফল করায় বিশ্বাস—অর্থাৎ জাদুবিশ্বাস।

বাঁচবার চেষ্টা করে। আর তাই জন্যেই ব্রতর মধ্যেও সেই যৌথ-জীবনের ছাপ: "এক জনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না, তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত-অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুইই ক্রিয়া—কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—কামনার সফলতাই তার শেষ—এই তফাত।"

শিল্পের জন্ম ও জাদুবিশ্বাস

ব্রতর মূল কথা জাদুবিশ্বাস—কামনা সফল হবার একটা অনুকরণ করে, নকল তুলে, কামনাকে সত্যিই সফল করবার আয়োজন। কিন্তু তারই সঙ্গে নানারকম শিল্পের সম্পর্ক চোখে পড়ে: নাচ, গান, কবিতা আর ছবি—তারই মধ্যে দিয়ে নানাভাবে কামনা-সফল হবার অনুকরণ করা হয়। আমরা আরো দেখেছি, আদিম

মানুষদের অবস্থাটা এমনই অসহায়ের মতো যে এই রকম জাহু-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাটা তার জীবনসংগ্রামের পক্ষে অপরিহার্য ; কেননা ওই জাহুবিশ্বাস তার মনে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করে তারই সাহায্যে তার পক্ষে জীবনসংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

এদিক থেকে আদিম মানুষের শিল্প-সৃষ্টির সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। কথাটা শুনতে আমাদের মতো আধুনিক মানুষের পক্ষে হয়তো খুবই খাপছাড়া লাগবে, কেননা আমরা আজ শিল্পের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের সম্পর্কের কথাটা প্রায় ভুলতে বসেছি। আমাদের ধারণায় শিল্প নেহাতই অবসর-বিনোদনের মতো, তার সঙ্গে জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজের সম্পর্ক নেই।

আদিম সমাজে কিন্তু মোটেই তা নয়। পৃথিবীতে আজো যে সব মানবদল ওই রকম আদিম অসভ্য পর্যায়ে আটকে পড়ে আছে তাদের পরীক্ষা করলে এটা দেখা যায়। তাদের নাচ, তাদের গান, তাদের ছবি, তাদের ছড়া—সবকিছুর সঙ্গেই একটা উদ্দেশ্যর সম্পর্ক, উদ্দেশ্যটা হলো কামনা সফল হওয়ার নকল সৃষ্টি।

নাচের কথাটা দেখা যাক। শ্রীমতী জেন হ্যারিসন বলছেন, অসভ্য আদিবাসীদের মধ্যে নাচের আয়োজন ঠিক কোন্ উপলক্ষে, কোন্ সময়ে,—তা পরীক্ষা করলেই আমরা দেখতে পাবো যে এ-নাচ যুদ্ধের পর বা শিকার সমাপন হবার পর বিজয়োল্লাসকে ব্যক্ত করবার আয়োজন নয়। কেননা, নাচটা হয় যুদ্ধের আগে, শিকারে বেরুবার আগে। হয়তো একটি ট্রাইব যুদ্ধে যাত্রা করবে ; যাত্রা করবার আগে ওরা রণ-নৃত্য শুরু করে ; নাচের মূল কথাটা হলো যুদ্ধে সফল হবার একটা নকল সৃষ্টি করাই—অর্থাৎ, ওই জাহুবিশ্বাসই। এবং এই নাচের সাহায্যেই পুরো দলটি অনুপ্রাণিত

হয়ে ওঠে—যুদ্ধে সফল হবার স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ওরা যখন সত্যিই যুদ্ধে যাত্রা করে তখন ওদের পক্ষে ভালো করে যুদ্ধ করা অনেক সহজ হয়ে আসে। কোনো ট্রাইব হয়তো শিকারে বেরুবে ; শিকারে যাত্রা করবার আগে ওরা শিকার নাচ নেচে যেন শিকার করার একটা মহড়া দিয়ে নেয়। নাচের মূল কথা হলো শিকারে সফল হবার কামনাটিকে আগে থাকতেই সফল করে দেখবার আয়োজন।

তেমনি গানের বেলাতেও, কবিতার বেলাতেও একই কথা। আদিবাসীদের মধ্যে সব কবিতাই হলো গান—গান ছাড়া কবিতা হয় না, আর সব গানের মূলেই এক কথা—কামনা সফল হবার কথা। ওদের বিশ্বাস, এইভাবে গানের মধ্যে কামনা সফল করবার আয়োজন করতে পারলে কামনা সত্যিই সফল হবে। অর্থাৎ ওই জাহুবিশ্বাসই।

আমাদের পূর্বপুরুষেরাও যে এই রকম আদিবাসীদেরই অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলো তার নানারকম স্মৃতিচিহ্ন আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। একটা নমুনা দেখা যাক।

বৈদিক সাহিত্যে,—বিশেষ করে ছান্দোগ্য-উপনিষদে,—বারবার একটা কথার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। কামগান। কথাটা এমনিতে শুনতে খুবই খাপছাড়া লাগে। কামনার সঙ্গে গানের সম্পর্ক কী? কিন্তু যাঁরা এইসব প্রাচীন সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁরা আমাদের তুলনায় প্রাচীন সমাজের অনেক কাছাকাছি ছিলেন আর তাই জন্যেই তাঁদের ধারণাতে কামনার সঙ্গে—অর্থাৎ, কামনা সফল করার একটা নকল তোলার সঙ্গে—গানের সম্পর্কটাও খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো। আর তাঁদের বিশ্বাস ছিলো এইভাবে গান গেয়েই কামনাকে বাস্তবিক সফল করা যাবে। তাই তাঁরা তাঁদের গানগুলিকে বলতেন, কামবর্থী গান।

প্রাচীন-সাহিত্যের একটি গল্প

এইখানে ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি গল্প বলি। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের স্মৃতিতে ওই আদিম পর্যায়ের কথা যে কতোখানি অক্ষুণ্ণ ছিলো গল্পটি থেকে তা অনুমান করা যাবে, আর সেই সঙ্গেই দেখতে পাওয়া যাবে ওই প্রাচীন পর্যায়ে গানের সঙ্গে জীবনধারণ সমস্যার সম্পর্ক কতো গভীর। কিন্তু প্রাচীন-সমাজের টোটেম বিশ্বাস এবং জাদুবিশ্বাস-সংক্রান্ত যে সব কথা আলোচনা করা হলো তা মনে না রাখলে গল্পটির মানে বোঝা যাবে না।

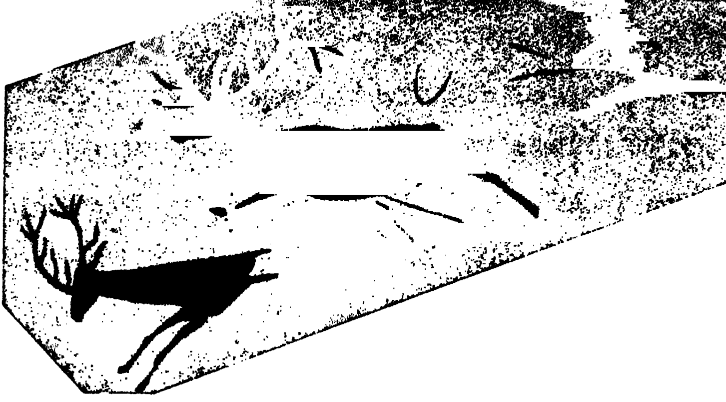
গল্পটি হলো, বক দাল্‌ভ্য বা গ্লাব মৈত্রেয় বলে একজন লোক বেদজ্ঞান পাবার আশায় বেরিয়েছিলেন। তাঁর সামনে একটি সাদা কুকুর আবির্ভূত হলো। অন্য কুকুরেরা সেই সাদা কুকুরকে ঘিরে বললে, আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে, আমাদের অন্নলাভার্থে গান দিন। সাদা কুকুর তাদের বললো, কাল সকালে এইখানে সমবেত হোয়ো। বক দাল্‌ভ্য ঠিক করলেন, কী হয় তাই দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন। পরদিন সকালে কুকুরেরা সমবেত হলো আর বহিস্পবমান স্তোত্র পাঠের সময় যেমন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হবার নিয়ম সেইভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে গান করতে লাগলো, "আমরা ভোজন করি, আমরা পান করি, দেবতা প্রজাপতি, সবিতা, বরুণ এইখানে অন্ন আহরণ করেছিলেন, অন্নপতি, অন্ন আহরণ করো, অন্ন আহরণ করো।"

ওই গানটিতেই গল্পের শেষ। গল্পটার তাৎপর্য ভেবে দেখা যাক।

এখানে একদল মানুষের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের বর্ণনা করা হয়েছে কুকুর হিসেবে। আমরা যখন মানুষকে কুকুর-বেড়াল বলি তখন আমাদের উদ্দেশ্যটা গালাগাল দেওয়াই। কিন্তু উপনিষদ তো আর আমাদের মতো আধুনিক মানুষের রচনা নয়; প্রাচীন-

কালের রচনা, প্রাচীনদের রচনা। এ রচনায় তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই একদল মানুষকে কুকুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে —ঠাট্টা করবার, বিদ্রূপ করবার বা গালাগাল দেবার কোনো রকম পরিচয় নেই। আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অবশ্য অনেকে আধুনিক ধ্যানধারণা দিয়েই গল্পটির ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন; ফলে কুকুর শব্দ দেখেই তাঁরা কল্পনা করেছেন যে গল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ওই মানুষদের কুকুর বলে ঠাট্টা করা। গল্পটির মধ্যে কিন্তু কোথাওই ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিচয় নেই। তাছাড়া ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিচয় বাদ দিয়েই, পরম সশ্রদ্ধভাবেই, জন্তুজানোয়ারের নাম থেকে মানুষের এবং মানবীয় ব্যাপারের নামকরণ করবার পরিচয় রয়েছে। একজন ঋষির নাম শুনক, মানে কুকুর। আর-একজন ঋষির নাম শুনঃশেপ—কুকুরের লেজ। একটি উপনিষদের নাম শ্বেত অশ্বতর, সাদা খচ্চোর। আর একটি উপনিষদের নাম মাণ্ডুক্য—অর্থাৎ, ব্যাঙ থেকে নেওয়া নাম। তাছাড়া, হরিবংশ বলে বইএর একটি অধ্যায়ই হলো কুকুর-বংশ বর্ণনা। মহাভারতেও আরো অজস্র জীবজন্তুর মতোই কুকুরের নাম থেকে মানবদলের নামকরণ করবার পরিচয় একাধিকবার দেখা যায়।

তাহলে উপনিষদের ওই গল্পটিতে যাদের কুকুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা মানুষই—তবে প্রাচীন সমাজের মানুষ, সে সমাজে টোটেম বিশ্বাস অনুসারে জন্তুজানোয়ারের নাম থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মানবদল নিজেদের নামকরণ করে। আর অমন প্রাচীন সমাজের মানুষ বলেই তাদের কাছে জীবন-সংগ্রামের সমস্যার সঙ্গে গানের সম্পর্ক অমন ঘনিষ্ঠ। তাদের ক্ষিদে পেয়েছিলো, তারা অন্ন চেয়েছিলো আর ওই অন্নলাভের উপায় হিসেবে চেয়েছিলো গান। গানের সঙ্গে অন্নলাভের সম্পর্ক কী? আধুনিক

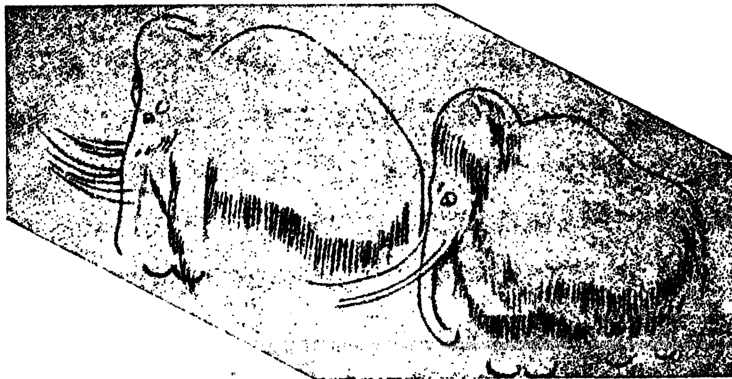




পুরোনো-পাথর যুগের গুহাচিত্র—এ-পাতার দুটি স্পেন এবং
১৮৩ পাতার দুটি ফ্রান্সে আবিষ্কৃত হয়েছে।

যুগের আধুনিক ধ্যানধারণা দিয়ে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া কঠিন। কিন্তু ওরা শেষ পর্যন্ত যে গান গাইলো তার মধ্যেই জবাবটার ইঙ্গিত রয়েছে। 'আমরা ভোজন করি, আমরা পান করি—ইত্যাদি'। যে কামনা থেকে গান চাওয়া, গানের মধ্যে সেই





কামনাটিকেই কল্পনায় সফল করে নেবার আয়োজন। অর্থাৎ, জাদুবিশ্বাস। জাদুবিশ্বাসই প্রাচীন সমাজে গানের প্রাণ। এই কারণেই বৈদিক সাহিত্যে বারবার কামগান বলে শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন মানুষদের গুহাচিত্র

শুধু নাচ, গান আর কাব্যই নয়। প্রাচীন মানুষদের আর-একটি যে শিল্পনিদর্শন—চিত্রকলা—তার মূলেও এই জাদুবিশ্বাসের—এবং অতএব জীবনসংগ্রামের—কথাই।

আদিম মানুষ কেন ছবি আঁকতো—এ প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র অসভ্য আদিবাসীদের ছবিগুলির মধ্যে আবদ্ধ থাকবার দরকার নেই। কেননা, অনেক হাজার বছর আগে—তা এমনকি বিশ-ত্রিশ হাজার বছরও হতে পারে—প্রাচীনকালের মানুষেরা যে-সব আদিম গুহার মধ্যে বাস করতো তারই গায়ে তাদের হাতের আঁকা অনেক ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। আর সেই ছবিগুলিকে পরীক্ষা করে স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যায় যে এগুলির মূলে জাদুবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না।

আধুনিক শিল্পী ছবি আঁকেন কেন? যাতে পাঁচজনে সে-ছবি দেখতে পায়, দেখতে পেয়ে খুশি হয়—এই কারণে। আদিম মানুষেরা কিন্তু মোটেই সে উদ্দেশ্যে ছবি আঁকতো না। তার প্রমাণ হলো, ছবিগুলি প্রায়ই গুহার মধ্যে এমন অদ্ভুত জায়গায় আঁকা যে সেখান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোনোই খুব কঠিন কথা। অন্ধকারে মশাল জ্বেলে হয়তো বা হামাগুড়ি দিয়ে, কিংবা হয়তো বুকে হেঁটে গুহার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছলে তবেই সে ছবি দেখতে পাওয়া যাবে; নইলে নয়। ছবি দেখে পাঁচজনের মন খুশি হবে এই উদ্দেশ্যে আঁকা হলে নিশ্চয়ই বেছে-বেছে ওই রকম অদ্ভুত-অদ্ভুত জায়গায় ছবি আঁকবার প্রশ্ন উঠতো না।

তাহলে সেই প্রাচীন শিল্পীদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অন্য কিছু ছিলো। কী উদ্দেশ্য হতে পারে? বেশির ভাগই শিকারের ছবি, বা হয়তো যুদ্ধের ছবি, কিছু কিছু নাচের ছবিও। শিকারের ছবি-গুলোয় দেখা যায়, একটা কোনো জন্তুজানোয়ার এঁকে তার গায়ে

তীর ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে, যুদ্ধের ছবিগুলিতে দেখা যায়, একদল মানুষকে যুদ্ধ করতে-করতে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তাহলে এও সেই জাদুবিশ্বাসের কথাই। ছবি এঁকে হরিণ শিকারের একটা নকল তোলা হলো আর মনেমনে বিশ্বাস করা গেলো যে এইভাবে ছবির হরিণের গায়ে ছবির বাণ বিঁধিয়ে দিয়েই আসল হরিণকেও আসল বাণ মারবার কাজ সফল হয়ে যাবে।

কোনো কোনো গুহায় এমনকি জাদু-অনুষ্ঠানের সাহায্যে বৃষ্টি পড়াবার ছবিও পাওয়া গিয়েছে।

তাহলে প্রাচীন মানুষদের মধ্যে শিল্পের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের সম্পর্কটা খুবই নিবিড়।

জ্ঞাতি-সম্পর্ক ও ভাষার সাক্ষ্য

প্রথমে ভাষা-ব্যবহার-সংক্রান্ত কয়েকটি কথা আলোচনা করে নেওয়া যাক।

প্রতিটি কথার, প্রতিটি শব্দের, একটা না একটা মানে আছে, অর্থ আছে। ওই মানে বা অর্থ বলতে কী বোঝায়? যা দেখেছি, অভিজ্ঞতায় জেনেছি, যার সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে,—এমন কিছু। হাতি দেখেছি, হাতির অভিজ্ঞতা হয়েছে,—হাতি শব্দ দিয়ে তারই ধারণা প্রকাশ করছি। তাই হলো হাতি শব্দের অর্থ।

কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা চিরকালই একরকমের নয়। স্থির নিশ্চল নয়। দিনের পর দিন মানুষ নতুন নতুন বিষয়ের পরিচয় পেয়েছে, মানুষের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে, নতুন নতুন ধারণা হয়েছে। মানুষ তার ভাষা দিয়ে এই নিত্যনতুনকে প্রকাশ করতে চেয়েছে।

ফলে মানুষের ভাষায় শব্দও অমর নয়, অর্থও অমর নয়।

অনেক সময় পুরোনো শব্দ অচল হয়ে গিয়েছে, মরে গিয়েছে। নতুন শব্দ গড়তে হয়েছে—নতুন শব্দ দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে। কিন্তু এই নতুন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করবারই আর-এক উপায় হতে পারে। কী উপায়? নতুন শব্দ গড়বার বদলে পুরোনো শব্দটাই রাখা হলো, কেবল তার অর্থ—তার মানে—বদলে দেওয়া হলো। নতুন অভিজ্ঞতার দরুন যে নতুন বিষয়টির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে পুরোনো শব্দ দিয়েই তা বোঝাবার চেষ্টা চলতে লাগলো। ফলে, মানুষের ভাষায় কখনো শব্দও বদলায়, আবার কখনো শব্দের অর্থও বদলায়।

কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে শব্দ বদলায় অনেক মন্থর গতিতে। শব্দের চেয়ে শব্দের অর্থ বদলায় অনেক তাড়াতাড়ি। অর্থাৎ, শব্দ গড়তে,—নতুন ধারণা প্রকাশ করবার জন্যে নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে,—সময় লাগে অনেক বেশি। মানুষ চেষ্টা করে, পুরোনো শব্দ বজায় রেখেই তাকে নতুন অর্থের,—নতুন ধারণার,—বাহক করতে।

যখন তাই হয়,—পুরোনো শব্দটিই টিঁকে রইলো, কিন্তু তার অর্থ বদলে গেলো,—তখন অবস্থাটা দাঁড়াবে কী রকম? তখন, শব্দটির আদি অকৃত্রিম তাৎপর্যের মধ্যে অতীতের স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যাবে আর দেখা যাবে শব্দটিকে নতুন বাস্তবের উপর, নতুন অভিজ্ঞতার উপর, যেন জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থাৎ বর্তমানের সঙ্গে শব্দটির সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যাবে আসলে অতীতের সঙ্গেই তার মিল রয়েছে।

যদি তাই হয় তাহলে মানুষের ভাষা-ব্যবহারের মধ্যেই অতীত ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া অসম্ভব নয়। কী ভাবে? যখন দেখবো একটা শব্দ দিয়ে আজ এমন কিছু বোঝানো হচ্ছে যার সঙ্গে শব্দটির আসল অর্থ সত্যিই খাপ খায় না তখন অনুমান করতে পারবো অতীতে বাস্তব অবস্থাটাই অন্য রকম ছিলো আর শব্দটির আদি-

তাৎপর্য থেকেই অতীতের সেই বাস্তব অবস্থাকে জানতে পারা যাবে। সে অবস্থা আজ বদলে গিয়েছে, কিন্তু শব্দটা বদলায় নি—শব্দের অর্থ বদল করে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এইভাবে শব্দ বিচার করে অতীত ইতিহাস উদ্ধার করবার সম্ভাবনা যে সত্যিই আছে সে-বিষয়ে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন হেনরি লুইস মর্গান।

মর্গান দেখলেন, আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে জ্ঞাতি-সম্পর্ক-সূচক শব্দগুলির আসল তাৎপর্য একরকম; যদিও সেই শব্দগুলি দিয়েই বাস্তবে সম্পূর্ণ অন্য রকমের জ্ঞাতি-সম্পর্ক বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মর্গান বললেন, এর থেকে অনুমান করা যায় যে ওদের মধ্যে আধুনিক কালে জ্ঞাতি-সম্পর্ক যে-রকমই হোক না কেন, আগেকার কালে তা অন্য রকমের ছিলো। কী রকম ছিলো? শব্দগুলির আসল মানে, পুরোনো অর্থ,—যে-রকম সম্পর্কের নির্দেশ দেয় সেই রকম। আর মর্গানের এই অনুমান যে ঠিক তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেলো। কী রকম প্রমাণ? হাউই দ্বীপের আদিবাসীরা আমেরিকার এই আদিবাসীদের চেয়ে আরো পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে থেকেছে—অর্থাৎ, আমেরিকার ওই আদিবাসীরা অতীতকালে হাউই দ্বীপের আদিবাসীদের অবস্থাতেই ছিলো, পরে সে অবস্থা পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। আর মর্গান দেখলেন, আমেরিকার আদিবাসীদের শব্দ ব্যবহারের মধ্যে যে রকম জ্ঞাতি-সম্পর্ক সূচিত হচ্ছে ঠিক সেই রকম জ্ঞাতি-সম্পর্কই বাস্তবভাবে রয়েছে হাউই দ্বীপের আদিবাসীদের মধ্যে। অর্থাৎ কিনা, আমেরিকার এই আদিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা যখন ওই হাউই দ্বীপের আদিবাসীদের অবস্থায় জীবন-যাপন করতো তখন তাদের জ্ঞাতি-সম্পর্কও ছিলো হাউই দ্বীপের

আদিবাসীদের মতোই—আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষা-ব্যবহারের মধ্যেই এই অতীত ইতিহাসটুকুর খবর পাওয়া যাচ্ছে।

তার থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, বিভিন্ন যুগে মানবসমাজে জ্ঞাতি-সম্পর্কের বেলাতেও নানারকম পরিবর্তন ঘটেছে। জ্ঞাতি-সম্পর্কেরও একটা ইতিহাস আছে।

জ্ঞাতি-সম্পর্কের ইতিহাসে কী ভাবে পরিবর্তন ঘটেছে এবং ভাষা-ব্যবহারের মধ্যে কী ভাবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করবো। বিষয়টি জরুরি; কিন্তু ভয়ানক জটিল। আমরা এখানে সমস্ত জটিলতার কথা তুলবো না। কিন্তু আমরা আলোচনা শুরু করবার আগে শুধু কয়েকটি কথা বলে রাখবো।

মর্গান তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে শুধুমাত্র আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষাই পরীক্ষা করেন নি। তিনি মোটের উপর ১৫০টি ভাষার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতের তেলেগু ভাষাও আছে—মজার কথা এই যে তেলেগু ভাষায় জ্ঞাতি-সম্পর্কবাচক শব্দগুলি প্রায় হুবহু আমেরিকার ইরোকোয়া নামের আদিবাসীদের জ্ঞাতি-সম্পর্ক-বাচক শব্দের মতো। তিনি ওই যে ১৫০টি ভাষা পরীক্ষা করেছেন তার মধ্যে জ্ঞাতি-সম্পর্ক নির্ণয়ের দিক থেকে একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মর্গান তার নাম দিয়েছিলেন classificatory system—বাঙলা করে আমরা বলতে পারি জ্ঞাতি-সম্পর্কটা দলগত বা শ্রেণীগত। বিষয়টি ঠিক কী তা আমরা আলোচনা করবো। আপাতত কথা হলো, ওই জাতীয় শব্দ ব্যবহার থেকেই একরকম জ্ঞাতি-সম্পর্ক অনুমান করা যায়; আর মর্গান দেখালেন, পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা রকম বিভিন্ন মানবদলের ভাষা-ব্যবহারের মধ্যে যদি এই একই বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে মানতে হবে সব দেশের সব জাতির মানুষের মধ্যেই

এককালে সম্পূর্ণ অন্য রকমের জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছিলো, যে জ্ঞাতি-সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাদের ওই শ্রেণীগত সম্পর্কমূলক বা ক্লাসিফিকেটরি সিস্‌টেমের মধ্যে।

কোনো কোনো আধুনিক পণ্ডিত মর্গানের এই আবিষ্কারের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু সম্প্রতি অধ্যাপক জর্জ টম্‌সন আরো ১৩০টি ভাষার সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখাচ্ছেন, এ-বিষয়ে মর্গানের গবেষণা সত্যিই কতোখানি অভ্রান্ত।

শ্রেণীগত বা দলগত জ্ঞাতি-সম্পর্ক

আমেরিকার ইরোকোয়াদের মধ্যে মর্গান একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন: তাদের বাস্তব জ্ঞাতি-সম্পর্ক একরকম অথচ জ্ঞাতি-সম্পর্ক-সূচক শব্দগুলি অন্য রকম।

বাস্তব সম্পর্ক কী রকম? খানিকটা যেন আধুনিক সমাজেরই কাছাকাছি। অর্থাৎ, একটি পুরুষের সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আর এই স্বামী-স্ত্রী তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করছে—যদিও ওদের মধ্যে এতো সহজে এ-বিয়ে ভেঙে যেতে পারে এবং এতো সহজে ওদের নতুন করে বিয়ে হতে পারে যে তা দেখে বোঝা যায়, আমাদের আধুনিক সমাজের মতো ওদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এতো পাকাপোক্ত হয় নি। তবুও, এ-রকম বিয়ের ব্যবস্থা বলেই ওদের বাস্তব জ্ঞাতি-সম্পর্ক অনেকাংশেই আধুনিক সমাজের মতো: ঠাকুমা ঠাকুরদা, দিদিমা দাদামশায়, জেঠীমা জেঠামশাই, মা বাবা, খুড়ী খুড়ো, পিসী পিসে, মাসী মেসো, মামী মামা, শাশুড়ী শ্বশুর, বোন ভাই, খুড়তুতো জেঠতুতো বোন ভাই, মাসতুতো মামাতো বোন ভাই, মেয়ে ছেলে, ভাইঝি ভাইপো, বোনঝি বোনপো—ইত্যাদি। আমাদের মধ্যেও এই সব নানা-রকম জ্ঞাতি-সম্পর্ক; আর প্রতিটি সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে আলাদা-আলাদা শব্দ আছে।

কিন্তু ওদের বাস্তব জ্ঞাতি-সম্পর্ক এতো রকমের হলেও সেই সব সম্পর্কের বর্ণনামূলক শব্দ মোটেই এতো রকমের নয়। যেমন, একজন শুধু তার নিজের ছেলেকেই ছেলে বলবে না, ভাইদের ছেলেদেরও ছেলে বলবে—ভাইপো বলে আলাদা শব্দ ওদের ভাষায় নেই। ছেলেরাও তেমনি শুধু নিজের বাবাকেই বাবা বলবে না; বাবার ভাইদেরও—জেঠা-খুড়ো সবাইকেই—বাবা বলবে। জেঠা, খুড়ো, বাবা বলে তিনটি আলাদা শব্দ নেই; শব্দ আছে শুধু একটি—বাবা। তাই দিয়েই বাবা আর বাবার সব ভাইদেরই বোঝানো হয়। শুধু তাই নয়। মেসো,—অর্থাৎ, মা-র বোনের স্বামী বোঝাবার জন্যেও ওদের ভাষায় আলাদা কোনো কথা নেই, ওই 'বাবা' শব্দ দিয়েই মেসোকেও বোঝানো হয়। মা শব্দটির বেলায় কী রকম? তাই দিয়ে শুধুমাত্র নিজের মা-কেই বোঝানো হয় না; তাছাড়াও মা-র সব বোনকেও—মাসীদেরও—বোঝানো হয়। অর্থাৎ মা আর মাসীর মধ্যে তফাত করবার মতো দুটি আলাদা আলাদা শব্দ নেই।

অপরপক্ষে, একটি ইরোকোয়া পুরুষ যদিও তার ভাইপোদের শুধুমাত্র ছেলে বলেই ডাকবে তবুও তার বোনপোদের ছেলে বলবে না। বোনপো শব্দ আর ছেলে শব্দ—দুটি আলাদা। মেয়েরা কিন্তু ঠিক এর উলটো করবে: শুধুমাত্র নিজের ছেলেকেই ছেলে বলবে না; অন্যান্য বোনদের ছেলেকেও শুধু ছেলে বলবে। তার মানে, মেয়েরা বোনপো বলে আলাদা কোনো শব্দ ব্যবহার করে না—যে শব্দ দিয়ে নিজের ছেলেকে বোঝায় সেই শব্দ দিয়েই দিদি এবং বোনদের ছেলেদেরও বোঝায়। কিন্তু ভাইদের ছেলে বোঝাবার জন্যে মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা একটি শব্দ ব্যবহার করবে।

ওদের ভাষা-ব্যবহারের কতকগুলি সম্পর্ক-সূচক শব্দ নিয়ে এবার একটা ছক কাটা যাক: এক-একটি শব্দ দিয়ে কতো রকম

সম্পর্ক বোঝানো হয় তা আমরা এক-একটি চৌকো ঘর কেটে ঠিক করে নেবো।

ধরা যাক, 'ক' শব্দ	ধরা যাক 'খ' শব্দ
১: বাবা	১: বাবার বোনের স্বামী (পিসে)
২: বাবার ভাই (জেঠা-খুড়ো)	২: মার ভাই (মামা)
৩: মার-বোনের-স্বামী (মেসো)	৩: স্ত্রীর বা স্বামীর বাবা (শ্বশুর) *

'ক' আর 'খ' সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ

ধরা যাক 'গ' শব্দ	ধরা যাক 'ঘ' শব্দ
১: মা	১: মার ভাইএর বৌ (মামী)
২: মার বোন (মাসী)	২: বাবার বোন (পিসী)
৩: বাবার ভাইএর বৌ (খুড়ী, জেঠী)	৩: স্বামীর বা স্ত্রীর মা (শাশুড়ী)

'গ' আর 'ঘ' কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ

ধরা যাক 'চ' শব্দ	ধরা যাক 'ছ' শব্দ
১: ভাই	১: মার ভাই-এর ছেলেরা
২: বাবার ভাইদের ছেলেরা	২: বাবার বোনদের ছেলেরা
৩: মার বোনদের ছেলেরা	৩: স্ত্রীর ভাই বা স্বামীর ভাই

'চ' আর 'ছ' কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ

ধরা যাক 'জ' শব্দ	ধরা যাক 'ঝ' শব্দ
১: বোন	১: মার ভাইএর মেয়েরা
২: বাবার ভাইদের মেয়েরা	২: বাবার বোনের মেয়েরা
৩: মার বোনেদের মেয়েরা	৩: স্ত্রীর বোন বা স্বামীর বোন

'জ' আর 'ঝ' কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ

ধরা যাক 'ট' শব্দ	ধরা যাক 'ঠ' শব্দ
পুরুষদের পক্ষে : বোনের ছেলে	পুরুষদের পক্ষে : ছেলে
পুরুষদের পক্ষে : জামাই	পুরুষদের পক্ষে : ভাইদের ছেলে

'ট' আর 'ঠ' কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ

ধরা যাক 'ড' শব্দ	ধরা যাক 'ঢ' শব্দ
পুরুষদের পক্ষে : মেয়ে	পুরুষদের পক্ষে : বোনের মেয়ে
পুরুষদের পক্ষে : ভাইদের মেয়ে	পুরুষদের পক্ষে : ছেলের বৌ

'ড' আর 'ঢ' কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ

এহেন জ্ঞাতি-সম্পর্ক-সূচক শব্দকে শ্রেণীগত বা Classificatory বলা হলো কেন? কেননা, আমরা যে-রকম মা, বাবা, কাকা, মেসো প্রভৃতি এক-একটি শব্দ দিয়ে এক-একটি মানুষ বুঝি এখানে তো বোঝানো হচ্ছে না; তার বদলে এক-একটি শব্দ দিয়ে এক-একটি দল বা শ্রেণী বোঝানো হচ্ছে।

বাবা, জেঠা, খুড়ো, মেসো—সব মিলে যেন একটি দল আর সেই পুরো দলটিকে বোঝবার জন্যে একটিমাত্র শব্দ। আমরা ধরেছি 'ক' শব্দ।

পিসে, মামা, শ্বশুর—সব মিলে যেন একটি দল আর সেই পুরো দলটিকে বোঝাবার জন্যে একটিমাত্র শব্দ। আমরা ধরেছি 'খ'।

মা, মাসী, খুড়ী, জেঠী—সব মিলে একটি দল আর এই পুরো দলকে বোঝাবার জন্যে একটিমাত্র শব্দ। আমরা ধরেছি 'গ'।

মাসী, পিসী, শাশুড়ী—সব মিলে একটি দল আর এই পুরো দলকে বোঝাবার জন্যে একটিমাত্র শব্দ। আমরা ধরেছি 'ঘ'।

তেমনি, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ—এই ধরনের এক-একটি শব্দ দিয়ে এক-একটি পুরো দল বোঝানো হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে বোঝানো হচ্ছে না।

আমরা সাধারণত যে-ধরনের আত্মীয়তা-বাচক শব্দ ব্যবহার করি তার সঙ্গে এর মৌলিক তফাত। কেননা, আমাদের শব্দ-ব্যবহারটা ব্যক্তিগত। বাবা বলতে মাত্র একটি ব্যক্তি। মা বলতে মাত্র একটি ব্যক্তি। তেমনি জেঠা, কাকা, মেসো—প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা এক-একজনের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে এক-একটি শব্দ ব্যবহার করি। তাই আমাদের ভাষা-ব্যবহারকে ব্যক্তিগত-সম্পর্ক-বাচক বলবো—শ্রেণীগত নয়।

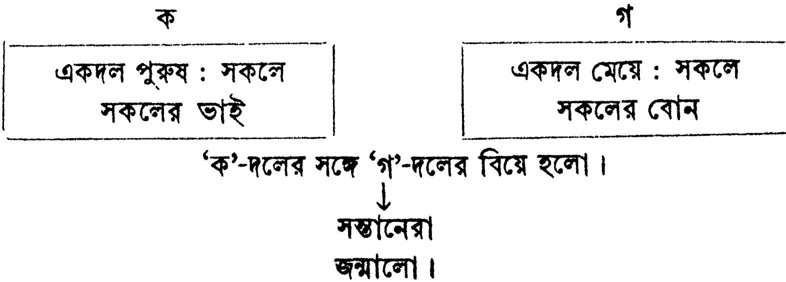
মর্গান দেখলেন, ইরোকোয়াদের নিয়ে সমস্যাটা এই যে যদিও আসলে তাদের সম্পর্ক তখন ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে তবুও ভাষা ব্যবহারটা থেকে গিয়েছে শ্রেণীগত। আর এর থেকেই অনুমান করা যায় যে আগে ওদের বাস্তব সম্পর্ক সত্যিই দলগত বা শ্রেণীগত ছিলো ; পরের যুগে সম্পর্ক বদলেছে, ব্যক্তিগত হয়ে এসেছে, কিন্তু নতুন সম্পর্ককে ব্যক্ত করবার মতো নতুন শব্দ তখনো গড়ে ওঠেনি—তাই ওদের শব্দ-ব্যবহারের মধ্যেই পুরোনো অবস্থার স্মৃতিটি তখনো টিকে আছে।

পুরোনো পর্যায়ের পুরোনো ধরনের সম্পর্ক বলতে তাহলে কী বুঝতে হবে ? দলগত সম্পর্ক। তার মানে ?

তখন বাবা, বাবার ভাইরা আর মেসোরা—সব মিলে একটিই দল আর সেই দলটিকে বোঝাবার জন্যে একটি শব্দ। তেমনি মা-মাসী আর খুড়ী-জেঠী—সবমিলে একটিই দল। সেই দলকে বোঝাবার জন্যে একটিই শব্দ।

কিন্তু এ-রকম ব্যবস্থা সম্ভব হবে কী করে ?

আজকালকার মতো একটি পুরুষের সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে না হয়ে যদি একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মেয়ের বিয়ে হয়, আর যদি পুরুষ-দলের মধ্যে সকলেই সকলের ভাই হয় এবং মেয়ে-দলের মধ্যে সকলেই সকলের বোন হয়, তাহলে। ব্যাপারটা একটা ছক এঁকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।



এখন এই সন্তানদের পক্ষ থেকে ভাববার চেষ্টা করা যাক। তারা কি কোনো একটি নির্দিষ্ট লোককে 'বাবা' বলবে? নিশ্চয়ই নয়। পুরো দলটাই তাদের 'বাবা'। দলের সবাই 'বাবা'। আর এই দলের সবাইকার মধ্যেই ভাই-ভাই সম্পর্ক। তাই, 'বাবা' আর 'বাবার ভাই' বলতে কোনো রকম তফাত নেই। কিন্তু 'বাবা' আর 'মেসো'—ছুটি শব্দের মধ্যে তফাত নেই কেন? তা বোঝবার জন্যে আগে তাদের মা আর মাসীদের কথা ভেবে দেখা যাক। মা বলতেও একটি মাত্র মেয়ে নয়—পুরো একদল মেয়ে আর এই মেয়েদের মধ্যে বোন-বোন সম্পর্ক! তাই মা আর মা-র বোন—ছুয়ের মধ্যে তফাত নেই। মাসীও যা মাও তাই। এখন 'গ' বলে ওই পুরো দলটি—সন্তানদের যারা মা—তাদের বিয়ে হয়েছে 'ক' বলে পুরো দলটির সঙ্গে। তাহলে মেসো—অর্থাৎ, মার বোনদের স্বামী বলতে কারা? 'ক' দলের সকলে। আর এই দলের সবাই আবার বাবা, জেঠা, খুড়ো—একই কথা। তাহলে, মেসোকে বোঝাবার জন্যে নতুন কোনো শব্দ নেই; কেননা মেসোও যা আর বাবা বা জেঠা-খুড়োও তাই।

শ্রেণীগত সম্পর্ক বোঝাবার জন্যে আমরা যে-ছক এঁকেছি সেটি আবার পরীক্ষা করা যাক।

'ক' আর 'খ' কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ, 'গ' আর 'ঘ'-ও তেমনি সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ। তার মানে কী?

যে শব্দ দিয়ে "বাবা, বাবার-ভাই, মেসো" বোঝানো হচ্ছে সে শব্দ দিয়ে "পিসে, মামা, শ্বশুর" বোঝানো হবে না। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে যে পিসে, মামা আর শ্বশুর—এই তিনটি সম্পর্ক বোঝবার জন্যে আলাদা আলাদা শব্দ নেই। একই শব্দ দিয়ে তিনরকম সম্পর্ক বোঝানো হচ্ছে। তার মানে, তিন রকম সম্পর্কই অতীতে এক ছিলো। কী করে তা সম্ভব হতে পারে?

অপর পক্ষে, যে শব্দ দিয়ে "মা, মাসী, জেঠী" বোঝানো হচ্ছে সেই শব্দ দিয়ে "মামী, পিসী আর শাশুড়ী" বোঝানো হবে না। কিন্তু "মামী, পিসী আর শাশুড়ী"—এই তিনরকম সম্পর্ক বোঝবার জন্যে একটিমাত্র শব্দ। তার মানে, অতীতে এই তিনরকম সম্পর্কই এক ছিলো।

বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

'ক' আর 'খ' দুটি শব্দ দিয়েই একদল করে মানুষ বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু এ-দল আর ও-দল সম্পূর্ণ আলাদা—কেননা, দুটি শব্দ সম্পূর্ণ আলাদা।

তেমনিই 'গ' আর 'ঘ' দুটি শব্দ দিয়ে এক-দল করে মেয়ে বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু এ-দল আর ও-দল সম্পূর্ণ আলাদা—কেননা, দুটি শব্দ সম্পূর্ণ আলাদা।

এবার ভেবে দেখা যাক, এই চারটি দলের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক থাকলে আমাদের ছকটিকে ব্যাখ্যা করা যায়।

'ক' আর 'ঘ' ভাই-বোন। 'খ' আর 'গ' ভাই-বোন। তাহলে এক দিকে, 'ক' আর 'ঘ' আরো বড়ো একটি দলের অন্তর্গত; তার নাম দেওয়া যাক ১। আবার 'খ' আর 'গ' আর-একটি দলের অন্তর্গত; তার নাম দেওয়া যাক ২। তাহলে

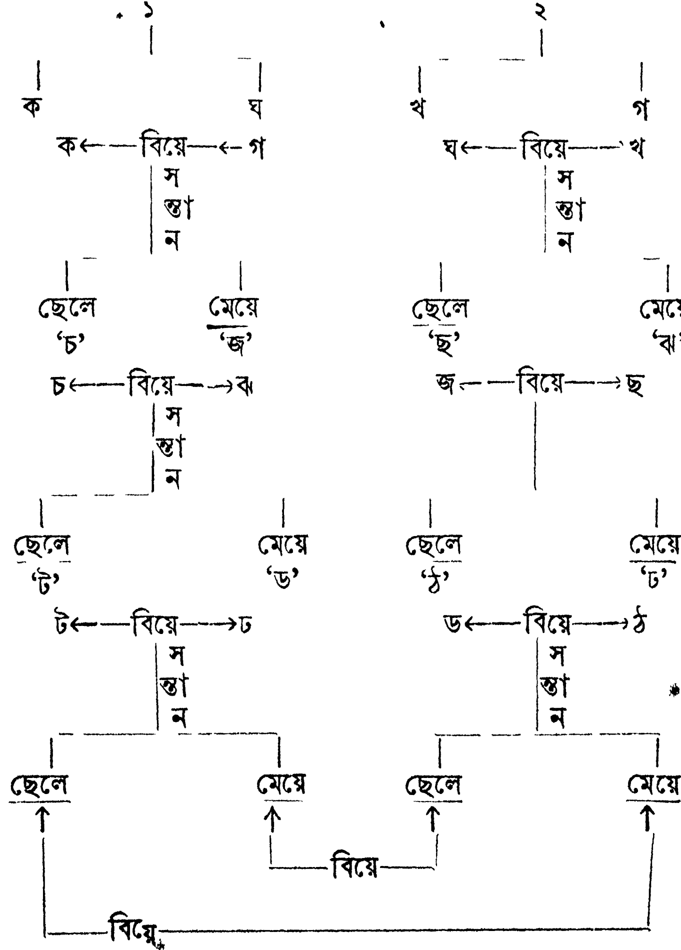


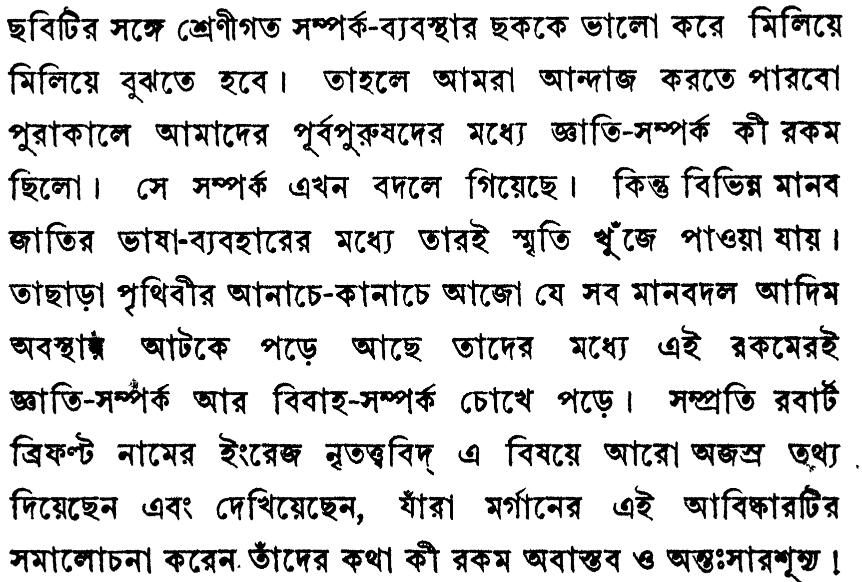
'ক' দলের সঙ্গে 'গ' দলের যদি বিয়ে হয় আর 'ঘ' দলের সঙ্গে যদি 'খ' দলের বিয়ে হয় তাহলে কি ওই সম্পর্কগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে? যাবে; কিন্তু বিষয়টা জটিল। ধীরে ধীরে ভাবতে হবে।

১ নং দল। তার মধ্যে সমস্ত সমবয়সী পুরুষেরা পরস্পরের ভাই। সমস্ত সমবয়সী মেয়েরা পরস্পরের বোন। ভাইদের বলছি

'ক'। বোনদের বলছি 'ঘ'। 'ক' আর 'ঘ' হলো পরস্পরের ভাই-বোন। তেমনি ২ নং দলের বেলাতেও একই কথা।

১ নং আর ২ নং দল হলো দুটি ক্লান। ক্লানের মধ্যে কেউ কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তাই 'ক'-দলের সঙ্গে 'ঘ'-দলের, বা, 'খ'-দলের সঙ্গে 'গ'-দলের বিয়ে হবে না। তার বদলে, এ-ক্লানের সমস্ত সমবয়সী পুরুষদের সঙ্গে ও-ক্লানের সমস্ত সমবয়সী মেয়েদের বিয়ে হবে—একজনের সঙ্গে আর একজনের বিয়ে নয়, দলের সঙ্গে দলের বিয়ে।





এইবার সবগুলো সম্পর্ক একসঙ্গে আঁকবার চেষ্টা করা যাক, তাহলে শ্রেণীগত সম্পর্ক-ব্যবস্থার পুরো ছকটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

ছবিটির সঙ্গে শ্রেণীগত সম্পর্ক-ব্যবস্থার ছককে ভালো করে মিলিয়ে মিলিয়ে বুঝতে হবে। তাহলে আমরা আন্দাজ করতে পারবো পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে জ্ঞাতি-সম্পর্ক কী রকম ছিলো। সে সম্পর্ক এখন বদলে গিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন মানব জাতির ভাষা-ব্যবহারের মধ্যে তারই স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আজো যে সব মানবদল আদিম অবস্থায় আটকে পড়ে আছে তাদের মধ্যে এই রকমেরই জ্ঞাতি-সম্পর্ক আর বিবাহ-সম্পর্ক চোখে পড়ে। সম্প্রতি রবার্ট ব্রিফল্ট নামের ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ্ এ বিষয়ে আরো অজস্র তথ্য দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন, যাঁরা মর্গানের এই আবিষ্কারটির সমালোচনা করেন তাঁদের কথা কী রকম অবাস্তব ও অন্তঃসারশূন্য।

মাতৃপ্রধান আর পিতৃপ্রধান সমাজ

মর্গান দেখলেন, প্রাচীন মানুষদের সমাজ আধুনিক সমাজের মতো পুরুষপ্রধান বা পিতৃপ্রধান নয়। তার বদলে, নারীপ্রধান বা মাতৃপ্রধান সমাজ। এর থেকে মর্গান অনুমান করলেন, আধুনিক যুগের সভ্য মানুষদের পূর্বপুরুষেরাও এককালে ওই রকম মাতৃপ্রধান সমাজেই জীবন-যাপন করেছিল। মর্গানের এই আবিষ্কারটির বিরুদ্ধেও আধুনিক যুগের অনেক পণ্ডিত নানা রকম আপত্তি তুলেছেন কিন্তু রবার্ট ব্রিফল্ট প্রভৃতি আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা দেখিয়েছেন, এ বিষয়েও মর্গানের আবিষ্কার কতো অবধারিত সত্য। তবে, মর্গানের পর মাতৃপ্রধান-সমাজ-সংক্রান্ত আরো অনেক তথ্য সংগ্রহ হয়েছে এবং তারই দরুন মর্গানের সিদ্ধান্তকে প্রয়োজনমতো শুধরে নেবার দরকার হয়েছে।

প্রথম প্রশ্ন হলো, মানবসমাজ মাতৃপ্রধান হবে না পিতৃপ্রধান হবে তা নির্ভর করছে কিসের উপর? উৎপাদন পদ্ধতির—বাঁচবার উপকরণ সংগ্রহ করবার পদ্ধতির—উপর।

শিকার করতে শেখবার আগে পর্যন্ত মানুষের দলের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি বলে কিছু ছিলো না: সকলে মিলেই একসঙ্গে বীজ, ফল আর ছোটো ছোটো জানোয়ার জোগাড় করবার জন্যে ঘুরতো। কিন্তু বল্লম তৈরি করতে শেখবার পর থেকে অন্যরকম: বল্লম হাতে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানোটা হলো পুরুষদের কাজ। মেয়েরা এই কাজে পুরুষদের সঙ্গে সমানে-সমান হয়ে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতে পারতো না। তার কারণ, মেয়েদের উপর অন্য একটা দায়িত্ব ছিলো, সে-দায়িত্ব পালন করতে গেলে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানো চলে না। কিসের দায়িত্ব? শিশুপালন। কচিকচি দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নিয়ে মেয়েরা কী করে বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াবে?

তাহলে, বল্লম আবিষ্কারের পর থেকেই মানুষের দলের মধ্যে একরকম কাজের ভাগাভাগি দেখা গেলো : দলের পুরুষেরা বনে-জঙ্গলে বর্শা-বল্লম হাতে শিকার করে বেড়াবে আর দলের মেয়েরা আগের মতোই বস্তির আশপাশে ফলমূল আহরণের চেষ্টা করবে।

এইভাবে ফলমূল আহরণের চেষ্টা থেকেই শেষ পর্যন্ত মেয়েরা কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিলো। ঠিক কী ভাবে তারা কৃষিকাজ আবিষ্কার করলো সে-কথা অবশ্য আজকের দিনে আমাদের পক্ষে জোর করে বলবার উপায় নেই। পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন, বুনো ফল, বীজ প্রভৃতি আহরণ করতে-করতে মেয়েরা ক্রমশই দেখতে পেলো যে কোথাও কোথাও জমির উপর বীজ পড়লে বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গম হয়, অঙ্কুর থেকে গাছ হয়। এই জ্ঞানটিই হয়তো কৃষি আবিষ্কারের প্রথম ধাপ ছিলো।

মেয়েদের আবিষ্কার আর পুরুষদের আবিষ্কার সংক্রান্ত কথাগুলো খুবই জরুরী। সে-সব কথা স্পষ্টভাবে না বুঝলে পুরোনো পৃথিবীর অনেক রহস্যই আমরা জানতে পারবো না। তাই এখানে কথাগুলো আরো একটু খুলে বলবার চেষ্টা করা ভালো।

কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার। আর সেই শুরুর যুগে চাষবাস ছিলো নেহাতই মেয়েলি ব্যাপার—শুধুমাত্র মেয়েরাই চাষবাস করতো, চাষবাসের সঙ্গে পুরুষদের সম্পর্ক ছিলো না। অর্থাৎ, দলের পুরুষেরা বনেজঙ্গলে শিকার করে বেড়াতো আর দলের মেয়েরা বস্তির আশপাশে মাটি খুঁড়ে ফসল ফলাবার চেষ্টা করতো।

কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে তারপর থেকে চিরকালই চাষবাসটা নিছক মেয়েলি কাজ, নিছক মেয়েলি ব্যাপার হয়ে রইলো। আসলে এই কৃষিকাজেরও একটা ইতিহাস আছে; চাষবাস বরাবরই একরকমের নয়। প্রথম দিকে ধারালো পাথরের নিড়েনি দিয়ে বস্তির আশপাশের ছোটোখাটো জমি কুপিয়ে

ছোটোছোটো খেত রচনা করা হতো। এ-অবস্থার চাষবাসকে ইংরেজীতে বলে গার্ডেন টিলেজ—বাঙলা করে আমরা বলতে পারি বাগান-খেত রচনার কাজ।

তখনো হাল-লাঙল আবিষ্কার হয় নি। তাই হালে বলদ জুতে বড়ো বড়ো খেতে চাষ করবার ব্যবস্থাও হয় নি। অর্থাৎ বলদ দিয়ে চাষ করবার ব্যবস্থাটা অনেক পরের ব্যাপার।

হালে লাঙল জুতে বড়ো বড়ো খেতে চাষ করবার অবস্থায় মানুষ যখন পৌঁছলো তখন কিন্তু আর চাষের কাজ মেয়েদের এক্তিয়ারে রইলো না; সে-কাজ মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে এলো। তাই, কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার হলেও বরাবরই মেয়েদের কাজ হয়ে থাকে নি। আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে এমনকি আজকের দিনেও এই পরিবর্তনটি চোখের উপরে ঘটতে দেখা যায়—দেখা যায়, সে-দেশের কোনো কোনো জায়গায় এতোদিন পরে মানুষ নিড়েনি দিয়ে ছোটো খেত কুপিয়ে চাষ করবার বদলে হালে বলদ জুতে বড়ো খেতে চাষ করবার ব্যবস্থা শিখছে। আর সেই সঙ্গে দেখা যায়, চাষের কাজ থেকে মেয়েরা হটে যাচ্ছে, চাষের কাজ প্রধানতই পুরুষদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খেতের কাজে বলদ,—বা অন্য কোনো গৃহপালিত পশু,—ব্যবহার হবার দরুন কৃষিকাজের দায়িত্বটা মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে চলে আসে কেন? এ-প্রশ্নের জবাবটা বুঝতে হলে পশুপালন আবিষ্কারের কথাটা আগে বোঝা দরকার।

পশুপালন শুরু হলো কী করে? শিকার থেকে। শিকার করতে বেরিয়ে নিরীহ ধরনের পশুর বাচ্চাগুলোকে মেরে না ফেলে ঘরে ধরে এনে পোষ মানাবার চেষ্টা থেকেই পশুপালন আবিষ্কার। কথা হলো, শিকারের দায়টা কাদের উপর ছিলো? পুরুষদের উপর, না, মেয়েদের উপর? আমরা আগেই দেখেছি, এ-দায়িত্ব

মেয়েদের ছিলো না; বল্লম আবিষ্কার হবার পর থেকে শিকারের দায়িত্বটা বরাবরই পুরুষদের।

শিকার থেকেই যদি পশুপালন শুরু হয়ে থাকে তাহলে শিকার করাটা যাদের কাজ ছিলো পশুপালনও তাদেরি কাজ হবে না কি? তাইই। আর তাই, পশুপালন সর্বত্রই হলো পুরুষদের কাজ। সেই জন্যেই, চাষের কাজেও যখন থেকে গৃহপালিত পশুর ব্যবহার শুরু হলো তখন থেকে চাষের কাজ আর মেয়েদের এক্তিয়ারে রইলো না। চাষের কাজও পুরুষালি ব্যাপার,--পুরুষদের কাজ,—হয়ে দাঁড়াতে লাগলো।

তাই, কৃষিকাজ যদিও মেয়েদের আবিষ্কার তবুও হালে লাঙল জুতে বড়ো খেতে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে শেখবার সময় থেকে চাষবাসের দায়িত্ব আবার সরে গেলো মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতেই।

ঠিক কেমন করে কৃষিকাজ আবিষ্কার হয়েছিলো তা অবশ্য আমাদের পক্ষে খুঁটিয়ে জানবার উপায় নেই। কিন্তু কৃষিকাজ যে মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিলো,—পুরুষেরা আবিষ্কার করে নি,—সে-কথা অনুমান করবার মতো নানারকম সূত্র আমরা ·পেয়েছি। কী রকম সূত্র?

এক রকম সূত্র হলো, উপকথা। উপকথা অবশ্য ইতিহাস নয়; তবে উপকথাকে ঠিকমতো বিচার করতে পারলে তার মধ্যে থেকেও কিছু কিছু সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীতে আজো যে-সব মানবদল পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে রয়েছে তাদের মধ্যে প্রচলিত উপকথাগুলিকে বিচার করতে পারলে ওই ইঙ্গিতটি খুঁজে পাওয়া যায় যে কৃষিকাজ মেয়েরাই আবিষ্কার করেছিলো। রবার্ট ব্রিফল্ট এ-রকম অনেক উপকথা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর বই থেকেই এখানে কয়েকটা নমুনা তোলা যাক।

চেরোকি বলে আমেরিকায় একদল আদিবাসী আছে। তাদের উপকথা অনুসারে বনের মধ্যে একটি মেয়েই প্রথম শস্য আবিষ্কার করেছিলো। মৃত্যুর সময় মেয়েটি নির্দেশ দিয়ে যায় যে তার মৃতদেহকে মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে—সে-দেহ যেখানে যেখানে মাটি স্পর্শ করলো সেখানে সেখানেই জন্মালো প্রভূত শস্য।

রবার্ট ব্রিফল্ট দেখাচ্ছেন, এই রকম উপকথা পৃথিবীর শুধু একটি দেশেই প্রচলিত নয়, নানান দেশের নানান আদিবাসীর মধ্যেই প্রচলিত।

আর-এক রকম সূত্র হলো, পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের বাস্তব অবস্থা। অনেক জায়গায় দেখা যায়, কৃষিকাজ এখনো প্রধানতই মেয়েদের কাজ হয়ে রয়েছে—পুরুষেরা সে-কাজে অংশ গ্রহণ করে না। কোথাও বা আবার দেখা যায়, কৃষিকাজ সবেমাত্র মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে আসতে শুরু করেছে।

আর-এক রকম সূত্র হলো, আমাদের দেশে যাকে বলা হয় ব্রত। মনে রাখতে হবে, ব্রত শুধু আমাদের দেশেই নয়, আরো নানান দেশে প্রচলিত আছে। এই ব্রতগুলি খুবই আদিম যুগের ব্যাপার। নানান রকম ব্রত আছে; কিন্তু তার মধ্যে অনেক ব্রতই শস্যের কামনায় করা। আদিম যুগে কৃষিকাজের একটা প্রধান অঙ্গই হলো শস্যের কামনায় করা এই-জাতীয় ব্রত। কিন্তু মজা এই যে আজো আমরা দেখতে পাই শস্যের কামনায় করা এই সব ব্রতগুলি একান্তভাবেই মেয়েলি ব্রত, মেয়েদের ব্যাপার। তার থেকেই বোঝা যায় যে কৃষি এককালে শুধুমাত্র মেয়েদেরই কাজ ছিলো।

কৃষিকাজ যে মেয়েদেরই আবিষ্কার, আর শুরুর দিকে কৃষি যে শুধুমাত্র মেয়েদেরই কাজ ছিলো,—এ বিষয়ে আজকালকার

পণ্ডিতেরা আরো নানান রকম প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। সবগুলি এখানে তোলা যাবে না। মোটের উপর শুধু এটুকুই বলা যায় যে এ বিষয়ে আজকালকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু এ-কথার তাৎপর্য যে কী, তা অনেকেই ভেবে দেখেন না। আমরা আগেই দেখেছি, মানুষের ইতিহাসে এই কৃষিকাজ হলো বিরাট বিস্ময়কর এক আবিষ্কার। এই আবিষ্কারটির দরুনই মানুষ সভ্যতার পথে যেন হঠাৎ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে শুরু করলো।

তাহলে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করবার ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো অবদানটি কাদের? পুরুষদের, না, মেয়েদের? কৃষিকাজ যদি মেয়েদের আবিষ্কার হয় তাহলে নিশ্চয়ই মানতে হবে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনেও সবচেয়ে বড়ো অবদানটি পুরুষদের নয়, মেয়েদের। এ-কথা আজকের দিনে আমাদের পক্ষে ঠিকমতো বুঝতে পারা কঠিন। কেননা অনেক শতাব্দী ধরে আমরা এমনই এক সমাজে বাস করছি যেখানে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের অনেক ছোটো অনেক খাটো,—অনেক দুর্বল অনেক অসহায়,—বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই, সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন বলে এতো বড়ো একটা চূড়ান্ত গৌরব যে পুরুষদের নয়,—মেয়েদের—সে কথা স্বীকার করতে পারা বেশ একটু কঠিন হবার কথাই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসকে যদি ঠিকমতো বুঝতে হয় তাহলে নেহাতই একালের একটা ধারণাকে চিরকালের মতো সত্যি মনে করাও ঠিক নয়।

পুরুষ-প্রধান ও নারী-প্রধান সমাজ

এই কথাগুলি মনে রেখে এবার একটা নতুন প্রশ্ন তোলা যাক: সমাজে পুরুষেরা বড়ো, না, মেয়েরা বড়ো? আজকের দিনে আমরা যে-সমাজে বাস করছি সেখানে তো দেখি, পুরুষরাই বড়ো—পুরুষরাই প্রধান। কিন্তু চিরকালই কি এইরকম ছিলো নাকি?

তা নয়। অতীতের ইতিহাসে এ-নিয়ে অনেক রকম অদল-বদল হয়েছে। কী রকম অদল-বদল? প্রথমে সংক্ষেপে সেই কথাটুকু বলে নি, তারপর ব্যাখ্যা করা যাবে।

যতোদিন পর্যন্ত আদিম মানুষ শিকার করতেও শেখে নি ততোদিন পর্যন্ত দলের মধ্যে প্রধান বলতে মেয়েরাই, মা-রাই।

বল্লম আবিষ্কারের পর থেকে, বল্লম হাতে শিকার করতে শেখবার পর থেকে, পুরুষেরাই দলের মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ালো।

কৃষিকাজের প্রথম দিকটায় কিন্তু সম্পর্ক আবার বদলে গেলো: মেয়েরা প্রধান হলো, পুরুষেরা হলো অপ্রধান।

পশুপালনের যুগটায় পুরুষরাই প্রধান, আর কৃষিকাজের উন্নত অবস্থায়—অর্থাৎ কিনা হালে বলদ জুতে বড়ো খেতে চাষ দেবার সময় থেকে,—সমাজের প্রধান বলতে আবার পুরুষরাই।

বারবার এ-রকমের অদল-বদল হলো কেন? এবার তার ব্যাখ্যাটা দেখা যাক।

দলের মধ্যে পুরুষেরা বড়ো হবে, না, মেয়েরা বড়ো হবে—তা নির্ভর করেছে দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভার কাদের উপর। দলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে কী বোঝায়? দলের সবাইকার জন্যে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা, কেননা খেতে না পেলে মানুষ যে বাঁচবেই না।

এখন, শিকার করতে শেখবার আগে পর্যন্ত খাবারদাবার যোগাড় করার দিক থেকে দলের মধ্যে পুরুষ আর মেয়েদের ভিতর বিশেষ কোনো তফাত ছিলো না। সকলেই দল বেঁধে ফলমূল, মাছ, কাকড়া বা ছোটো জানোয়ার যোগাড় করবার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরতো। তাহলে, খাবারের যোগান দেওয়ার দিক থেকে এ-অবস্থায় দলের মধ্যে পুরুষ আর মেয়ে দুইই সমান। তবু মেয়েদের উপরে তা ছাড়াও একটা বাড়তি দায়িত্ব ছিলো।

কিসের দায়িত্ব? শিশুপালনের। এ-দায়িত্ব যে কতোখানি তা বুঝতে পারা যাবে জানোয়ারদের সঙ্গে মানুষের একটি প্রধান তফাতের কথা মনে রাখলে। জানোয়ারের সন্তানেরা চটপট সাবালক হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের সন্তানেরা সুদীর্ঘ সময় ধরে একেবারে অসহায় হয়ে থাকে। তাই, তাদের পালন করবার দায়িত্বটা মস্ত বড়ো। আর এই বাড়তি দায়িত্বের দরুনই সে-অবস্থার সমাজে মায়েরা প্রধান।

অবস্থাটার মোড় ঘুরলো শিকার শিখতে পারবার পর থেকে। কেননা, তখন থেকে দলের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি দেখা দিলো। শিকারের দায়িত্বটা পুরুষদের উপর, আর যতোদিন পর্যন্ত মানুষের কাছে ওই শিকার-করে-আনা জানোয়ারই প্রধান খাদ্য ততোদিন পর্যন্ত তাই দলের মধ্যে পুরুষরাই প্রধান।

পশুপালনও পুরুষদের কাজ। তাই, যে-সব মানবদল শিকার থেকে সোজা পশুপালনের দিকে এগুলো তাদের মধ্যে পুরুষরাই প্রধান হয়ে রইলো।

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষই শিকারের পর সরাসরি পশুপালনের দিকে এগোয় নি। কোনো কোনো দল এগিয়েছে চাষবাসের দিকে। যারা পশুপালনের বদলে চাষবাসের দিকে এগুলো তাদের বেলায় কী হলো? পুরুষ-প্রধান সমাজের বদলে স্বভাবতই নারী-প্রধান সমাজ। কেননা, চাষবাস মেয়েদের আবিষ্কার, শুরুতে শুধু মেয়েদেরই কাজ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ হলো নেহাতই চাষবাস শেখবার প্রথম দিককার অবস্থার কথা। কেননা, শুধুমাত্র প্রথম দিককার অবস্থাতেই চাষবাস একান্তভাবে মেয়েদের কাজ ছিলো। বলদ-জোতা হাল-লাঙলের চলন হবার পর থেকে কৃষির দায়িত্ব মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে এলো, আর তাই

সমাজের গড়ন আবার বদলালো—মেয়েদের বদলে পুরুষরাই হলো প্রধান।

এইখানে একটা কথা আবার বলে নি। পৃথিবীতে সব মানুষেরই উন্নতি একসঙ্গে সমান-তালে হয় নি। তাই, এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের পাশাপাশিই পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই এগিয়ে-যাওয়া মানুষদের অতীতটাকে জানবার ব্যাপারে পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের সম্বন্ধে জ্ঞানটা খুব কাজে লাগে। কেননা, যারা আজ এগিয়ে গিয়েছে তারও এককালে ওই অনুন্নত দশাই পার হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলো—যে-দশায় আজকের দিনেও পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষেরা আটকে রয়েছে। পিছিয়ে-পড়া অবস্থা বলতে অবশ্য সব ক্ষেত্রেই এক রকমের নয়। মানুষ যেন এগিয়েছে ধাপেধাপে—তাই পিছিয়ে-ফেলে-আসা অবস্থারও নানান স্তর আছে, নানান ধাপ আছে; পিছিয়ে-পড়ে-থাকা নানান মানবদল এই সব নানান ধাপের এক-একটিতে আটকে পড়ে আছে।

যদি তাই হয়, তাহলে চাষবাসের শুরুর দিককার সেই মা-বড়ো সমাজের অবস্থাটা যে কী রকম ছিলো তা ভালো করে জানবার একটা উপায় হলো, আজকের দিনেও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব মানবদল নানা রকম পিছনে-ফেলে-আসা ধাপের মধ্যে ঠিক ওই ধাপটিতে আটকে পড়ে আছে তাদের খোঁজ করা, তাদের অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা—কেননা, এইভাবে চাষ-বাসের শুরুর দিককার অবস্থায় আটকে-পড়ে-থাকা মানুষদের কথা জানলে আজকের দিনে সভ্য মানুষদের পূর্বপুরুষরা এককালে ওই অবস্থায় কী ভাবে জীবন-যাপন করতো তা ঠাহর করা যেতে পারে।

কিন্তু এ-ব্যাপারে একটা হাঙ্গামা আছে। হাঙ্গামাটা হলো, কোনো মানবদলের পক্ষেই ঠিক ওই অবস্থায় আটকে পড়ে থাকবার

সম্ভাবনা বেশি হতে পারে না। তার মানে, শিকার শেখবার স্তরে আটকে পড়ে থাকবার সম্ভাবনা বা পশুপালনের স্তরে আটকে পড়ে থাকবার সম্ভাবনা তুলনায় অনেক বেশি ; কৃষি আবিষ্কারের প্রথম দিককার স্তরে আটকা পড়ে থাকবার সম্ভাবনা তুলনায় অনেক কম।

কম কেন ? কেননা, আমরা আগেই দেখছি, এই যে কৃষিকাজ—এর মতো অপরূপ আর আশ্চর্য আবিষ্কার মানুষের ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে : চাষবাস আবিষ্কার করতে পেরেছিলো বলেই মানুষের পক্ষে অসামান্য তাড়াতাড়ি একের পর এক নতুন নতুন আবিষ্কার করা সম্ভব হলো আর তারই ভিত্তিতে মানুষ সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলতে পারলো। তাই, কৃষিকাজ আবিষ্কারের অবস্থাটা থেমে থাকবার, আটকে পড়ে যাবার, অবস্থা নয়। ঠিক তার উলটোটাই—যেন হুড়হুড় করে সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলবার জন্যে দ্বার খুলে যাবার অবস্থাই।

শিকারের উপর নির্ভর করে বাঁচবার যুগটায় সে-রকম নয় ; পশুপালন করে বাঁচবার যুগটায়ও সে-রকম নয়। কেননা, ওই অবস্থাগুলিতে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা তেমন বেশি নয়।

আর ঠিক এই কারণেই শিকারের পর্যায়ে আর পশু-পালনের পর্যায়ে পৃথিবীর নানান মানবদল অনেক যুগ ধরে আটকে পড়ে থেকেছে ; কিন্তু চাষবাসের প্রথম অবস্থার মানবদলের পরিচয় বেশির ভাগই চাপা পড়ে গিয়েছে তার উপর গড়ে-ওঠা সভ্যতাগুলির তলায়। এ-অবস্থায় আটকা-পড়ে-থাকা মানুষদের চোখে দেখতে পাবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু পুরোনো সভ্যতার মধ্যে এমন অনেক চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় যা থেকে সভ্যতার ইমারতগুলির তলায় চাপা-পড়ে-যাওয়া অনেক কথাই আন্দাজ করা সম্ভব।

কিন্তু ওই অবস্থায় আটকে-পড়ে-থাকা মানুষদের পরিচয় কম হলেও একেবারেই যে নেই তা নয়। আমাদের দেশেরই এক প্রান্তে মোটামুটি এ-অবস্থায় আটকে-থাকা মানুষদের নমুনা রয়েছে।

কামাখ্যার মেয়েরা জাদু জানে?

আমরা ছোটো বেলা থেকেই শুনেছি, কামরূপ-কামাখ্যার দিকে মেয়েরা জাদু জানতো। তারা নাকি পুরুষদের ভেড়া করে দিতো। এ-সব কথা সত্যি নাকি? সত্যি বইকি। কিন্তু সত্যি মানে? পুরুষদের ভেড়া করে দেওয়া মানে? সত্যিই কি মেয়েদের জাদুমন্ত্রের জোরে পুরুষদের লোম গজাতো? তা নয়। তবুও ভেড়া করে রাখবার কথাটা মিথ্যে নয়। আসলে, এ-হলো মা-বড়ো বা নারী-প্রধান সমাজের একটা চলতি বর্ণনা—যে-অবস্থায় মেয়েরা বড়ো আর পুরুষেরা অধীন সে-অবস্থাকে বোঝাবার জন্যে দেশের লোক ওই রকম ভেড়া-করে-রাখবার প্রবাদ রচনা করেছিলো।

এই মা-বড়ো বা নারী-প্রধান সমাজের কথা শুনতে আমাদের আজকাল হয়তো অদ্ভুত লাগে। তার কারণ, আমরা একেবারে অন্যরকম সমাজে জীবনধারণ করি। কিন্তু তবুও আমাদের পক্ষে আজো ওই রকম মা-বড়ো সমাজ স্বচক্ষে দেখে আসা সম্ভব। কোথায়? কামাখ্যার অঞ্চল পেরিয়ে উত্তর-পুব মুখে আরো খানিকদূর এগিয়ে যেতে হবে। সেখানে গারো পাহাড় আর সেখানের খাসিয়াদের মধ্যেই আজো মা-বড়ো সমাজের রূপটা অনেকাংশেই টিকে আছে।

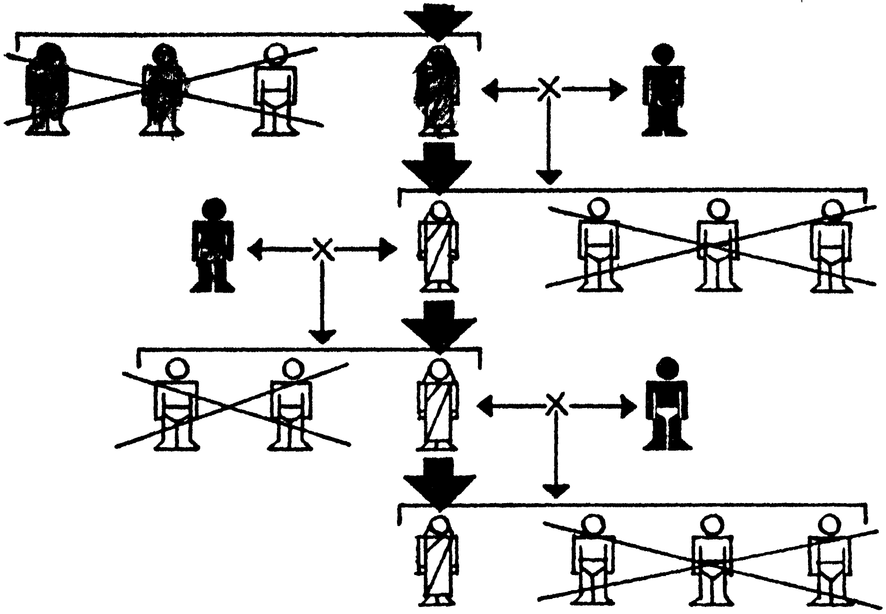
খাসিয়াদের সমাজের কথা কিছুটা বলবো। কিন্তু তার আগে আর-একটা কথা মনে রাখা দরকার: খাসিয়াদের কাছে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন বলতে চাষের কাজ। কিন্তু ও

অঞ্চলের বেশির ভাগ জায়গাতেই এখনো হাল-বলদের চল হয় নি। অর্থাৎ কিনা, ওরা এখনো মোটের উপর চাষবাসের প্রথম দিককার অবস্থাতেই আটকে রয়েছে। কেন আটকে রয়েছে—এর বেশি কেন এগুতে পারে নি—সে-কথা অবশ্য আলাদা। এখানে আমাদের পক্ষে সে-প্রশ্নের আলোচনা তোলা সম্ভব হবে না। তার বদলে আমরা ওই খাসিয়াদের দৃষ্টান্ত থেকে বিশেষ করে যে কথাটি বোঝবার চেষ্টা করবো তা হলো এই যে, কৃষিকাজের ওই রকম একটা শুরুর দিকের পর্যায়ে আটকে থেকেছে বলেই ওদের মধ্যে থেকে মা-বড়ো বা নারী-প্রধান সমাজের রূপটি আজো লুপ্ত হয় নি।

আমাদের আজকালকার সমাজের সঙ্গে খাসিয়াদের সমাজের তফাতগুলো ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের বেলায় পরিবারের মধ্যে প্রধান বলতে কে? বাবা বা ঠাকুরদা বা ওই রকমের কেউ—যিনি কিনা একজন পুরুষমানুষ, কর্তামশাই। পরিবারের সকলেই তাঁর আদেশ মেনে চলেন—তাঁর আদেশ মেনে চলতে সকলেই বাধ্য। কিন্তু খাসিয়াদের বেলায় উলটো রকম। পরিবারের প্রধান বলতে মা—মার আদেশটাই সকলের কাছে চূড়ান্ত। এক কথায়, কর্তৃত্বটা পুরুষদের নয়, মেয়েদের।

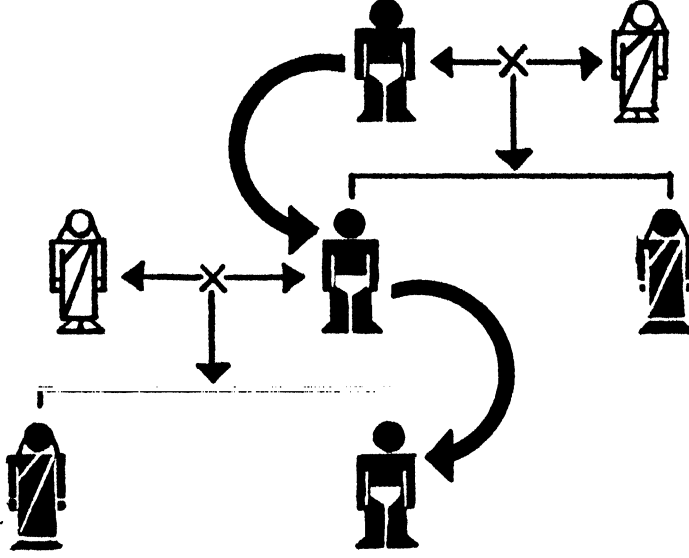
শুধু তাই নয়; কোনো কোনো এলাকায় এমনকি দেখা যায় যে, সম্পত্তি বলতে যা-কিছু তার উপর পুরুষদের কোনো অধিকারই নেই—অধিকার শুধুমাত্র মেয়েদেরই। আমাদের সমাজে যে-রকম তার ঠিক উলটো নয় কি? আমাদের বেলায় বাপের সম্পত্তি ছেলেরা পায়, খাসিয়াদের বেলায় মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা পায়,—অর্থাৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকার চলে মায়ের সূত্রেই।

আমাদের বেলায় বাপের পরিচয়েই ছেলের পরিচয়, ছেলেরা বাপের গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়। মেয়েরাও বিয়ের পর স্বামীর গোষ্ঠীর



খাঁটি মাতৃপ্রধান-সমাজের উত্তরাধিকারসূত্র : মায়ের সম্পত্তি মেয়েরা পাচ্ছে, সম্পত্তিতে ছেলেদের—অতএব পুরুষদের—কোনো অধিকারই নেই।

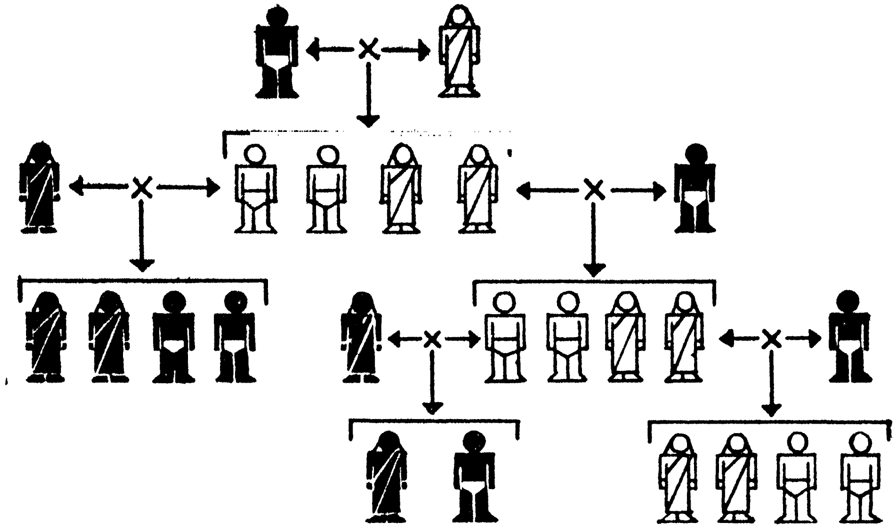
অন্তর্গত হয়। যেমন ঘোষ-বাড়ির ছেলের সঙ্গে বোস-বাড়ির মেয়ের বিয়ে হলো, বিয়ের পর বোস-বাড়ির মেয়ে আর বোস রইলো না। তারপর, তাদের যে-সব ছেলেপুলে হলো তারা ঘোষ হবে, না, বোস হবে ? নিশ্চয় ঘোষ হবে। অর্থাৎ, আমাদের সমাজে বাপের গোত্র হিসেবেই ছেলের গোত্র। খাসিয়াদের বেলায় কিন্তু ঠিক এর উলটো ; বাবার পরিচয়ে ছেলেমেয়েদের পরিচয় নয়, বাবার গোত্রের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের গোত্রের কোনো সম্পর্ক নেই—ছেলেমেয়েরা বাবার বংশের কেউ নয়। তাহলে তারা কোন গোষ্ঠীর মানুষ ? কার পরিচয়ে তাদের পরিচয় ? মায়ের। মা-র বংশ-পরিচয়েই বংশ-পরিচয়। মা-র দিকের আত্মীয়স্বজনেরাই তাদের সবচেয়ে নিকট জ্ঞাতিগোষ্ঠী। তাদের কাছে বাবা



খাঁটি পিতৃপ্রধান সমাজের উত্তরাধিকারসূত্র : বাবার সম্পত্তি ছেলেরা পাচ্ছে—সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো অধিকার নেই।

অনেকটাই যেন বাইরের মানুষ, বাবার আত্মীয়স্বজনেরা তাদের কাছে প্রায় অনাত্মীয় মানুষদের মতোই।

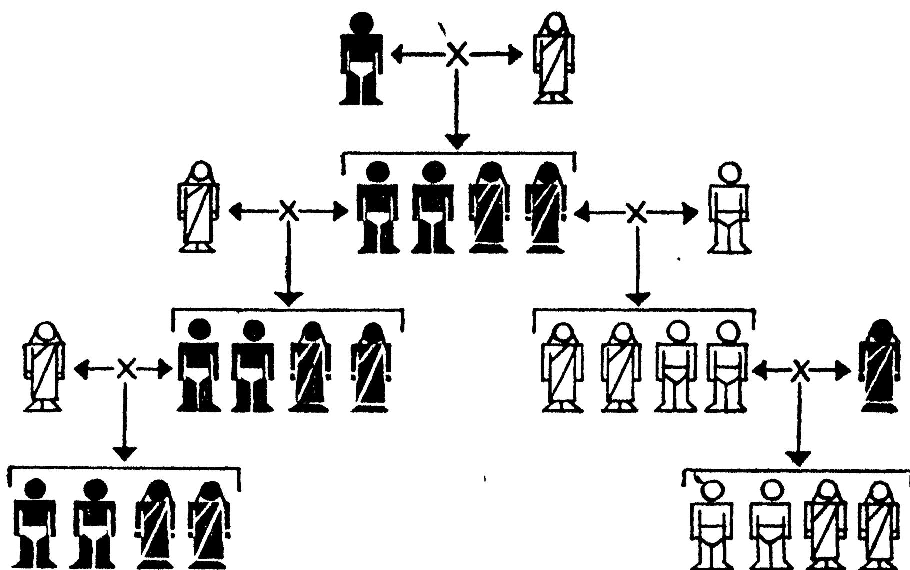
অবস্থাটা কী রকম তা একবার ভেবে দেখা যাক। ছেলেমেয়েরা তাদের মা-র বংশের মানুষ; কিন্তু তাদের বাবা কোন বংশের মানুষ? বাবার মা, অর্থাৎ ঠাকুরমার বংশের মানুষ। তার মানে কিন্তু ঠাকুরদার বংশের মানুষ নয়; কেননা ঠাকুরদার বংশটা আবার অন্য—ঠাকুরদার-মা-র বংশ। আমাদের কাছে ব্যাপারটা কী রকম গোলমেলে লাগবে তা দেখাবার জন্যে আমরা মাতৃপ্রধান সমাজের বংশ-পরিচয়ের একটা নকশা পরের পাতায় এঁকে দিয়েছি। পিতৃপ্রধান আধুনিক সমাজের বংশ-পরিচয়ের আর-একটা নকশাও দেওয়া হলো। দুটোকে মিলিয়ে দেখলে তফাতটা যে কতোখানি আকাশপাতাল তা বোঝবার সুবিধে হবে।



মাতৃপ্রধান সমাজের বংশ-পরিচয়ের নকশা। সন্তানেরা তাদেব মার বংশের অন্তর্গত হচ্ছে—এই বিষয়টি বোঝাবার জন্যে যেখানে মা-কে কালো করে আঁকা হয়েছে সেখানে সন্তানদেরও কালো করা হয়েছে; যেখানে মা-কে সাদা করে আঁকা হয়েছে সেখানে সন্তানদেবও সাদা ভাবেই দেখানো হয়েছে।

একটা কথা। বংশপরিচয়ের এই নকশায় আদি-অকৃত্রিম মাতৃপ্রধান সমাজের ব্যবস্থাটাই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু খাসিয়াদের মধ্যে বংশপরিচয় ব্যবস্থাটা হুবহু এই রকমের ছাঁচে ঢালা নয়। সামান্য কিছু কিছু রদবদল হয়েছে। তার মানে, খাসিয়াদের মধ্যে মোটের উপর মাতৃপ্রধান সমাজের কাঠামোটা টিকে থাকলেও আজকের দিনে তাতে কিছু কিছু ভাঙন ধরতে দেখা যায়। একটু পরেই এই ভাঙনের চিহ্নগুলির কথা তুলবো। তার আগে দেখা যাক, মাতৃপ্রধান সমাজের আরো কতোরকম পরিচয় খাসিয়াদের মধ্যে আজো টিকে আছে।

মায়ের সূত্রে মানুষের বংশ-পরিচয়, বাবার সূত্রে নয়। আর এই জন্যেই আমরা যে-রকম বংশের আদিপুরুষের কথা বলি



পিতৃ-প্রধান সমাজের বংশ-পরিচয়। সন্তানেরা বাবার বংশ পাচ্ছে—এই বিষয়টি দেখাবার জন্যে ছবিতে বাবার রঙ অনুসারেই সন্তানদের রঙ দেওয়া হয়েছে।

খাসিয়ারা তেমনি বংশের আদি-মাতা বা আদি-নারীর কথা বলে। ওদের মধ্যে প্রবাদ আছে, মেয়েদের থেকেই মানব-গোষ্ঠীর উৎপত্তি।

মানুষ মারা যাবার পর তাকে কবর দেবার যে-ব্যবস্থা তার মধ্যেও এই মাতৃপ্রাধান্যের পরিচয়টা স্পষ্ট। ধরা যাক, 'ক'-বলে এক খাসিয়া-বুড়ো মারা গেলো। কোন্ কবর-খানায় তাকে গোর দেওয়া হবে? যেখানে তার বাবাকে গোর দেওয়া হয়েছিলো? তা নয়। তার বদলে যেখানে তার মা-কে গোর দেওয়া হয়েছিলো সেখানেই তাকেও কবর দেওয়া হবে। কেননা, 'ক'-বুড়ো তো আর তার বাবার বংশের লোক নয়, মায়ের বংশের লোক। তাই, মা-মাসী-দিদিমা-মামা-বোন-ভাগ্নেদের কবরখানাটাই তারও কবর-খানা। তেমনিই আবার, তার বাবা-জেঠা-খুড়ো-পিসী সবাই হলো

'ক'-বুড়োর ঠাকুরমার বংশের লোক। সেটা আলাদা বংশ বলেই ওদের সবাইকার জন্মে আলাদা একটা কবরখানা।

তাহলে, 'ক'-বুড়োর ছেলে মরলে তাকে কোন কবরখানায় দেওয়া হবে? যেখানে 'ক'-বুড়োকে কবর দেওয়া হয়েছে? না, তা নয়। যেখানে 'ক'-বুড়োর বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছে? তাও নয়। তাহলে? যেখানে, 'ক'-বুড়োর বৌ-কে কবর দেওয়া হয়েছে সেইখানে। সেটা আলাদা কবরখানা। কেননা, 'ক'-বুড়োর-বৌ—'ক'-বুড়ি—হলো আলাদা বংশের মানুষ, আর ওই 'ক'-বুড়ির ছেলেমেয়েরাও হলো 'ক'-বুড়ির বংশেরই মানুষ।

আরো একটা কথা আছে। একই কবরখানায় এক-বংশের পুরুষ আর মেয়েদের কবর দেবার ব্যবস্থা হলেও মেয়েদের কবরগুলো সামনের দিকে, পুরুষদের কবরগুলো পিছনের দিকে। এমন কেন? কেননা পুরুষেরা তো আর বড়ো নয়। মেয়েরাই বড়ো। মেয়েরাই প্রধান। মরবার আগে যে-রকম, মরবার পরেও সেই রকম: পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সম্মান ঢের বেশি।

খাসিয়াদের মধ্যে দেবদেবী নিয়ে যে-সব কল্পনা তার বেলাতেও একই কথা। অর্থাৎ কিনা, দেবীরাই দলে বেশি আর মর্যাদার দিক থেকেও দেবতাদের চেয়ে অনেক বড়ো। একটুখানি ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এমনটা না-হয়েও উপায় নেই। খাসিয়াদের ধর্মে দেবদেবী নিয়ে যে-কল্পনা তা তো খাসিয়াদের মাথা থেকেই বেরিয়েছে—এমন তো আর নয় যে ভিন্ন দেশের ভিন্ন রকম সমাজের লোকেরা গিয়ে খাসিয়াদের মনে কয়েকটি দেবদেবীর কল্পনা গেঁথে দিয়ে এসেছে। এখন, কথা হলো, খাসিয়াদের নিজস্ব কল্পনা কিসের উপর নির্ভর করবে? খাসিয়াদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর। অভিজ্ঞতায় যার পরিচয় পাওয়া যায় নি, তা নিয়ে কল্পনাও করা যায় না।

এ-কথা অবশ্য ঠিক যে কল্পনা করবার সময় মানুষ অভিজ্ঞতায় যা জেনেছে তাকে নানান ভাবে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ভাবতে থাকে। কিন্তু তাহলেও তার ভাবনার কাঠামোটা বাঁধা থাকে তার অভিজ্ঞতা দিয়েই। আমরা ঘোড়া দেখেছি, পাখি দেখেছি; দুই অভিজ্ঞতা মিলিয়ে পক্ষীরাজের কথা কল্পনা করতে পারি। যে-লোক ঘোড়াও দেখে নি পাখিও দেখে নি তার পক্ষে পক্ষীরাজের কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আমরা সোনা দেখেছি, পাহাড় দেখেছি; আমরা তাই সোনার পাহাড়ের কথা কল্পনা করতে পারি। যে-লোক সোনাও দেখে নি পাহাড়ও দেখে নি সে কখনো সোনার পাহাড়ের কথা কল্পনাও করতে পারবে না।

খাসিয়ারা দেবদেবীর যে-সমাজটার কথা কল্পনা করেছে তারও মালমশলা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা। কিসের অভিজ্ঞতা? সমাজের অভিজ্ঞতা। সে-সমাজ কেমন ধরনের? মাতৃপ্রধান বা নারীপ্রধান সমাজ। খাসিয়াদের কল্পনায় এই অভিজ্ঞতা তাই যে দেবলোকের সৃষ্টি করলো সেখানেও পুরুষেরা ছোটো, মেয়েরা বড়ো—দেবতারা ছোটো, দেবীরা বড়ো।

দেবদেবীর কথাটা জরুরী, কেননা এই দেবদেবীর কল্পনার মধ্যে অনেক সময় অতীত ইতিহাসের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। তাই কোথাও যদি দেখা যায় দেবলোকের কল্পনায় দেবীরা খুব গৌরবের আসন দখল করে রয়েছে তাহলে আন্দাজ করতে হবে যে এককালে সেখানে মাতৃপ্রধান সমাজই ছিলো, সেই মাতৃপ্রধান সমাজ থেকেই জন্ম হয়েছিলো ওই দেবীদের কল্পনা। পরে হয়তো সমাজ বদলেছে, কিন্তু দেব-দেবীদের কল্পনা ঠিক সেই তালে বদলায় নি। আসলে, দেবদেবীদের কল্পনা বদলাতে অনেক বেশি সময় লাগে।

খাসিয়াদের কথায় আবার ফেরা যাক। শুধুই যে তাদের ধর্মে দেবীদের প্রাধান্য তাই নয়। ও-অঞ্চলের অনেক জায়গায় আজো



মোহেনজোদারোর মাতৃমূর্তি বা দেবীমূর্তি। মোহেনজোদারো আবিষ্কার হবার পর সেখানে এরকম পোড়ামাটির নারীমূর্তি অনেক পাওয়া গিয়েছে আর তা থেকেই অনুমান করা হয়েছে যে সেখানের মানুষদের কল্পনাতেও দেবীরাই প্রধানা ছিলো। তাহলে কি মোহেনজোদারোতেও একটি মাতৃ-প্রধান সমাজেরই ইতিহাস মাটিতে ঢাকা পড়ে আছে ?

দেখা যায় এলাকার শাসনক্ষমতাটাও পুরুষদের হাতে নয়। মেয়েদের হাতে। তার মানে, সে-সব অঞ্চলের শাসক বলতে রাজা নয়, রানী। রাজা যেন রানীর পাশে গোলামটির মতো—আবার, রানীর মেয়েই রানী হবে ; রাজপুত্র রাজ্য পাবে না।

এও হলো মাতৃপ্রধান সমাজের আর-একটি লক্ষণ। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, খাসিয়াদের মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজের কাঠামোটা অনেক অংশে টিকে থাকলেও ও-অঞ্চলের সর্বত্রই যে তা পুরোপুরি বা অক্ষুণ্ণ ভাবে টিকে রয়েছে, এমন কথা মনে করা ভুল হবে। খাসিয়াদের মধ্যে কোথাও কোথাও মাতৃপ্রধান সমাজের চিহ্ন অনেক বেশি স্পষ্ট ; কোথাও কোথাও সে-সমাজে ভাঙন ধরার কিছু কিছু লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তাই, ওদের দেশের কোনো

অঞ্চলে যদিও আজ পুরোপুরি রানীর শাসনই দেখতে পাওয়া যায় তবুও সব-অঞ্চলেই হুবহু তা নয়। আজকের দিনে কোথাও কোথাও শাসন-কাজে মেয়েদের ক্ষমতা কমেছে, পুরুষদের ক্ষমতা ফুটে উঠেছে। এগুলিকে মাতৃপ্রধান সমাজের ভাঙনের দৃষ্টান্ত বলে চিনতে হবে।

খাসিয়াদের মধ্যে পুজোপাটের ব্যবস্থাটা কী রকম? অনেক জায়গায় দেখা যায়, পুজোপাটের দায়িত্ব পুরুষেরই উপর। অর্থাৎ পুরোহিত বলতে পুরুষই। কিন্তু সেই সঙ্গেই একটা ভারি মজার ব্যাপার চোখে পড়ে। ধর্মকর্মের ভারটা যদিও পুরুষদের উপরই তবুও এই পুরুষেরা নিজে নিজেই ধর্মকর্মের সবটুকু দায়িত্ব নিতে পারে না। পুরুষ-পুরুত যখন কাজকর্ম করবে তখন তার পাশে বসে থাকবে এক মেয়ে-পুরুতও। এই মেয়ে-পুরুতটির উপস্থিতি ছাড়া পুরুষ-পুরোহিতের আসলে ক্ষমতা থাকে না। তার থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে এককালে এ-ক্ষমতাও মেয়েদেরই একচেটিয়া ক্ষমতা ছিলো; সে ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে আজকের দিনে পুরুষদের হাতেই ধর্মকর্মের ক্ষমতাটা চলে আসছে, কিন্তু এখনো তা সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ে নি। তাই কাজকর্মের সময় কোনো-না-কোনো মেয়ে-পুরুতকে সমনে বসিয়ে তবে তারা কাজকর্ম করতে পারে।

ছেলের বদলে ভাগনে

ভাঙনের লক্ষণ সত্ত্বেও খাসিয়াদের মধ্যে,—এবং সারা পৃথিবীতে বোধহয় ওই শুধু খাসিয়াদের মধ্যেই,—মাতৃপ্রধান সমাজের কাঠামোটা আজো অনেকাংশে টিকে রয়েছে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, ওদের অবস্থাও সর্বত্র সমান নয়। ওদের মধ্যেও কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায় মাতৃপ্রধান সমাজের এই কাঠামোটিতে ভাঙন ধরেছে। তাই মাতৃপ্রধান সমাজে যখন সবে

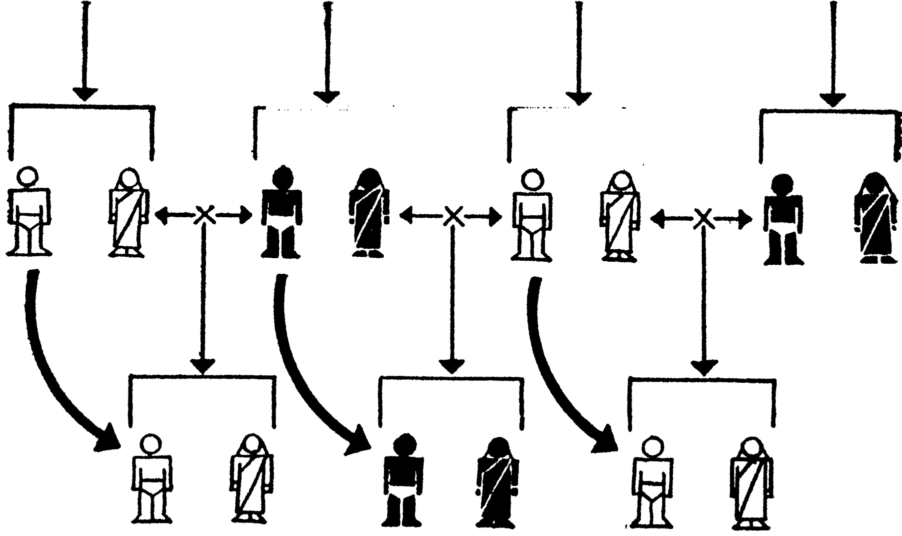
ভাঙন ধরতে শুরু করে তখনকার অবস্থায় কীরকম অদল-বদল দেখা দেয় তারও খানিকটা পরিচয় আমরা এই খাসিয়াদের কাছ থেকেই জানতে পারবো।

বংশপরিচয়ের কথা আর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কথা দেখা যাক।

আদি-অকৃত্রিম মাতৃপ্রধান সমাজে কী রকম ? মায়ের সম্পত্তি মেয়ে পাবে—সম্পত্তিতে বাবারও কোনো অধিকার নেই, ছেলেরও কোনো অধিকার নেই। এই ব্যবস্থা বদলে পিতৃপ্রধান সমাজে একেবারে উলটো ব্যবস্থা হয়ে গেলো। বাপের সম্পত্তিতে মায়েরও কোনো অধিকার নেই, মেয়েরও অধিকার নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই যে অদল-বদল—এ কি সরাসরি একলাফে হয়েছিলো ? তা নয়। আসলে, মাতৃপ্রধান সমাজ ভাঙতে-ভাঙতে পিতৃপ্রধান সমাজের রূপটি ফুটে ওঠবার মাঝখানে আরো দুটি স্তর আছে।

এই দুটি স্তরের মধ্যে একটির পরিচয় পাওয়া যায় খাসিয়াদের মধ্যেই, আর একটির পরিচয় পাওয়া যায় রোমান রাজারাজড়াদের ইতিহাস থেকে। রোমান রাজারাজড়াদের কথা পরে তুলবো। আগে খাসিয়াদের কথাটা সেরে নি।

খাসিয়াদের মধ্যে যেখানে মাতৃপ্রধান সমাজের আদি-অকৃত্রিম রূপটি আজো টিকে আছে সেখানে সম্পত্তি সরাসরি মা থেকে মেয়ের দিকেই যায়। আবার কোথাও কোথাও মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। সেখানে কী রকম ? মামার সম্পত্তি ভাগনে পাবে। তার মানে, 'ক'-বুড়ো মরলে তার সম্পত্তি তার ছেলে পাবে না, তার বদলে পাবে তার ভাগনে। তাহলে, 'ক'-বুড়োর ছেলেরা কী পাবে ? তারা তাদের মামার সম্পত্তি পাবে—আর ঠিক সেই কারণেই তাদের মামার সম্পত্তিতে তাদের



মামার সম্পত্তি ভাগনে পাচ্ছে। এই ব্যবস্থার পিছনেও মাতৃপ্রধান সমাজের স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়।

মামাতো ভাইদের কোনো অধিকার থাকবে না! ব্যবস্থাটা যে ঠিক কী রকম তার নকশাও এঁকে দেওয়া গেলো।

এ আবার কোন ধরনের ব্যবস্থা? এ-রকম ব্যবস্থা কেন?

এ-ব্যবস্থা এমনিতে আমাদের কাছে যতোই কিম্ভূতকিমাকার বলে মনে হোক না কেন, ভালো করে ভাবলে আমরা বুঝতে পারবো মাতৃপ্রধান সমাজ ভেঙে পিতৃপ্রধান সমাজ গড়ে ওঠবার মাঝামাঝি অবস্থায় এ-রকম একটা ব্যবস্থা হওয়াই স্বাভাবিক।

এই ব্যবস্থায় সম্পত্তি অবশ্য পাচ্ছে পুরুষরাই—সেদিক থেকে মাতৃপ্রধান সমাজ বদলে যাবারই পরিচয়। কিন্তু এর মধ্যে মাতৃপ্রধান ব্যবস্থার স্মৃতিটা কোথায়? কেননা, এ-ব্যবস্থায় পুরুষেরা সরাসরি সম্পত্তি পাচ্ছে না—সম্পত্তি পুরুষানুসূত্রে যাচ্ছে না। সম্পত্তি যাচ্ছে মেয়েদের সূত্র ধরেই। মাতৃপ্রধান সমাজে মামা আর মা একই বংশের লোক, কিন্তু মামার ছেলেরা আর

সে-বংশের মানুষ নয়। কেননা, মামা বিয়ে করেছে অন্য বংশের মেয়েকে আর মাতৃপ্রধান ব্যবস্থা বলেই তার যে-ছেলেপুলেরা হবে তারা ওই অন্য বংশের হয়ে যাবে। মামার ছেলেরা মামীর বংশের লোক, মামার বংশের লোক নয়। তাই, মাতৃপ্রধান সমাজের আইনকানুনের দিক থেকে মামার সম্পত্তি মামার ছেলেরা পেতে পারে না; কেননা তাহলে এ বংশের সম্পত্তি ও-বংশের লোকের হাতে চলে যাবে। তাহলে সম্পত্তিটা পাবে কে? ভাগনে। কেন? তার কারণ ভাগনে হলো মামার বংশেরই মানুষ, মাতৃপ্রধান সমাজের দিক থেকে এই ভাগনের বংশ তার মার বংশ অনুসারেই হবে—অর্থাৎ তার মামার বাড়ির বংশই।

তাহলে, মামার কাছ থেকে ভাগনের পক্ষে সম্পত্তি পাবার ওই ব্যবস্থাটিতে একদিকে মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙন ধরবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—পুরোপুরি মাতৃপ্রধান সমাজ বজায় থাকলে মায়ের সম্পত্তি সরাসরি মেয়েরাই পেতো, সম্পত্তিতে পুরুষদের কোনো অধিকার থাকতো না। আবার অপরদিকে এই ব্যবস্থাটির মধ্যেই মাতৃপ্রধান সমাজের রেশ টিকে থাকতে দেখা যাচ্ছে। সম্পত্তিতে পুরুষদের অধিকার দেখা দিলেও সম্পত্তি মায়ের বংশের বাইরে যাচ্ছে না—মায়ের সূত্রেই, বা মেয়েদের সূত্রেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাই মামার কাছ থেকে ভাগনের পক্ষে সম্পত্তি পাবার ব্যবস্থাটিতে মাতৃপ্রধান সমাজ ভেঙে পিতৃপ্রধান সমাজ গড়ে ওঠবার মাঝামাঝি কোনো অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ-রকম উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা শুধুই যে খাসিয়াদের মধ্যে কোথাও কোথায় চোখে পড়ে তা নয়। আমেরিকার ইরোকোয়া বলে আদিবাসীদের মধ্যেও ঠিক এই রকম উত্তরাধিকার-ব্যবস্থাটিই দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক এই রকম

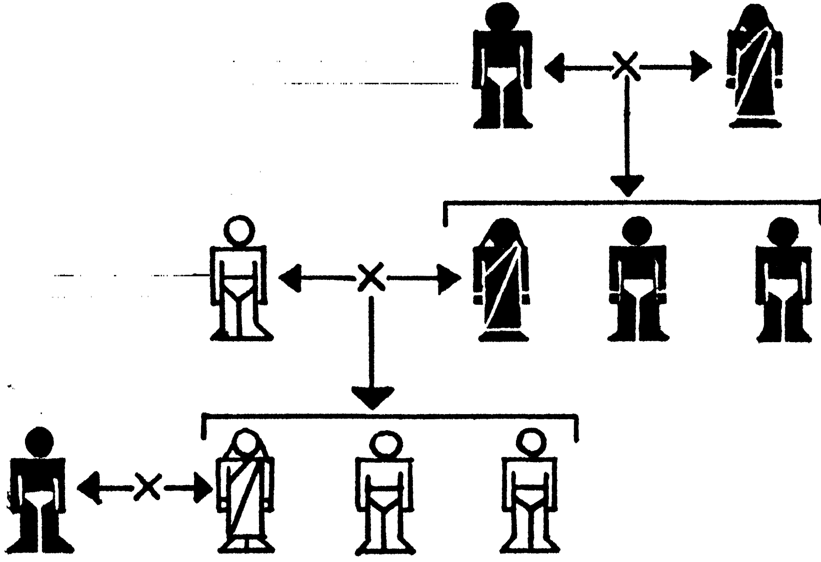
উত্তারিধকার-ব্যবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায় কোনো কোনো পুরোনো পুঁথিপত্রে। আমাদের দেশেরই পুরোনো পুঁথি থেকে একটা নমুনা তোলা যাক। মহাভারতের এক জায়গায় আরট্ট-দেশবাসী বাহিক নামের এক জাতের মানুষের কথা বর্ণনা করা হয়েছে আর বলা হয়েছে যে এদের মধ্যে পুত্রেরা সম্পত্তির অধিকারী নয়, তার বদলে সম্পত্তির অধিকারী হলো ভাগনেরা। ব্যাপারটা ঠিক কী, এ-রকম ব্যবস্থা কেন,—এই প্রশ্ন নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেকদিন পর্যন্ত খুবই ধাঁধায় পড়েছিলেন। কিন্তু আজকের দিনে নৃতত্ত্বের আলোয়—অর্থাৎ পিছিয়ে-পড়ে-থাকা মানুষদের সম্বন্ধে তথ্যের দিক থেকে—আমাদের পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই ব্যবস্থাটির মধ্যে মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙন ধরবার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু পুরোপুরি পিতৃপ্রধান সমাজ তখনো গড়ে ওঠে নি।

ছেলের বদলে জামাই

আগেই বলেছি, মাতৃপ্রধান সমাজ ভেঙে পিতৃপ্রধান সমাজ গড়ে ওঠবার পথে এর পর যে-রকম উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা চালু হলো তার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের রোমান রাজারাজড়াদের ইতিহাসে। কী রকম ব্যবস্থা? ব্যবস্থাটা হলো, শ্বশুরের সম্পত্তি জামাই পাবে।

প্রথমে এই ব্যবস্থাটার কথা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

পুরোপুরি মাতৃপ্রধান সমাজে কী রকম? মায়ের সম্পত্তি মেয়ে পাবে। তাই, সে-ব্যবস্থায় সম্পত্তিতে পুরুষদের কোনো অধিকারই নেই। কিন্তু রোমান রাজারাজড়াদের বেলায় দেখা যাচ্ছে শ্বশুরের সম্পত্তি জামাই পাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা সম্পত্তিটা থাকছে পুরুষদের হাতেই। ব্যবস্থাটাকে তাই মাতৃপ্রধান সমাজের লক্ষণ বলা চলে না।



শ্বশুরের সম্পত্তি জামাই পাচ্ছে—ছবিতে কালো তীর
এঁকে এই কথাটিই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু রোমানদের ওই ব্যবস্থাকে পুরোপুরি পিতৃপ্রধান সমাজের ব্যবস্থাও বলা চলে না। কেননা, পুরোপুরি পিতৃপ্রধান সমাজে তো বাপের সম্পত্তি ছেলে পাবে। অথচ রোমানদের বেলায় দেখা যাচ্ছে 'ক'-রাজার সম্পত্তি 'ক'-রাজার ছেলে পেলো না—তার বদলে 'ক'-রাজার জামাই পেলো।

আমরা বলেছি, এইভাবে ছেলের বদলে জামাইএর পক্ষে সম্পত্তি পাবার ব্যবস্থায় মাতৃপ্রধান সমাজের একটা রেশ পাওয়া যায়। তাই ব্যবস্থাটাকে মাতৃপ্রধান সমাজ ছেড়ে পিতৃপ্রধান সমাজের দিকে এগুবার মাঝপথের কোনো ব্যবস্থা বলে বুঝতে হবে।

মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে পিতৃপ্রধান সমাজ—মেয়েদের হাত থেকে সম্পত্তি আসবে পুরুষদের হাতে। তারই প্রথম ধাপ হিসাবে খাসিয়া প্রভৃতির মধ্যে দেখা গেলো সম্পত্তিটা এসেছে মেয়ের ভাইএর হাতে—তার কাছ থেকে সেই মেয়ের ছেলে সম্পত্তি পাবে।

মামার কাছ থেকে ভাগনের কাছে। এ-অবস্থাতেও কিন্তু মেয়ের স্বামীর কোনো অধিকার নেই—সে বাইরের লোক, অন্য বংশের লোক। দ্বিতীয় ধাপে—যেমন রোমান রাজাদের বেলায়—দেখা যাচ্ছে সম্পত্তিতে স্বামীর অধিকার ফুটে উঠছে: রানীকে বিয়ে করে রাজা রাজত্ব পাচ্ছে, তাদের মেয়েকে বিয়ে করে আবার তাদের জামাই রাজত্ব পাচ্ছে। তাই এ-অবস্থাতেও সম্পত্তিটা মেয়েদের সূত্রেই চলেছে—রানীর মেয়েকে যে বিয়ে করবে সেই পাবে সম্পত্তি। তবুও সম্পত্তি মেয়েদের হাতে থাকছে না—মেয়েদের স্বামীদের হাতে চলে যাচ্ছে।

রোমান রাজারাজড়াদের মধ্যে উত্তরাধিকারের এই ব্যবস্থাটায় যদি মাতৃপ্রধান সমাজেরই রেশ খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে কী প্রমাণ হবে? প্রমাণ হবে যে ওরা যাদের বংশধর তারা নিশ্চয়ই এর আগে পুরোপুরি মাতৃপ্রধান সমাজেই বাস করতো। কেননা আগে যদি মাতৃপ্রধান সমাজে বাস না করে তাহলে পরে মাতৃপ্রধান সমাজে ভাঙন ধরবার লক্ষণ কী করে দেখা দেবে?

ট্রাইব থেকে রাষ্ট্র

তাহলে, আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব মানবদল ওই রকম পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে রয়েছে তাদের পরীক্ষা করলে আমরা সভ্য মানুষদেরও অতীত ইতিহাসকে অনেকখানিই জানতে পারি।

কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ সর্বত্রই ও-রকম পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় আটকে থাকে নি। মানুষ এগিয়েছে। কী করে এগুলো? প্রধানতই চাষবাস শেখবার দরুন; কিন্তু কোনো কোনো মানবদল অবশ্য পশুপালন শিখতে পারার দরুনই এগুতে পেরেছিলো।

প্রাচীন-সমাজের সংগঠনটা কী রকম? অনেকগুলি সজ্ঞাতি মানুষ মিলে একটি করে ক্লান, একাধিক ক্লান মিলে একটি ট্রাইব—অনেক সময় ক্লান আর ট্রাইবের মাঝে ফ্রাত্রি বলে মধ্যবর্তী সংগঠন থাকে। ট্রাইব্যাল সংগঠনের উন্নততম পর্যায়ে কয়েকটি ট্রাইব মিলে এক একটি কন্‌ফেডারেসি অব্ ট্রাইবস্ গড়ে ওঠে।

ট্রাইব্যাল-সংগঠনের মূলে ক্লান। ক্লানের মধ্যে সকলে সমান, সকলে স্বাধীন। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষের প্রকাশ্য সভায় ক্লানের মোড়ল ও যুদ্ধের সর্দার নির্বাচন করা হয়। তাদের কাজ সন্তোষজনক না হলে ক্লানের সভাই তাদের খারিজ করে নতুন মোড়ল আর নতুন সর্দার নির্বাচন করবে। মোড়ল আর সর্দারের দায়িত্ব বেশি; কিন্তু অধিকার সমান। তাই ক্লানের শাসন-ব্যবস্থাতেও ছোটোয়-বড়োয় তফাত নেই। বিভিন্ন ক্লানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ট্রাইবের সমিতি। তারও অধিবেশন প্রকাশ্য-ভাবে হয়; ট্রাইবের অন্তর্গত যে-ক্লানের যে-কোনো মানুষ এই সমিতির অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে পারে, নিজের মত ব্যক্ত করতে পারে। এই সমিতি বিভিন্ন ক্লানের সহযোগিতা রক্ষা করবে, পুরো ট্রাইবের শাসন-কাজ চালাবে। তেমনিই, বিভিন্ন ট্রাইবের প্রতিনিধি নিয়ে কনফেডারেসি অব্ ট্রাইবস্-এর সভা; তারও অধিবেশন প্রকাশ্য—সেখানে বিভিন্ন ট্রাইবের মধ্যে সহযোগিতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

আমরা আজকাল বলি গণতন্ত্র। কিন্তু ট্রাইব্যাল-সমাজে যে-রকম চূড়ান্ত গণতন্ত্রের বিকাশ তা সভ্য মানুষের ইতিহাসে আর কখনো সম্ভবই হয় নি। ফলে ট্রাইব্যাল সমাজের এই ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র না বলে সাম্য বলাই ভালো। আমরা আজকাল সাম্যের কথাও বলি। কিন্তু তার সঙ্গে প্রাচীন সমাজের ওই সাম্যের অনেক তফাত। ফলে, ট্রাইব্যাল সমাজকে আদিম সাম্য সমাজ বলা হয়।

পশুপালন আর চাষবাস—এই দুটি আবিষ্কারের জোরেই মানুষ প্রাচীন সমাজ থেকে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এখানে দু-এক কথায় এই অগ্রগতির পরিচয় দেবো।

এই আদিম সাম্যসমাজের আসল ভিত্তি কী? সেই ভিত্তি কী করে ভাঙলো? মানুষ কেন ট্রাইব্যাল সমাজ ছেড়ে অন্য ধরনের সমাজ গড়বার দিকে এগুলো?

ট্রাইব্যাল সমাজের যে-সাম্য তার আসল ভিত্তি হলো সে-অবস্থায় মানুষের দৈন্য-দুর্বলতা। কেননা মানুষের উৎপাদন-কৌশল তখনো এমন অনুন্নত যে প্রাণপণ চেষ্টা করে মানুষের পক্ষে নিছক বেঁচে থাকবার রসদটুকুই সংগ্রহ করা সম্ভব। উদ্বৃত্ত বলে কিছুই থাকে না। তাই কারুর পক্ষেই উদ্বৃত্তজীবী হওয়া সম্ভব নয়। অপরে খাটবে আমি বসে খাবো,—এ-অবস্থা শুধু তখনই সম্ভব হতে পাবে যখন অপরের খাটুনি থেকে এতোটা জিনিস উৎপন্ন হবে যা দিয়ে তাদের প্রাণ বাঁচিয়েও কিছু বাকি থাকে, উদ্বৃত্ত থাকে। উৎপাদন-কৌশলের অনুন্নত অবস্থায় মানুষের শক্তি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে শেখে নি বলেই সকলকে বাকি সকলের সঙ্গে সমান খাটতে হয়, শ্রমে অংশ গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু মানুষের উৎপাদন-কৌশল চিরকাল ওই রকম অনুন্নত অবস্থায় থাকে নি। কোথাও বা মানুষ পশুপালন করতে শিখেছে, কোথাও বা শিখেছে চাষবাস। আর এই দুটি আবিষ্কারের ফলেই মানুষের পক্ষে আগেকার তুলনায় অনেক বেশি—অনেক রাশিরাশি জিনিস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সম্ভব হয়েছে উদ্বৃত্ত আর উদ্বৃত্তভোগী দলের আবির্ভাব—অর্থাৎ কিনা, একদল খাটবে আর একদল বসে খাবে, এই তফাত।

কারা শুধু মুখবুজে খাটবে আর সেই খাটুনির ফল তুলে দেবে অপরের জন্যে? প্রথম অবস্থায় এ-ধরনের মানুষ সংগ্রহ হয়েছে

যুদ্ধে বন্দীদের থেকেই। তারাই পৃথিবীর প্রথম ক্রীতদাসের দল। ফলে উদ্বৃত্ত-সৃষ্টি সম্ভব হবার পর থেকেই যুদ্ধের উৎসাহও অনেক বেড়েছে: যুদ্ধ করে শুধুই যে অপর ট্রাইবের সম্পদ লুঠ করা সম্ভব তাই নয়, খেটে দেবার জন্যে মানুষ সংগ্রহও সহজসাধ্য।

এদিকে, চাষবাসের উন্নতি হতে-হতে মানুষ দেখলো দলের নানান জনের মধ্যে চাষের জমি আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে নেওয়াই সুবিধের। যে-যার নিজের জমি চাষ করবে। শুরু হলো জমি ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা।

সব জমি সমান নয়। কারুর ভাগে পড়লো ভালো জমি। কারুর ভাগে খারাপ জমি। যাদের খারাপ জমি তারা আর নিজেরা নিজেদের জমিটুকুতে চাষ দিয়ে পেট চালাতে পারে না। যাদের ভালো জমি তাদের কাছে গতর খাটাতে যায়।

এইভাবে ট্রাইবেরই কিছু মানুষ ট্রাইবের বাইরে থেকে সংগ্রহ করা ক্রীতদাসদের দলে ভিড়তে লাগলো। ফলে মানুষের দল ক্রমাগতই দুটি স্পষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে যেতে লাগলো।

আর যতোই ভাগ হয়ে যেতে লাগলো ততোই দরকার হলো অন্য রকম শাসন-ব্যবস্থার। এর সম্পত্তিতে ও হাত দিতে পাবে না। সে বিষয়ে কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মকানুন থাকবে। নিয়ম-কানুনগুলি সকলেই মানতে বাধ্য। কে মানলো আর কে মানলো না—তা বিচার করবার লোক চাই। যারা মানলো না তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে—তার জন্যে দরকার সিপাই শাস্ত্রী, জল্লাদ কোটাল, অনেক কিছু। তাদের খরচ চালাবার ব্যবস্থা থাকা চাই—সকলকেই খাজনা দিতে হবে, সেই খাজনা থেকে এদের খরচ চলবে।

শাসন চালাবার জন্যে এই যে এতোরকম নতুন ব্যবস্থা তার

সমাজে শাসন চলতো

অন্য ভাবে, কেননা ট্রাইব্যাল সমাজে রাষ্ট্রের পরিচয় নেই। প্রাচীন-কালের সমানে-সমান সম্পর্কের ধ্বংসস্তূপের উপরই রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে।

কোন্ দেশে ঠিক কী ভাবে ট্রাইব ভেঙে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে সে কথা এখনো আমরা স্পষ্টভাবে জানি না। ঐতিহাসিকেরা এ-নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন নি। তাই মানুষের পক্ষে সভ্যতার দিকে এগুবার কাহিনী আজো আমাদের কাছে অনেকখানি অস্পষ্ট। প্রাচীন-সভ্যতার নিদর্শনগুলি বিচার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার মধ্যে ট্রাইব্যাল সমাজের অনেক রকম স্মৃতিচিহ্ন টিকে রয়েছে। তার থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে ওই সভ্যতাগুলির নীচে ট্রাইব্যাল সমাজের একটা ইতিহাস চাপা পড়ে আছে—যারা এই সব সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো তারা ট্রাইব্যাল সমাজেই বাস করতো। আর সেই ট্রাইব্যাল সমাজের গড়নটা যে কী রকম ছিলো তা আমরা অনুমান করতে পারি আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে অসভ্য অবস্থায় আটকে-পড়ে-থাকা মানুষগুলিকে দেখে।

ট্রাইব ভেঙে কী ভাবে রাষ্ট্রের উদয় হয়েছে তার কিছুটা আভাস হয়তো পাওয়া যেতে পারে পুরোনো কালের পৌরাণিক কাহিনী থেকে। এখানে একটা নমুনা উদ্ধৃত করবো। বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন পুঁথি আছে। তার নাম মহাবস্তু অবদান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই পুঁথি থেকে রাজার আবির্ভাব-কাহিনী সহজ বাঙলায় ব্যাখ্যা করেছেন।

"যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি 'সত্ত্ব' আভাস্বর হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়।……তাঁহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়িঘর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন সবই ধর্ম।

"তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল—যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ।...... পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রঙ-ও সেইমত হইয়া গেল। এইরূপে অনেকদিন যায়। যাঁহারা অধিক আহার করেন তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া উঠে, আর যাঁহারা অল্প আহার করেন তাঁহাদের রঙ ভাল থাকে। ভাল রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং আমি বড় তুমি ছোট এই মান-অভিমান জাগিয়া উঠিল। একদিন যে-ধর্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদয়ে তাঁহাদের সে-ধর্মের প্রভাব খর্ব হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ পাইয়া গেল। তথন তাঁহারা খান কি? পৃথিবীর সর্বত্র ভুঁইপটপটি উঠিল......ক্রমে তাঁহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁইপটপটির মত তাঁহাদের রঙ হইল। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেল।......ভুঁইপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রঙ বনলতার মতই হইয়া গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান-অভিমান আসিয়া জুটিল, বনলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান। এ-ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ।..... এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুইবেলা ধান ঝাড়িয়া আনিত, সঞ্চয়ের নামটিও করিত না কিন্তু ক্রমে দু'একজন ভাবিল, দু'বেলায়ই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক-বেলাতেই দু'বেলার ধান যোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দেখা দেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল। বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দু'বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিল, ক্রমে সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল।

"ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধান ক্ষেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুষ্ট লোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিল। যাহা হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন ক্ষেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে— এই ক্ষেত তোমার, এই ক্ষেত আমার এই ক্ষেত রামের এই ক্ষেত শ্যামের এইরূপ আবার কিছুদিন চলিল।

"একজন বসিয়া ভাবিতে লাগিল : আমার ত এই ক্ষেত, এই ধান। যদি কম জন্মায়, কী করিয়া চলিবে? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক আর না দিক, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের ক্ষেত্রের ধানগুলি উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া কহিল, 'তুমি কর কি? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছ?' 'আর এরূপ করিব না।' কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আবার বলিল, 'তুমি ফের এই কাজ করিলে?' সে বলিল, 'আর এরূপ হইবে না।' কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল,—'দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে, দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে। কী অন্যায়, কী অন্যায়!' এইভাবে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যা কথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

"তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল,—আইস, আমরা একজন বলবান, বুদ্ধিমান, সকলের মন যোগাইয়া চলে, এমন লোককে আমাদের ক্ষেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে সকলে ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পড়িয়া মাটিতে মাটি হইয়া গেল। শেষে তাহাদের ক্ষেত আগলাইবার জন্য একজন ক্ষেতওয়ালার দরকার হইল। সেই ক্ষেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিনা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সভ্যতার প্রস্তুতি

নতুন পাথরের যুগে পৌঁছে মাটির বুকে ফসল ফলাতে শিখে মানুষ জীবনধারার মধ্যে একটা যুগান্তকারী বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলো। প্রকৃতির মর্জিমাফিক দানের উপর আর মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে সে এখন তার নিজের খাবার নিজেই তৈরি করতে শিখলো। এতোদিনে মানুষ যেন সত্যিসত্যিই স্বাবলম্বী হয়ে উঠলো।

প্রকৃতির বুকে যা স্বাভাবিকভাবে নেই মানুষ শুধু যে সেই খাবার তৈরি করতেই শিখলো তাই নয়, চাষবাসের ফলে তার নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি খাবার এখন তার হাতে আসতে শুরু করলো। ফলে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের যেটা জীবনধারণের সমস্যা ছিলো, এবার সেই সমস্যা থেকে সে খানিকটা মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেলো। বাড়তি খাবার মানুষের গোটা সমাজকে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত এবং আত্মনির্ভরশীল করে তুললো।

আর এই বাড়তি খাবার হাতে আসবার পর কী ভাবে মানুষের সমাজের এক-একটা অংশ খাবার যোগাড় এবং খাবার তৈরির একঘেয়ে প্রাত্যহিক নিদারুণ খাটুনি থেকে মুক্তি পেয়েছিলো—সে আমরা আগেই দেখেছি। কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলে, জোলা, পটুয়া, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারিগররা এখন আলাদা আলাদা ভাবে একমনে নিজের নিজের কাজ করে যেতে লাগলো। খাবার

যোগাড়ের ভাবনা তাদের নেই ; কারণ সমাজের হাতে যে বাড়তি খাবার জমে আছে, তার বিনিময়ে তারা সমাজের অন্য পাঁচটা জরুরী কাজ করে দিচ্ছে। কারিগর ছাড়াও দেখা দিলো বণিক, ব্যবসায়ী, পুরোহিত এবং মাতব্বর শ্রেণী—সমাজে যাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট কাজ ছিলো।

বাড়তি খাবার হাতে আসবার পর সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ওলট-পালট হয়ে গেলো। নতুন পাথরের গোড়ার যুগের স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটা কারিগরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে পড়ার দরুন শহর হিসাবে গড়ে উঠলো। মানুষের সমাজ এই প্রথম দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেলো। তাই সকলকে শাসনে রাখবার জন্যে নতুন ব্যবস্থারও প্রয়োজন হলো। দেখা দিলো সমাজ সংগঠনের মধ্যে নতুন একটা বিষয়—রাষ্ট্রব্যবস্থা। চাষবাস শেখবার মধ্য দিয়ে মানুষের সমাজে প্রথম একটা বিপ্লব ঘটে গিয়েছিলো। বাড়তি খাবার হাতে আসবার পর শহর এবং রাষ্ট্র গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সেই বিপ্লবের চরম পরিণতি হলো।

অগ্রগতির তীব্রতা

অবশ্য যতো তাড়াতাড়ি বলা হলো ততো তাড়াতাড়ি এই অগ্রগতি হয় নি। চাষবাস শেখা এবং শহর ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবার মধ্যে যথেষ্ট সময় কেটে গিয়েছিলো, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু, শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সমাজের পুরো অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এই যুগের অগ্রগতির বেগ ছিলো খুবই তীব্র। একমাত্র আধুনিক কালের তিন-চারশো বছর ছাড়া, মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এতো তীব্র অগ্রগতি আর কখনো হয় নি। পৃথিবীর বুকে আবির্ভাবের পর থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মন্থর গতিতে মানুষ যে পরিমাণ অগ্রসর হতে পেরেছিলো, নতুন

পাথরের যুগের মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানুষ তাকে অনেক পিছনে ফেলে চলে এলো। শুধু তাই নয়, এই কয়েক হাজার বছরের অগ্রগতিই হয়ে দাঁড়ালো ভবিষ্যতের আরো কয়েক হাজার বছরের প্রধান সম্বল। নতুন পাথরের যুগের এই তীব্র অগ্রগতি মানুষের গোটা ইতিহাসে একটা চমক-লাগানো ব্যাপার। এই তীব্র অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিলো কী ভাবে ?

নতুন আবিষ্কার

বাড়তি খাবার সমাজের অগ্রগতির পথে সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করে দিয়েছিলো ; কিন্তু যে ব্যাপারগুলো সোজাসুজি মানুষের সমাজকে এগিয়ে দিলো, সেগুলো হলো কয়েকটি নতুন আবিষ্কার। যীশু খ্রীষ্ট জন্মাবার আগে ছ হাজার থেকে তিন হাজার বছরের মধ্যে, অর্থাৎ আজ থেকে আগের আট হাজার এবং পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে পরের পর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার মানুষ করেছিলো। এই আবিষ্কারগুলো ছিলো সে যুগের সমাজের পক্ষে যুগান্তকারী ঘটনা। বর্বর অবস্থা থেকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দিতে এই আবিষ্কারগুলোই মানুষকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলো।

কী কী আবিষ্কার ?

লাঙল

চাষবাস শুরু হয়েছিলো মাটি খুঁড়বার একটা লাঠির মতো হাতিয়ার দিয়ে। আমরা আগেই দেখেছি যে পাথর কিংবা হরিণের স্বাভাবিক শিং দিয়েই এই হাতিয়ারটি তৈরি হতো। কিন্তু একই জমিতে বছরের পর বছর বেশি পরিমাণ ফসল পাবার জন্যে শীগগীরই দরকার হলো এমন একটি হাতিয়ারের যা দিয়ে একটু বেশি গভীর করে মাটি খোঁড়া যায়। কারণ মাটি যতো গভীর

ভাবে চষা যাবে, ফসলের পরিমাণ ততো বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু লাঠির মতো ওই হাতিয়ারটি দিয়ে এ কাজটা তেমন সুবিধের হয় না; কাজেই মানুষকে মাথা খাটাতে হলো এমন একটি হাতিয়ার বের করবার জন্য, যা দিয়ে স্বচ্ছন্দে কম সময়ে বেশি জমি বেশি গভীর ভাবে চষে ফেলা যায়। আর এই চেষ্টারই ফল হলো —লাঙল। সত্যি কথা বলতে কি, জমিতে লাঙল দিয়ে চাষ না শেখা পর্যন্ত, চাষের কাজটা ছিলো নেহাত-ই নগণ্য, যাকে আমরা এর আগে "কোদাল-চাষের" যুগ বলে এসেছি। চাষের কাজে লাঙল একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলো। প্রথম প্রথম অবশ্য লাঙলগুলো কাঠ দিয়ে তৈরি হতো। মিশরবাসীদের মধ্যে আদিম লাঙলের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা এই রকমই।

চাষের কাজে পশু

লাঙল দিয়ে বড়ো বড়ো জমিতে ঢালাও ভাবে চাষ করতে শিখে, মানুষ আরেকটা জিনিসও আবিষ্কার করে ফেললো। গৃহপালিত



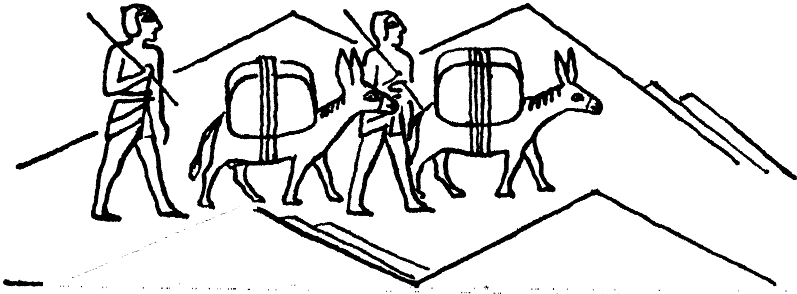
চাষের কাজে লাঙল এবং পশু

পশুগুলোকে মানুষ এ যাবৎ খাবারের উপকরণ বা শিকারাদির জন্যে প্রয়োজন বলেই দেখে এসেছে। কিন্তু ষাঁড়, গাধা, খচ্চর,—প্রভৃতি কয়েকটি পশুর প্রচুর শক্তিকে এখন সে নিজের খাটুনি লাঘব করবার কাজে লাগাতে শুরু করলো। লাঙলে এই পশুগুলোকে যুতে দিয়ে, লাঙল চষার হাড়ভাঙা খাটুনিটা মানুষ এদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। ফলে চাষের কাজ হয়ে উঠলো অনেক সহজ। ফসলের পরিমাণ হতে লাগলো বেশি। চাষের কাজে পশুশক্তিকে যুতে দিয়ে মানুষ এই প্রথম প্রাকৃতিক একটি শক্তিকে আয়ত্তে এনে নিজের দৈহিক খাটুনি হালকা করে ফেললো।

চাষের কাজে পশুশক্তির এই ব্যবহার যে ঠিক কতো আগে চালু হয়েছিলো, তা বলা যায় না। তবে, পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং গ্রীসের আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে যে নতুন পাথরের যুগের গোড়ার দিকেই এটা চালু হয়েছিলো, তা সুনিশ্চিত। ভারতবর্ষের পশ্চিমে সিন্ধু-উপত্যকাতেও এই সময়েই এর ব্যবহার চালু হয়েছিলো।

মাল বইবার কাজে পশু

গৃহপালিত পশুকে মানুষ যে শুধু লাঙলে যুতে চাষের কাজেই ব্যবহার করতে শিখলো তাই নয়, পশুশক্তিকে নিজের আয়ত্তের



পশুর কাঁধে মাল চাপিয়ে সে যুগের মানুষ দুর্গম পথে পাড়ি দিতে শুরু করলো

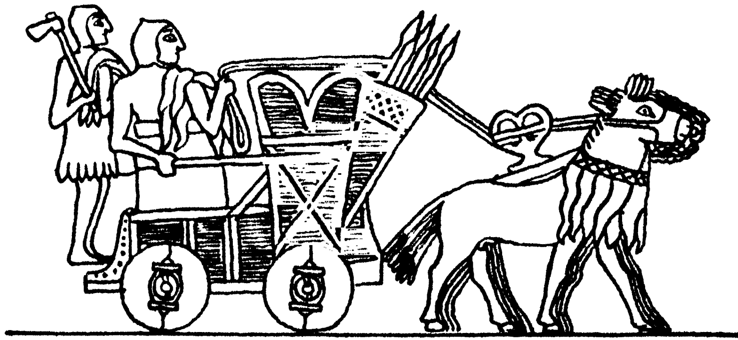
মধ্যে এনে ফেলাতে মানুষের সামনে ক্রমশ তার অন্য অনেক সম্ভাবনার পথও খুলে গেলো। মাল বইবার কাজ এ পর্যন্ত মানুষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়েই করে এসেছে ; কিন্তু এ কাজটাও সে শীগগীরই পশুর কাঁধে চাপিয়ে দিলো। মানুষের চেয়ে গাধা, খচ্চর বা ঘোড়ার দীর্ঘপথ চলবার ক্ষমতা যেমন বেশি, তেমন ভারি জিনিস বইবার ক্ষমতাও তার মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলে জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার কাজ অনেক সুবিধের হয়ে উঠলো। দরকারী জিনিসপত্রের আদান-প্রদানের ব্যাপারটা খুব বেড়ে গেলো। এক গ্রামের সঙ্গে আরেক গ্রামের, এক বসতির সঙ্গে আরেক বসতির এমনকি এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতা ক্রমশ ক্রমশ বাড়তে লাগলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হলো। মানুষের গোটা সমাজের মধ্যে একটা নতুন অগ্রগতির স্রোত এসে গেলো। বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধু—পশুর কাঁধে মালপত্র চাপিয়ে সে যুগের মানুষ দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু পেরিয়ে দূরদূরান্তরে পাড়ি দিত।

চাকা

নিজের কাঁধ থেকে মালের বোঝা পশুর ঘাড়ে চাপিয়ে মানুষ পশুর মতো খাটুনি থেকে রেহাই পেলো। কিন্তু এতেই সে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চাইলো না। মাল বইবার কাজটাকে সে আরো বেশি সহজ, আরো বেশি দ্রুত করে তোলবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো। আর এই চেষ্টার ফলে সে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করলো যার ফলে দূর দূরান্তে নিদারুণ ভারি ভারি জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়াও তার কাছে খুব সহজ হয়ে এলো। এই আবিষ্কারটি হলো চাকার আবিষ্কার। চাকার আবিষ্কার মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড বড়ো ঘটনা।

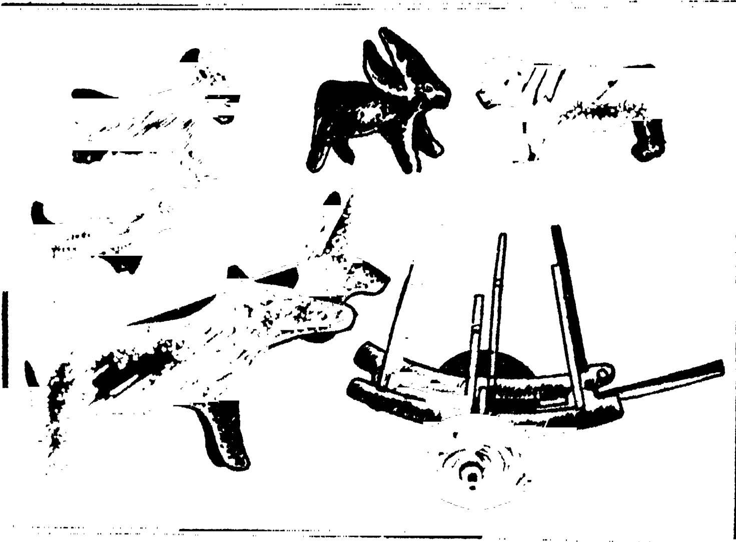
কারণ, একসঙ্গে অনেকগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম না জানলে গোলাকার একটি জিনিসের উপর সমস্ত ভার ছড়িয়ে দিয়ে তাকে খুব সহজে দ্রুতভাবে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা কিছুতেই সম্ভব হতো না। যদিও বিজ্ঞান বলতে হয়তো আমাদের বাধবে, তবু চাকার ব্যবহারের পিছনে যে খানিকটা বিজ্ঞান-চর্চা সে যুগের মানুষকে করতেই হয়েছিলো, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এবং একথা ভাবলে নিশ্চয়ই অবাক হতে হয় যে সেই সুদূর অতীতে যে উদ্দেশ্যে মানুষ চাকার ব্যবহার চালু করেছিলো, আজ পর্যন্তও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই চাকার ব্যবহার চালু আছে। আজকের সমাজের রেলগাড়ি মটরগাড়ি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাছাড়া, আমাদের আধুনিক কালের জীবনধারার প্রায় সমস্ত উন্নতির মূলে, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি কলাকৌশলের উন্নতির মূলে, রয়েছে চাকা ব্যবহারের মূলনীতি। চাকার ব্যবহার মানুষের সমাজে খুবই সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো।

চাকার ব্যবহার কতো আগে এবং কী ভাবে প্রথম চালু হয়েছিলো, আজ তা জানবার উপায় নেই। কারণ চাকা তৈরি হতো কাঠ দিয়ে, আর পাথর পোড়ামাটি বা ধাতুর তুলনায় কাঠের



প্রাচীন সুমেরদের ব্যবহৃত চাকাওয়ালা রথ। যুদ্ধের কাজেই যে এগুলো বেশি ব্যবহৃত হতো তা ছবি দেখলেই বোঝা যায়

পরমায়ু খুব বেশি নয়। তাই হাজার হাজার বছর পরে মাটি খুঁড়ে কাঠের নিদর্শন খুঁজে পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। অনেকদিন আগেই সে কাঠ পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তবে কি সে যুগের চাকা ব্যবহারের কোনো হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়? সম্ভব। কারণ, সে যুগের মানুষই পাথরের গায়ে চাকার ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে, এমনকি মাটি দিয়ে ছেলেদের খেলনার চাকাও তারা তৈরি করে গেছে। সুমেরবাসীদের আঁকা ছবিতে বা অন্য নিদর্শনে আমরা জানতে পারি যে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার পাঁচশো বছর আগেই তাদের মধ্যে চাকার ব্যবহার চালু হয়েছিলো। উত্তর সিরিয়ায় সম্ভবত তারও আগে। সুমেরদের ব্যবহৃত চাকাওয়ালা গাড়ির খুব ভালো ধারণা পাওয়া যায় মাটির তৈরি দু-চাকার এবং চার-চাকার খেলনা-গাড়িগুলো থেকে। টেপ গাওরা নামে একটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে এগুলো পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টের জন্মের তিন



সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া চাকাগাড়ির ভগ্নাবশেষ (ডান দিকে নীচে)। বাকিগুলো মাটির তৈরী শিশুদের খেলনা

হাজার বছর আগেই এলাম, মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ায় চাকা-গাড়ি ও যুদ্ধ-রথের চলন হয়েছিলো। ভারতবর্ষে সিন্ধু-উপত্যকাতেও যে প্রায় ওই সময়েই চাকা-গাড়ির ব্যবহার চালু হয়েছিলো তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ যুগের ব্যবহৃত চাকার ভগ্নাবশেষ থেকেই পাওয়া যায়। তুর্কীস্থানেও প্রায় এই সময়েই এবং ক্রীট ও এশিয়া মাইনরে খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগেই চাকা ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে অনেক বেশি এগিয়ে থাকলেও মিশরে চাকার ব্যবহার চালু হতে বেশ দেরি হয়েছিলো। খ্রীষ্টের জন্মের মাত্র ষোল শো বছর আগে মিশরে চাকা-গাড়ির প্রচলন হয়েছিলো; তাও এর পিছনে ছিলো হাইক্‌সস্ নামে ভিন্‌-দেশী অভিযানকারীদের প্রচেষ্টা। সিন্ধু-উপত্যকার গ্রামবাসীরা এখনো যে ধরনের চাকাগাড়ি ব্যবহার করে, পাঁচ হাজার বছর কেটে গেলেও, সেগুলো ওই আদিম চাকা-গাড়িরই প্রায় হুবহু সংস্করণ।

মৃৎশিল্পে চাকা

আগেই বলেছি, একবার চাকা ব্যবহারের মূলনীতিটা শিখে ফেলার পরে, মানুষ তাকে অন্য নানা দরকারী কাজে ব্যবহার করতেও শুরু করলো। সে যুগের মানুষের রোজকার জীবনে খুব একটা দরকারী জিনিস ছিলো মাটির ঘটি বাটি থালা। মানুষ অনেক আগে এগুলো তৈরি করতে শিখেছিলো; কিন্তু এতোদিন তা হাতে হাতেই তৈরি হয়ে এসেছে। অন্য দশটা কাজের ফাঁকে ফুরসুত-মতো বাড়ির মেয়েরা খানিকটা কাদামাটি দিয়ে গেরস্থালির কাজে লাগে এমন সব জিনিসপত্র তৈরি করতো। কিন্তু চাকা আবিষ্কার হবার পর এ কাজটার মধ্যেও একটা বিপ্লব এসে গেলো। কারণ মাটির পাত্র তৈরি করার কাজে চাকা ব্যবহার করতে মানুষের



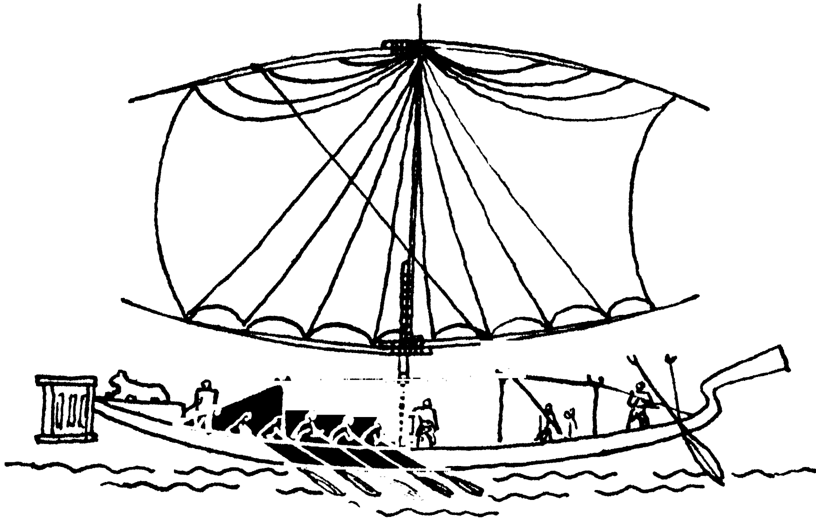
কুমোরের চাক

বেশি সময় লাগে নি। আর তাই দেখা দিলো কুমোরের চাক। এর ফলে আগের তুলনায় অনেক কম সময়ে একশোগুণ বেশি পাত্র অনেক ভালো ভাবে তৈরি করা সম্ভব হলো। খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে তিন হাজার বছর আগেই প্রায় সর্বত্রই মাটির জিনিস তৈরি করার কাজে চাকার ব্যবহার চালু হয়েছিলো। তবে এই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে কাজটা মেয়েদের হাত থেকে পুরুষদের হাতে চলে গেলো, ক্রমশ ক্রমশ কাজটা হয়ে উঠলো পুরো সময়ের একজন বিশেষজ্ঞের কাজ। মাটির পাত্র যে তৈরি করে, গোটা সমাজের চাহিদা মেটানোর মতো মাটির পাত্রই যে শুধু তৈরি করবে—খাবারের জন্যে তাকে ভাবতে হবে না; কারণ বাড়তি খাবারের বিনিময়ে সে সমাজের এই দরকারী কাজটা করে দেয়। মানুষের সমাজে জন্ম নিলো বিশিষ্ট একটি কারিগর শ্রেণী—কুমোর।

নৌকোর পাল

স্থলপথে মাল বইবার কাজে মানুষ যেমন পশুশক্তিকে ব্যবহার করতে শিখেছিলো, তেমনি জলপথেও সে আরেকটা প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগালো। এটা হলো বাতাসের বেগ। বাতাসের

গতি-প্রকৃতি ভালো ভাবে বুঝে নিয়ে, সেই অনুসারে নৌকাতে পাল লাগিয়ে নদী-বা-সমুদ্রপথে যাতায়াতের ব্যাপারটা মানুষ অনেক সহজ এবং দ্রুত করে তুললো। অবশ্য অনেক আগেই, এমনকি পুরোনো পাথরের যুগের একেবারে শুরুর দিকেও, মানুষ ডিঙি বা ভেলা তৈরি করে নদী পারাপার করতো। কিন্তু নৌকায় পাল লাগানোর রেওয়াজ শুরু হয় নতুন পাথরের যুগেই। মিশরের মাটি খুঁড়ে অতি প্রাচীন যে জিনিসপত্র পাওয়া গেছে,



নৌকাতে পাল খাটানো হলো। এটি প্রাচীন মিশরের একটি নৌকা

সেগুলোর গায়ে নৌকার যে ছবি আঁকা রয়েছে, সেটাই বোধ হয় পাল-তোলা নৌকার প্রথম নিদর্শন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেই পাল-তোলা নৌকা চালু হয়েছিলো। ভূমধ্য সাগর এবং আরব সাগরেও এই সময়েই পাল-লাগানো নৌকা চলাচল করতো। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয়া দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা তো প্রায় একশো ফুট লম্বা প্রকাণ্ড নৌকাতে পাল লাগিয়ে মহাসমুদ্রে হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত পাড়ি দিতো।

অজৈব প্রাকৃতিক একটি শক্তিকে অর্থাৎ বাতাসকে পালে আটকে ফেলার দরুন, বাতাসের বেগ নৌকার গতিবেগকে বাড়িয়ে দিলো। আর তার ফলে সে যুগে মাল চলাচল এবং যাতায়াতের ব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এসে গেলো। স্থলপথে পশুচালিত গাড়ির তুলনায় জলপথে পাল-তোলা নৌকার গতিবেগই যে শুধু বেশি, তাই নয়, পশুচালিত গাড়ির তুলনায় পালতোলা নৌকার খরচ-খরচা এবং হুজ্জুত-হাঙ্গামাও অনেক কম। কাজেই স্থলপথের চেয়ে জলপথেই সে যুগে মাল চলাচল, বিশেষত ভারি ভারি মাল দূরদূরান্তে আনা-নেওয়ার ব্যাপার, ক্রমশ প্রাধান্য পেয়েছিলো। সে যুগের ব্যবসাবাণিজ্য তাই ক্রমশ জলপথেই বেশি বেশি চালু হয়েছিলো।

ধাতুর ব্যবহার

এ পর্যন্ত যে আবিষ্কারগুলোর কথা বলা হলো সেগুলো সবই মানুষের অগ্রগতির পক্ষে বিরাট সাহায্য করেছিলো সন্দেহ নেই ; কিন্তু যে আবিষ্কারটি এই যুগে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের গোটা জীবনধারার মধ্যে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলো, এবং চাষবাস শেখবার মতোই যেটা একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলো, সেটা হলো ধাতুর ব্যবহার-আবিষ্কার। ধাতুর ব্যবহার শিখে মানুষ এতোদিনে সভ্যতার রাজপথে এসে দাঁড়ালো।

ধাতু-ব্যবহারের দিক দিয়ে মানুষের সমাজে প্রথম হলো তামার ব্যবহার। তামাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারটি খুব সহজে হয় নি। কারণ, ধাতুপ্রকৃতির বিষয়ে কতকগুলো মৌলিক নিয়মকানুন না জানা থাকলে তামা কেন, কোনো ধাতুকেই নিজের সুবিধেমতো কাজে লাগানো যায় না। অসংখ্য খনিজ পদার্থ থেকে তামাকে আলাদা ভাবে চিনতে পারা, তার প্রকৃতিগত

নমনীয়তা, আগুনের তাপে তাকে গালানোর প্রক্রিয়া এবং সর্বশেষ সেই গালানো ধাতুকে ছাঁচে ফেলে ঢালাই করা—ধাতু-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু জ্ঞান না থাকলে সঠিকভাবে তামাকে ব্যবহার করা চলে না।

তামা

অবশ্য এটা ঠিক যে প্রথম প্রথম মানুষ অন্য পাঁচরকম পাথরের মধ্য থেকে স্বাভাবিক অবস্থার তামাকে পিটিয়ে-পাটিয়ে ঘষে-মেজে নিজেদের কাজের মতো জিনিসপত্র হাতিয়ার তৈরি করতো। এদিক থেকে নতুন পাথরের যুগে পাথর, কাঠ বা হাড় থেকে হাতিয়ার তৈরির পদ্ধতির বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিলো না। কারণ নতুন পাথরের যুগে সব হাতিয়ারই তো ঘা মেরে, পরত তুলে বা ঘষামাজা করেই তৈরি হতো; তাই পাথর, কাঠ বা হাড় ছাড়া মানুষ যখন প্রথম এই ধাতুটি ব্যবহার করতে শিখলো, তখন তার মধ্যে এক উপাদানটি ছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব ছিলো না।

পিটিয়ে-পাটিয়ে ঘষে-মেজে স্বাভাবিক অবস্থার তামাকে ব্যবহার করবার এই পদ্ধতিটি মানুষ অনেকদিন আগে থেকেই জানতো। খুব প্রাচীন মিশরবাসীরা এই ভাবে তৈরি তামার ছোটোখাটো জিনিস যেমন—কাঁটা, মাছ শিকারের কোঁচ, প্রভৃতি ব্যবহার করতো। মেসোপটেমিয়ার অতি প্রাচীন সুমের-বাসী এবং ভারতবর্ষে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীদের কাছেও এ ব্যাপারটি জানা ছিলো। আমেরিকা মহাদেশে পেরু এবং মেক্সিকোর অধিবাসীরা তো সেদিন পর্যন্তও এই ভাবেই তামার ব্যবহার করতো।

কিন্তু এই ধরনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তামা মানুষের সমাজে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে নি। কারণ, পাথর, কাঠ বা হাড়

থেকে তামা যে অসংখ্য দিক দিয়ে অনেক বেশি কাজের তা তখনো মানুষ বুঝতে শেখে নি। তাছাড়া, মাটির উপর স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন তামার পরিমাণও খুব কম ছিলো। পাথর, কাঠ বা হাড়ের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন এবং শক্ত হলেও, তামা ছিলো দুষ্প্রাপ্য ; অথচ রোজকার কাজগুলো তো ওই পাথর, কাঠ বা হাড়ের হাতিয়ার দিয়েই স্বচ্ছন্দে করা যায়, এবং এগুলোর পরিমাণও ছিলো অপর্যাপ্ত। মনে হলো, এমন অপরিসীম সম্ভাবনাময় ধাতু হাতে পেয়েও, মানুষ বুঝি তাকে কাজে লাগাতে পারলো না।

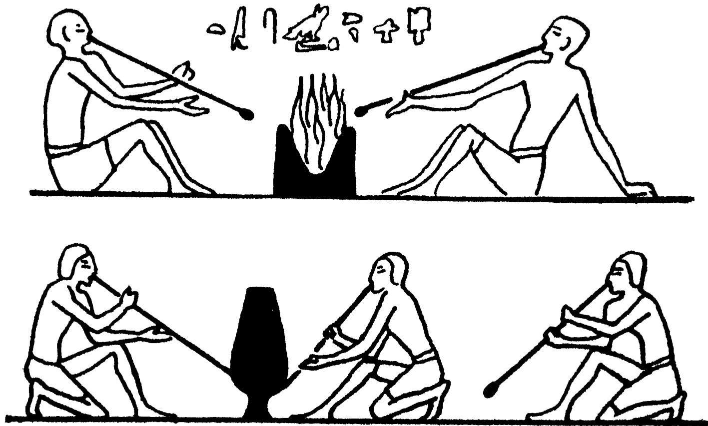
গলানো এবং ঢালাই

কিন্তু তা হলো না। কারণ অপর্যাপ্ত তামার খোঁজে মানুষ শীগগীরই খনি কাটতে শিখলো। মাটির নিচে বা পাহাড়ের গায়ে খনি চালিয়ে খনিজ তামা কেটে নিয়ে এসে, তাকে আগুনে গালিয়ে, ছাঁচে ফেলে জিনিস তৈরি করতেও মানুষ শিখলো। আর এইটাই হলো একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ খনি কেটে খনিজ তামা নিষ্কাশন করতে শেখায় প্রচুর-পরিমাণ তামা পাবার আর কোনো অসুবিধা রইলো না। আর পাথর, কাঠ বা হাড়ের মতো তামাও যখন অপর্যাপ্ত হয়ে উঠলো, তখন তাকে গলিয়ে ছাঁচে ফেলে হাজার রকম দরকারী মনোমত জিনিস তৈরি করবারও আর কোনো বাধা থাকলো না। তামার হাতিয়ার হাজার গুণ বেশি শক্ত, কঠিন, ধারালো বা ছুঁচলো তো বটেই ; উপরন্তু গলানো তামা ছাঁচে ঢেলে যে কোনো রকমের জিনিসই পাওয়া সম্ভব। পাথর, কাঠ বা হাড় দিয়ে শত চেষ্টা করলেও তা পাওয়া যায় না।

তা ছাড়া তামার জিনিস টেকে কতো বেশি! পাথরের একটা কুড়ুল বে-কায়দায় ব্যবহার করলে হঠাৎ ভেঙে খানখান হয়ে যেতে

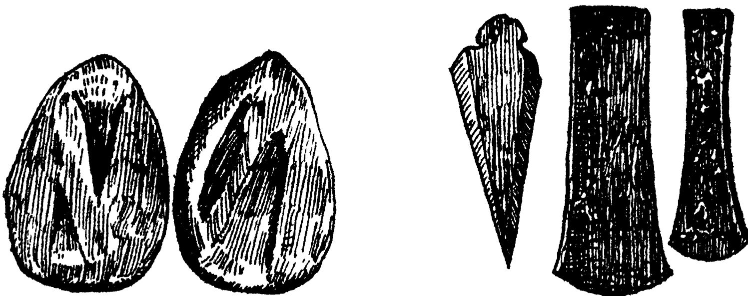
পারে। অথবা, অল্প কিছুদিন ব্যবহার করার পর কুড়ুলের ধারালো দিকটা ভোঁতা হয়ে এলে যদিও সেটাকে ঘষে-ঘষে আবার ধারালো করে তোলা যায় বটে, কিন্তু তবু বেশি দিন তাকে ব্যবহার করা যায় না: কারণ ক্রমাগত ঘষতে-ঘষতে কুড়ুলের সবচেয়ে দরকারী আকৃতিটাই ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। তখন ওটাকে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু তামার কুড়ুলের ওসব বালাই নেই। হঠাৎ ভেঙে যাবার ভয় নেই। ধার যদি কমে আসে তাহলে আবার সেটাকে গলিয়ে ছাঁচে ফেলে ঝকঝকে নতুন একটা কুড়ুল তৈরি করে নেওয়া যায়।

তামা ব্যবহারের এই নতুন বৈপ্লবিক পদ্ধতিটির সঙ্গে মানুষের অনেক আগের শেখা কুমোরের পদ্ধতির সঙ্গে খানিকটা মিল ছিলো। কুমোর যেমন শক্ত মাটিকে জল দিয়ে নরম কাদা করে, তারপর সেই নরম কাদা দিয়ে ইচ্ছেমতো পাত্র তৈরি করে তাকে আগুনে পুড়িয়ে আবার শক্ত করে ফেলে—শক্ত তামাকে গলিয়ে ছাঁচে ফেলে আবার শক্ত জিনিস বের করে নিয়ে আসা, পদ্ধতির দিক দিয়ে দুটো ব্যাপার প্রায় একই রকম।



প্রাচীন মিশরের একটি কামারশাল

কিন্তু কুমোরের পদ্ধতির সঙ্গে মিল থাকলেও তামা গলানো এবং ঢালাই করার পদ্ধতি অনেক বেশি জটিল; এবং আগেই বলেছি যে এর পিছনে ধাতুবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতি অনেকগুলি জ্ঞানবিজ্ঞান জড়িত আছে। তামা গলিয়ে তাকে ঢালাই করে মনোমত হাতিয়ার তৈরি করবার জন্যে মানুষকে আরো কয়েকটি আবিষ্কারের সাহায্য নিতে হয়েছিলো। এক: তামা গলানোর জন্য একটা চুল্লী। এমন চুল্লী যাতে তামা গলানোর মতো খুব বেশি তাপ (অর্থাৎ ১২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্) সৃষ্টি করা যায়। দুই: সেই উত্তপ্ত গলানো তামা ধরে রাখা যায় এমন পাত্র। তিন: গলানো শেষ হলে সেই উত্তপ্ত পাত্রকে নাড়াচাড়া করবার জন্য বড়ো বড়ো সাঁড়াশি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি। চার: গলানো তামা দিয়ে মনোমত জিনিস তৈরি করবার জন্য বিভিন্ন রকমের ছাঁচ। এগুলো ছাড়া আবার সব-চেয়ে বেশি যেটা দরকার ছিলো সেটা হলো খনি কেটে পাঁচ-মিশেলি খনিজ পদার্থ থেকে তামা নিষ্কাশন করবার জ্ঞান ও পদ্ধতি। আজকের মতো খনিবিদ্যা সে যুগে ছিলো না, একথা মনে রাখলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এ কাজটাও কেমন কঠিন



তামা গলিয়ে কুড়ুল এবং ছুরি তৈরি করবার জন্য পাথরের ছাঁচ। ডান পাশে—এই ছাঁচ থেকে ঢালাই করা তামার কয়েকটি হাতিয়ার

ছিলো। অথচ মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়ায় সে যুগে খনি কেটেই তামা সংগ্রহ করা হতো তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমনকি সে যুগে যেখানে খনিজ তামা খুব বেশি পাওয়া যেতো, ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত সেই দ্বীপটির নামই হয়ে উঠেছিলো—সাইপ্রাস দ্বীপ, অর্থাৎ তামার দ্বীপ।

ব্রোঞ্জ

খনি কেটে তামা বের করবার চেষ্টার ফলে সে যুগের মানুষের আরো অনেক সুবিধা হয়েছিলো। সেটা হলো তামার সঙ্গে সঙ্গে আরো দু-চারটি ধাতুর আবিষ্কার। রুপো, সীসে এবং টিন। এগুলোর মধ্যে টিন-ই হলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ টিন আবিষ্কৃত হবার কিছুদিনের মধ্যেই তামার সঙ্গে এটাকে মিশেল দিয়ে আরো বেশি শক্ত, আরো বেশি দীর্ঘস্থায়ী এবং আরো বেশি কাজের হাতিয়ার মানুষ তৈরি করতে শিখেছিলো। তামা আর টিন একসঙ্গে মেশাবার ফলে নতুন যে ধাতুটি তৈরি হলো, তার নাম হলো ব্রোঞ্জ। তামার ব্যবহার শেখবার মধ্য দিয়ে মানুষের সমাজে যে বিপ্লব শুরু হয়েছিলো, ব্রোঞ্জের ব্যবহার শেখা হলো তারই চরম পরিণতি। খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেই ভারতবর্ষ, মেসোপটেমিয়া, এশিয়া মাইনর এবং গ্রীসে ব্রোঞ্জের ব্যবহার চালু হয়েছিলো। লোহার ব্যবহার আবিষ্কার করার আগে পর্যন্ত মানুষের জীবনধারায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এই ব্রোঞ্জ। তাই নতুন পাথরের যুগের পরের যুগটিকে পণ্ডিতেরা ব্রোঞ্জযুগ বলেই অভিহিত করেন।

তামা এবং ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র তৈরি করা সকলের পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। কারণ এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে যেমন কতকগুলো মৌলিক জ্ঞানের দরকার, তেমনি এগুলো নিয়ে

কাজ করবার প্রক্রিয়াটাও ছিলো ভয়ানক জটিল। কাজেই যারা খনি কেটে তামা এবং টিন বের করতো, এবং যারা সেগুলোকে ঢালাই করে জিনিসপত্র তৈরি করতো, তাদের প্রায় পুরো সময়টাই এই কাজে দিতে হতো। সুতরাং তাদের পক্ষে খাবার উৎপাদনের কোনো চেষ্টা করাও সম্ভব ছিলো না। সেই বাড়তি খাবারই আবার এই সমস্যাটারও সমাধান করে দিয়েছিলো। মানুষের সমাজের ইতিহাসে কামারই বোধ হয় প্রথম কারিগর, শুরু থেকেই যে খাবার তৈরির খাটুনি থেকে রেহাই পেয়েছিলো। আধুনিক কালেও যে সমস্ত বর্বর মানুষের সমাজ টিকে আছে, সেখানেও দেখা যায় যে, একমাত্র কামারই হলো পুরো সময়ের কারিগর। সুতরাং মানুষের সমাজে বাড়তি খাবার জমা না হওয়া পর্যন্ত কামারদের একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। তাই স্বতন্ত্র কামার শ্রেণীর আবির্ভাব, সেই সমাজের হাতে বাড়তি খাবার জমা হবার নিশ্চিত প্রমাণ।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আগে চার হাজার থেকে তিন হাজার বছরের মধ্যেই প্রাচীন যুগের প্রাচ্য দেশগুলোতে তামা এবং ব্রোঞ্জ ঢালাই করবার পদ্ধতি চালু হয়েছিলো। কিন্তু তবু, পাথরের হাতিয়ারকে এসব দেশের মানুষ সহজে ত্যাগ করতে পারে নি। বিশেষত যে সব পাহাড়ী অঞ্চলে পাথরের কোনো অভাব ছিলো না, সেখানে তো ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহার চালু হতে আরো বেশি সময় লেগেছিলো। তবে নদী-উপত্যকায়, পলিমাটিপ্রধান অঞ্চলে, যেখানে পাথরের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়, অথবা যেখানে খুব দূর-দূরান্ত থেকে পাথর বয়ে নিয়ে আসতে হতো, সে সব অঞ্চলে নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই তামার ব্যবহার তাড়াতাড়ি চালু হয়েছিলো; কারণ পাথরের চেয়ে তামার পরমায়ু অনেক বেশি। কিন্তু আগেই বলেছি যে ধাতু ব্যবহারের প্রক্রিয়াটাই এতো

জটিল ছিলো, এবং সেই কারণেই সেটা এতো দুর্মূল্যও ছিলো, যে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে তামা বা ব্রোঞ্জের ব্যবহার কখনোই খুব চালু হয় নি। যুদ্ধবিগ্রহের অস্ত্রশস্ত্র এবং সমাজের উপরের তলার মানুষদের মধ্যেই মোটামুটি এর ব্যবহার আটকে ছিলো বলা যায়।

ইঁট

এ যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো বাড়ি তৈরির ইঁট। নতুন পাথরের যুগে চাষবাস শিখে মানুষ কী ভাবে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে চাষের জমির কাছাকাছি এক জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেছিলো, তা আমরা আগেই দেখেছি। যাযাবর অবস্থায় ঘরবাড়ির তেমন চাহিদা মানুষের ছিলো না। আজ এখানে কাল সেখানে, এইভাবে দিন কাটতো। কোনো রকমে একটা আশ্রয় পেলেই হলো। কিন্তু এক জায়গায় বছরের পর বছর বংশপরম্পরায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাওয়ায় বাড়িঘরের প্রশ্নটা বেশ বড়ো হয়ে দেখা দিলো। তাই অনেক দিন টিকে থাকা আর রোদ-বৃষ্টি-শীত ঠেকানোর মতো মজবুত বাড়ি তৈরি করবার জন্য মানুষ আবিষ্কার করলো ইঁট।



কাদামাটির তৈরি প্রাচীন ইট। খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে সুমের-এর কিস্ নগরে বাড়ি তৈরির কাজে এই ইটগুলো ব্যবহৃত হয়েছিলো

মিশর বা সুমেরের চাষবাস-জানা আদিম যে অধিবাসীদের বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে এসব অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে যা হতো সেই নলখাগড়া সমানভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে তাতে কাদামাটি লেপে প্রথম প্রথম কোনোরকমে একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই তৈরি হতো। সুমেরদের বসতির এমন চিহ্নও পাওয়া গেছে যেখানে চারপাশে ঘন নলখাগড়ার ঝাড়ের মধ্যে খানিকটা লম্বা সুড়ঙ্গের মতো পরিষ্কার করে, মাথার উপরে ঐ নলখাগড়ারই ঘন পাটি বিছিয়ে দিয়ে থাকবার সমস্যার সমাধান করা হতো।

কিন্তু, কিছুকালের মধ্যেই মিশর এবং পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীরা শক্ত মাটির বাড়ি তৈরি করতে শিখেছিলা, এবং যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেই সিরিয়া এবং মেসোপটোমিয়ায় ইঁটের আবিষ্কার হয়েছিলো। কাদামাটির সঙ্গে খড়কুটো মিশিয়ে হাতের চাপ দিয়ে বা কাঠের ছাঁচের মধ্যে ফেলে দরকারমতো ইঁট প্রথম প্রথম তৈরি হতো। এগুলোকে পরে রোদে শুকিয়ে খটখটে করে নিয়ে বাড়িঘর তৈরির কাজে লাগানো হতো।

ব্যাপারটি হয়তো এমন কিছু মনে না হতে পারে; কিন্তু ইঁট আবিষ্কারের ফলে মানুষের হাতে এমন একটি জিনিস এলো, যার আকৃতির উপর তার পুরো দখল আছে। অর্থাৎ দরকারমতো ছোটো বড়ো মাঝারি নানান আকৃতির ইঁট তৈরি করে নানান আকৃতির মজবুত এবং মনোরম বাড়িঘর তৈরি করা এখন সম্ভব হলো। আর কাদামাটির পরিমাণ যখন অপর্যাপ্ত তখন প্রচুর ইঁট তৈরি করবারও কোনো সমস্যা ছিলো না।

প্রথম প্রথম রোদে পুড়িয়ে শক্ত করা হলেও, মানুষ ক্রমশ আগুনের চুল্লীতে ইঁট পোড়াবার কায়দা আবিষ্কার করেছিলো। ফলে অনেক তাড়াতাড়ি অনেক বেশি শক্ত অনেক বেশি ইঁট তৈরি

করা সহজ হয়ে এলো। এই ইঁটের ব্যবহার যে কি রকম হু হু করে বেড়ে গিয়েছিলো, সে যুগের যে কোনো প্রাচীন সভ্যতা-কেন্দ্রের বিরাট বিশাল বাড়িঘরগুলোই হলো তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ভারতবর্ষে সিন্ধু-উপত্যকায় মোহেন-জো-দড়ো নগরটির পরিধিই ছিলো প্রায় এক বর্গমাইল। আর পুরো এই জায়গাটা আজকের যে কোনো শহরের মতোই ছিলো ইঁটে ভর্তি। সিন্ধু-উপত্যকার আরেকটি প্রধান নগর হরাপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে এতো প্রচুর সংখ্যায় ইঁট পাওয়া গিয়েছিলো যে লাহোর থেকে মূলতান পর্যন্ত প্রায় একশো মাইল রেলপথ তৈরি করবার মতো মালমশলার যোগাড় তা দিয়েই হয়েছিলো।

মাপ, ওজন, বাটখারা :

নগর সভ্যতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আরেকটি জিনিসের প্রয়োজনও খুব জরুরী হয়ে দেখা দিলো ; সেটা হলো সমস্ত জিনিসপত্র ওজন বা মাপ করবার জন্য সর্বস্বীকৃত একটা মাপকাঠি।

অবশ্য আদিম যুগ থেকেই মানুষ নিশ্চয়ই মোটামুটি একরকম-ভাবে একটা জিনিসের সঙ্গে আরেকটা জিনিসের মাপ বা ওজনের সম্পর্ক ঠিক করে এসেছে। নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন, আঙুল, বিঘত বা হাতের মাপ দিয়ে, অথবা একপাত্র শস্য, গম বা ধানের ওজন দিয়েই আগে আগে তারা এ কাজটা সারতো। যেমন, একটা নৌকা তৈরির জন্যে সমান মাপের যে কখানি তক্তার দরকার, সেটা একজনের হাতের মাপেই কেটেকুটে আনা সম্ভব ছিলো। কিন্তু, সমাজের চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পারাপারের জন্য যখন বিরাট একটি নৌকা তৈরির দরকার হয়ে পড়লো, এবং যে কাজে একজন দুজন নয়, একশো দুশো লোকের খাটুনি লাগতে

শুরু করলো, তখন প্রত্যেকটি লোকের আলাদা আলাদা হাতের মাপ কোনো কাজে এলো না। কারণ একশো দুশো লোকের প্রত্যেকের হাতের মাপ যে একই হবে তার নিশ্চয়তা কি? না হওয়াটাই বেশি সম্ভব। কাজেই এমন একটি মাপের দরকার হয়ে পড়লো, যার জন্যে কাউকেই নিজের হাতের উপর নির্ভর করতে হবে না, অথচ যে মাপে তক্তাগুলো কেটে আনলে তার প্রত্যেকটি সমান হবে। সুতরাং যে কারো একজনের হাতের মাপ নিয়ে সেটাকে একটা লাঠি বা দড়ির উপরে দাগ কেটে নেওয়া হলো, তারপর সেই লাঠি বা দড়ির মাপ দিয়ে সকলেই সমান মাপের তক্তা কেটে আনলো। একশো দুশো লোক দিয়ে প্রকাণ্ড নৌকা তৈরি করার পথে আর কোনো বাধাই থাকলো না। সকলেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে এই রকম সর্বস্বীকৃত একটা মাপ ঠিক করা হলো। আজকালকার ইঞ্চি ফুট গজের সূত্রপাত হলো। ঠিক একই ভাবে নির্দিষ্ট একটি পাত্রভর্তি শস্যের ওজনকে কোনো একটা পাথরের টুকরো দিয়ে মেপে নিয়ে পরে সেই পাথরের টুকরোটাই সব জিনিস সমানভাবে ওজন করবার জন্য ব্যবহৃত



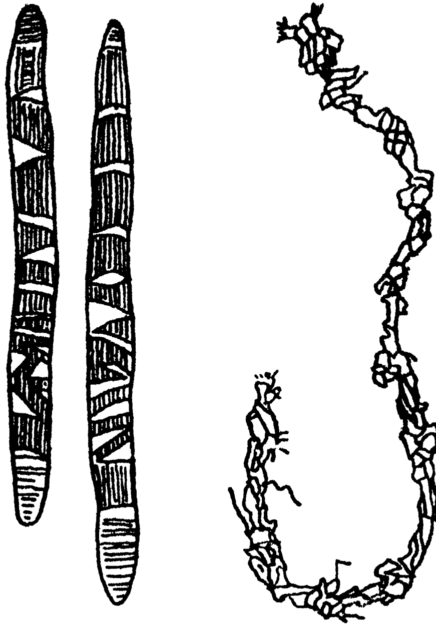
দাঁড়িপাল্লা: ওজন। প্রাচীন মিশরের আঁকা ছবি থেকে পাওয়া।

হতে লাগলো। মন, সের, পোয়া-র সূত্রপাত-ও এই ভাবেই হয়েছিলো। ওজনের প্রসঙ্গে দাঁড়িপাল্লার কথা আসে। সেটাও আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিলো। খুব আদিম যুগেই মিশরে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার চালু ছিলো তার প্রমাণ মেলে। এ থেকে কোনো কোনো পণ্ডিতের মত হলো এই যে, অনেক আগেই দাঁড়িপাল্লা এবং ওজন করবার সর্বস্বীকৃত সাধারণ একটা মাপকাঠি সমাজে প্রচলিত ছিলো।

লেখা :

নগর সভ্যতা এবং ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারের যে কারণে সমাজের সকলের দ্বারা স্বীকৃত মাপ বা ওজন করবার একটি মাপকাঠির প্রয়োজন হয়েছিলো, ঠিক সেই কারণেই মানুষের সমাজে লেখারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। কারণ এখন যে অসংখ্য জিনিস-পত্রের লেনদেন শুরু হলো, একটা পরিষ্কার হিসেব না রাখলে তার হদিশ পাওয়া মুশকিল, অথচ আগের যুগে লোকে যে সহজ সরল পদ্ধতিতে হিসেব রাখতো, সেটা এখনকার এই জটিল ব্যবস্থায় কোনো কাজেই লাগে না। আগে লোকে হিসেব রাখতো শুধু নিজের মনে রাখবার জন্যই। দড়িতে গিঁট দিয়ে (এখনো তো আমরা অনেকেই কাপড়ে বা রুমালে গিঁট দিয়ে একটা জিনিস মনে রাখবার চেষ্টা করি), লাঠিতে দাগ কেটে, কিংবা হাতের পাঞ্জার ছাপ দিয়ে অথবা গাছের ডালে ন্যাকড়া বেঁধে লোকে জিনিসপত্র বা ঘটনার হিসেব রাখতো, বা অন্যদের বোঝাতে চাইতো। এ পদ্ধতিতে তখন কাজ হতো, কারণ ব্যাপারটা শুধু তার নিজের মনে থাকলেই চলে যেতো।

কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য এবং নগর-সভ্যতার বিকাশের পরে রাষ্ট্রের সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ শুধু একজনের মনে থাকলেই আর চলে



লিখতে শেখার আগে আদিম মানুষ এই ভাবে ঘটনা মনে রাখবার চেষ্টা করতো। বাঁ দিকে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত দাগকাটা লাঠি : এক-একটা দাগ এক-একটা বিশেষ ঘটনার স্মারক। ডান দিকে টাঙ্গানিকার আদিম অধিবাসীদের গিঁটবাঁধা দড়ি : গিঁটগুলোই এক-একটি ঘটনার স্মারক।

না। সেটা যাতে সকলের কাছেই পরিষ্কার থাকে, এবং ভবিষ্যতে তার জায়গায় অন্য যে লোক আসবে তার কাছেও যাতে হিসেবটা পরিষ্কার থাকে, তার জন্যেই দরকার হলো এমন একটি পদ্ধতির যা দিয়ে সকলকেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সেটা আবার এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখা চাই যাতে পরে যারা আসবে তাদের পক্ষেও সেই ব্যাপারটা বোঝার কোনো অসুবিধা না হয়। সমাজের এই তাগিদ থেকেই লেখার আবিষ্কার হয়েছিলো। এটিও এই যুগের একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। বহু আগে যেমন কথা বলতে শিখে মানুষ অন্য সমস্ত জন্তুজানোয়ার

থেকে নিজেকে অনেক উপরে তুলে নিয়ে আসতে পেরেছিলো, তেমনি লিখতে শিখে মানুষ তার বন্য-বর্বর অবস্থার শেষ গন্ধ পর্যন্ত মুছে ফেললো। আর, লিখতে শিখেছিলো বলেই আজ আমাদের পক্ষেও সেই যুগের মানুষের জীবনব্যবস্থা এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে এতো খুঁটিনাটি জিনিস জানা সম্ভব হয়েছে।

লেখার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা খুব মজার। সেটা আমরা পরে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। তবে একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। সেটা হলো এই যে সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকলের পক্ষে বোধগম্য হবার প্রয়োজনেই লেখার সৃষ্টি হয়েছিলো; ঠিক সেই কারণেই লেখার পিছনে সমাজের সকলের স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিলো। সমাজের সকলেই মেনে না নিলে সকলের বোধগম্য লেখার একটি পদ্ধতি কিছুতেই তৈরি হতে পারে না। লেখার মূল ভিত্তিই তাই হলো সামাজিক স্বীকৃতি।

পঞ্জিকা :

এই যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো বছরের সঠিক হিসাব বা পঞ্জিকা আবিষ্কার। অবশ্য বহু আগে থেকেই মানুষ চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির হিসেব করে মাস-বছরের হিসেব করতো। এতে ৩০ দিনে মাস এবং ৩৬০ দিনে বছরের হিসেব করা হতো। কিন্তু ক্রমশ এই ব্যবস্থার প্রচণ্ড অসুবিধা বুঝতে মানুষের দেরি হলো না।

পরে আমরা দেখবো মিশরে নীল নদের বার্ষিক বন্যার ফলেই সে যুগের মিশরের সমস্ত চাষবাস সুখসম্পদ নির্ভর করতো। কাজেই নীল নদীর বন্যা ঠিক কবে আসবে এই দিন-তারিখের সঠিক হিসেব খুবই জরুরী ছিলো। পৃথিবী বছরে একবার করে সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে, আর সেই ঘোরার মধ্যে একটা

বাঁধাধরা সময়ে দূরে নীল নদের উৎসে আবিসিনিয়ার পাহাড়চূড়ায় নামে প্রবল বর্ষা, সেই প্রবল বর্ষায় নীল নদ ফেঁপে ফুলে ওঠে, আসে বন্যা। সুতরাং সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর ঠিক কতোদিন লাগে, এ হিসেবটা বের করতে পারলেই নীল নদের বন্যার সঠিক হিসেবটাও বলে দেওয়া যায়। কিন্তু কীভাবে এই হিসেবটা বের করা যায়? তারও একটা হদিশ সে যুগের মিশরের লোকদের কাছে মিলে গেলো।

ঠিক যে দিনটিতে বন্যার জলে এখনকার কায়রো শহরের কাছে নীল নদ ফেঁপে ফুলে উঠে, সেই দিন ভোরবেলায় আকাশে শেষ তারা হিসাবে দেখা দেয় একটি তারা। মিশরীরা এর নাম দিয়েছিলো "সোথিস্" (Sothis)। এখন ইউরোপ-আমেরিকায় এটি "সিরিয়াস" (Sirius) নামে পরিচিত, আমরা বলি 'লুব্ধক'। সুতরাং বছরে যে দিন ভোরের আকাশে শেষ তারা হিসাবে লুব্ধক দেখা দেয়, সে দিন থেকে দিন গুনে-গুনে আবার যেদিন ঠিক এমনি সময়ে লুব্ধক দেখা দেবে—সেটাই হলো বছরের হিসেব; তা হলেই সঠিকভাবে বলে দেওয়া যায় যে নীল নদের বন্যা কবে আসবে। হিসেব করে দেখা গেলো ঠিক ৩৬৫ দিন পর পর লুব্ধক ভোরের আকাশে শেষতারা হিসাবে একবার মাত্র দেখা দেয়। কাজেই ৩৬৫ দিনে র বছর হিসেব হয়ে গেলো।

বছরের হিসেব ঠিকভাবে বের করবার ফলে, নীল নদের বন্যার হিসেব নির্ভুল ভাবে বলে দেবার ফলে সে যুগের মিশরবাসীদের ধনসম্পদ সুখ ঐশ্বর্য যে কি বিরাট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিলো, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি একটি প্রধান আবিষ্কার। অবশ্য, ৩৬৫ দিনের হিসেব ধরলে একেবারে নির্ভুল বছরের হিসেবে ৬ ঘণ্টা কম থাকে। এই ৬ ঘণ্টার ভুল ধরতে মিশরবাসীদের অনেক দিন লেগেছিলো। সে

যাই হোক, পণ্ডিতদের মত হলো এই যে খ্রীষ্টের জন্মের ৪২৩৬ বছর আগেই মিশরে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি সংঘটিত হয়েছিলো। কারো কারো মতে এটি আরো পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের ৩৭৭৬ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিলো।

নতুন পাথরের যুগে মানুষের সামনে অগ্রগতির যে বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, খ্রীষ্টের জন্মের আগের ছ হাজার থেকে তিন হাজার বছরের মধ্যে পরের পর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার-গুলো সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করে দিলো। তারপর মানুষ যে তীব্র গতিতে এগিয়ে এলো, তার তুলনা গোটা মানুষের ইতিহাসেই খুব কম মেলে।

এই আবিষ্কারগুলো মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসে এক-একটা বিজয়স্তম্ভ। বর্বর অবস্থা থেকে সভ্য অবস্থায় পৌঁছে দেবার দিগন্তপ্রসারী এক-একটা আলো হলো এই আবিষ্কারগুলো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লেখা ও লিপি

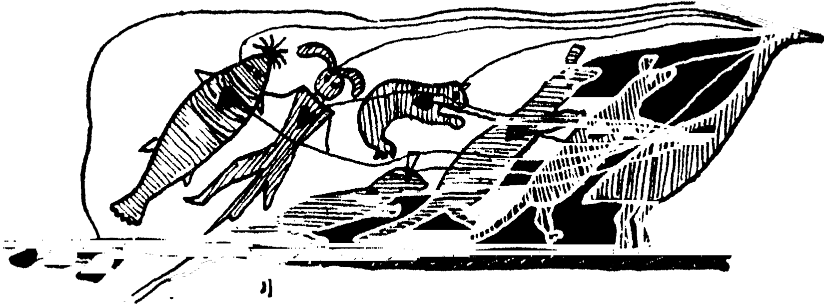
নগর সভ্যতার প্রস্তুতি প্রসঙ্গে আমরা লেখার আবিষ্কারের গুরুত্বের কথা আগেই বলেছি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ কথা বলতে শিখেছিলো; কিন্তু সেই কথাকে লেখায় পরিণত করতে তার যে বিপুল সময় লেগেছিলো, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। কারণ মাত্র পাঁচ হাজার বছর হলো মানুষ লিখতে শিখেছে।

লেখার সবচেয়ে প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া যায় সুমের-এর ইরেক নগরে। এখানকার মাটি খুঁড়ে শক্ত কাদামাটির চাকতির উপরে যে লেখাগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র বিষয়বস্তু হলো মন্দিরের হিসাবপত্র ঠিক রাখা। ঠিক এর পরের যুগে আক্কাদ-এর জেমদেত নাস্‌র্-এও যে লেখাগুলো পাওয়া গেছে সেইগুলোরও ওই একই বিষয়বস্তু। সুতরাং ধনসম্পদ এবং সম্পত্তি রাখার তাগিদ থেকেই যে লেখার আবিষ্কার হয়েছিলো তার অভ্রান্ত প্রমাণ হলো এই লেখাগুলো। এগুলোর সময়কাল খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছরের কিছু আগে (খ্রীঃ পূঃ ৩২০০)। সুমের এবং আক্কাদ-এর বিভিন্ন যুগে পরপর যে লেখাগুলো পাওয়া গেছে, তা থেকে লেখার একটা ধারাবাহিক ইতিহাসও আমরা জানতে পারি।

ছবি এঁকে লেখা

আদিমতম লেখা হলো ছবি এঁকে লেখা। আমার সামনে যে গাধাটি আছে, আমি যদি লিখে সেটাকে বোঝাতে চাই, তাহলে

গাধাটির একটি ছবি এঁকে দিতে হবে। অবশ্য হুবহু সেই গাধাটিকেই আঁকতে হবে, এমন নয়; গাধার একটি মোটামুটি আকৃতি আঁকলেই চলবে। তারপর বহু লোক যখন সবাই গাধা এঁকে গাধাটিকে বোঝাতে চাইলো, তখন গাধার আকৃতি আঁকার মধ্যে মোটামুটি একটা ধরন গড়ে উঠলো। সেটার সঙ্গে তখন আর গাধার হুবহু আকৃতির তেমন মিল হয়তো নেই, কিন্তু গাধার যেটা সবচেয়ে বেশি বিশিষ্টতা সেই কান এঁকেই তাকে তখন বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে। সমাজের সবাই তখন দেখেই বুঝতে শুরু করলো যে ওই চিহ্নটির অর্থ হলো গাধা। লেখার এই প্রাচীনতম যুগকে আমরা চিত্র-লিপির যুগ বলতে পারি।



২।

চিত্রলিপির একটি বিখ্যাত নমুনা। এটি একটি আবেদনপত্র। কিছুকাল আগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে আমেরিকার সাতটি আদিম রেড-ইণ্ডিয়ান উপজাতি এই আবেদনপত্রটি পেশ করেছিলো। এই আবেদন-পত্রে সাতটি রেড-ইণ্ডিয়ান উপজাতি তাদের বসতি অঞ্চলের হ্রদগুলিতে মাছধরার অধিকার দাবি করেছে। এক-একটি উপজাতির টোটেমচিহ্ন এঁকে সেই উপজাতিকে বোঝানো হয়েছে। আর, মাছ ধরার অধিকার দাবিতে এই সাতটি উপজাতিই যে একমত সেটা বোঝানো হয়েছে প্রত্যেকটি উপজাতি টোটেমের চোখ এবং হৃদয়ের সঙ্গে উপজাতিগুলির মুখপাত্র বা নেতার চোখ এবং হৃদয়কে রেখার দ্বারা সংযুক্ত করে। দলের মুখপাত্র হলো "সারস" বা "অস্‌কাবাওইস্‌" উপজাতি। নীচে জলের মধ্যে কয়েকটি মাছ এঁকে মাছধরার ব্যাপারটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু চিত্র-লিপি দিয়ে লিখে বোঝানো শুরু হলেও, শীগগীরই দেখা গেলো যে সবকিছুই ওই চিত্র-লিপি দিয়ে বোঝানো যায় না। যেমন, এক হাঁড়ি যব আছে, এটা বোঝাতে হলে শুধু হাঁড়ি আঁকলেই চলে না; কারণ শুধু হাঁড়ি আঁকলে, হাঁড়িটা বোঝা যায় বটে, কিন্তু হাঁড়ির ভিতরে কী আছে তা মোটেই বোঝা যায় না। অথচ যেখানে পাঁচ-সাতটা হাঁড়িতে আলাদা আলাদা ভাবে বার্লি, গম, যব, এই রকম পাঁচ-সাতটা জিনিস রাখা হয়েছে, সেখানে কি করে বোঝানো যায় যে এটাতে বার্লি আছে, ওটাতে গম আছে? এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টাতেই সুমের-এর প্রাচীন অধিবাসীরা লেখার ব্যাপারে আর-এক ধাপ এগিয়ে গেলো। হাঁড়িগুলোর গায়ে একটা দুটো তিনটে দাগ মেরে বোঝাবার চেষ্টা হলো যে একটা-দাগওয়ালা হাঁড়িতে বার্লি আছে, দুটো-দাগওয়ালা হাঁড়িতে গম আছে, তিনটে-দাগওয়ালা হাঁড়িতে যব আছে। এর পর থেকে একটা-দাগওয়ালা হাঁড়ি দেখলেই বুঝে নিতে হতো যে ওটাতে বার্লি আছে, দুটো-দাগওয়ালা হাঁড়িতে গম আছে। সমাজে এটাও প্রচলিত হয়ে গেলো।

ছবি আর ভাবের মিল

এই সঙ্গে লেখার ইতিহাসেও একটা বিপ্লব ঘটে গেলো। এখন শুধু যা দেখেছি তাই এঁকে বোঝাচ্ছি না; যা ভাবছি অর্থাৎ যা চোখে দেখতে পাচ্ছি না তাও বোঝাবার চেষ্টা করছি। দেখা এবং ভাবনা মেলানো এই যে নতুন লেখা, এটি চিত্র-লিপিরই উন্নততর অবস্থা। এই লেখাকে ভাব-ব্যঞ্জক লিপি বলা হয়। ভাব-ব্যঞ্জক লিপি প্রচলিত হবার পর ক্রমশ ক্রমশ লিপিগুলোর মধ্যে ছবি আঁকার ভাবটা কমে এলো। কোনো জিনিসের পুরো ছবি না এঁকে, তার জায়গায় একটা সংকেত-চিহ্ন এঁকেই সেটাকে

বোঝানো হতে লাগলো। ছবি আঁকার প্রাধান্য থেকে ক্রমশ মুক্তি পেয়ে লেখার মধ্যে কতকগুলো রেখা বা চিহ্ন ব্যবহারের রীতি বাড়তে লাগলো।

ছবি নয়, ভাব নয়, ধ্বনি

চিত্রলিপি এবং তার পরের ধাপে ভাব-ব্যঞ্জক-লিপি দিয়ে অনেক বিষয় বোঝানো গেলেও, তখনো পর্যন্ত লেখার সঙ্গে কথা যুক্ত হয় নি। 'কথা'-প্রসঙ্গে এর আগেই আমরা দেখছি যে, মানুষের কণ্ঠনালীর মধ্যে অবস্থিত ল্যারিংন্‌কৃস (Larynx) বা বাক্‌যন্ত্র থেকে যে কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্বনি বেবিয়ে আসে, সেইগুলিই হলো কথ্যভাষার ভিত্তি। কতকগুলি এই ধরনের ধ্বনি একসঙ্গে মিলিয়ে দিলে তবে একটি শব্দ বা কথা তৈরি হয়। যেমন, গ+আ+ধ+আ এই চারটি আলাদা ধ্বনি ঠিক এই ভাবে সাজিয়ে মিলিয়ে উচ্চারণ করলে তবে "গাধা" শব্দটি বা কথাটি বলা যায়। কাজেই চিত্র-লিপি বা ভাব-ব্যঞ্জক লিপিতে ক্রমশ এই ধ্বনি যুক্ত করবার চেষ্টা দেখা যেতে লাগলো। তাই পরবর্তী ধাপে আমরা দেখতে পাই যে একটি চিত্রলিপি একই সঙ্গে একটি ধ্বনিকেও বুঝিয়ে দিচ্ছে। যেমন, মানুষেব মাথাব একটি ছবি একদিকে চিত্রলিপি অনুযায়ী মানুষের মাথা অন্যদিকে সুমের ভাষায় মুখের প্রতিশব্দ "কা" এই ধ্বনি-শব্দটিকেও বোঝাচ্ছে। এবং এখন থেকে যতো শব্দে "কা" এই ধ্বনিটি থাকবে, সেখানেই "কা" বলতে ওই ছবিটিকেই ব্যবহার করলে চলবে। এই ভাবে লেখার ইতিহাসে আরেকটি বিপ্লব ঘটে গেলো। মানুষের সমাজে ধ্বনি-লিপির উদ্ভব হলো।

ধ্বনি-লিপির দুটি দিক আছে। এক হলো, মানুষের গলা থেকে যতগুলি ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেই প্রত্যেকটি ধ্বনির আলাদা

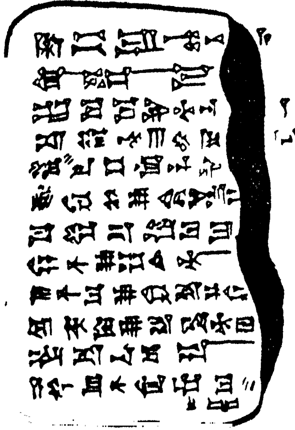
আলাদা বিশুদ্ধ উচ্চারণকে লিপিতে প্রকাশ করা। এই থেকে প্রত্যেক ভাষায় বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে। এক-একটি বর্ণ মাত্র একটি বিশুদ্ধ ধ্বনিকেই বোঝায়; যেমন "অ" বলতে শুধু "অ"-এর বিশিষ্ট ধ্বনিকেই প্রকাশ করা হয়, অন্য কোনো ধ্বনিকে নয়। এর ফলে প্রচণ্ড সুবিধা হলো, কারণ কথ্যভাষায় যতোগুলি কথা আছে আলাদা আলাদা ওই ধ্বনিগত বর্ণ ব্যবহার করে এখন তার সবগুলিকে বোঝানো সম্ভব হলো। মানুষের লেখার ইতিহাসে চূড়ান্ত উন্নতি হলো। আধুনিক সভ্যজগতে আমাদের সকলেরই লিখিত-ভাষা এখন এই ধ্বনিগত বর্ণমালার ভিত্তিতেই তৈরি।

কিন্তু ধ্বনি-লিপি প্রচলিত হবার শুরুতেই এটি সম্ভব হয় নি। তিনটি বা তারও বেশি কয়েকটি ধ্বনি মিলিয়ে যে অক্ষর বা শব্দাংশ তৈরি হয়, প্রথম প্রথম ধ্বনি-লিপিতে এইগুলিকেই প্রকাশ করা হতো। যেমন আমরা আগেই দেখেছি যে সুমেরীয় "কা" শব্দটি একটি বিশুদ্ধ ধ্বনি প্রকাশ করবার জন্য ব্যবহৃত হতো না; এটি একটি শব্দাংশ বোঝাবার জন্যই ব্যবহৃত হতো।

সুমের-এর কিউনিফর্ম

সুমেরীয়দের লিখিত ভাষা ধ্বনিগত এই শব্দাংশ প্রকাশ করার ধাপ পর্যন্ত এসে আর এগোতে পারে নি। এর পরবর্তী যে ধাপ, অর্থাৎ বর্ণমালার ব্যবহার, এই ভাষার পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। প্রাচীন সুমের, এবং সেখান থেকে ক্রমশ আক্কাদ, এলাম ব্যাবিলোনিয়া, আসীরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এই লিপির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিলো। নরম কাদামাটির চাকতি বা খণ্ডের উপরে ছুঁচলো করে কাটা নলখাগড়া দিয়ে সুমের দেশে লেখা হতো। তার ফলে লেখাগুলোকে দেখাতো অনেকটা খুন্তি বা গোঁজের মতো। এই জন্য এই লেখাকে "কীলক-আকৃতি

লেখা" বলা হয়। ইংরেজীতে বলে কিউনিফর্ম। ভাবব্যঞ্জক লিপি থেকে শব্দাংশ প্রকাশ করা—কিউনিফর্ম লিপির এই অগ্রগতির পথে চিহ্ন ব্যবহারের সংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছিলো। খ্রীষ্ট পূর্ব তিন হাজার বছরের আগে যেখানে প্রায় ২০০০ চিহ্ন ব্যবহার করতে হতো, সেখানে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে দেখা যায় যে মাত্র ৬০০ চিহ্ন ব্যবহার করেই লেখার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।



সুমের-এর কিউনিফর্ম লিপি

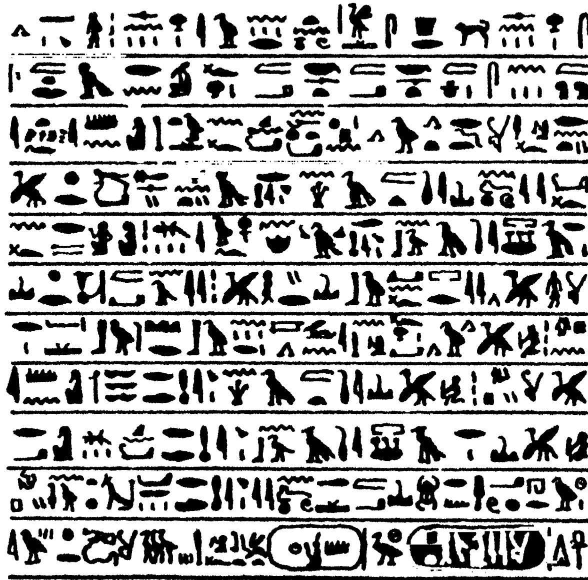
এর ঠিক বিপরীত হয়েছিলো চীন দেশে। সেখানে লেখা চিত্র-লিপি থেকে ভাব-ব্যঞ্জক লিপি পর্যন্ত এগিয়ে আসবার পর, আর এগোয় নি। ফলে ক্রমশ ক্রমশ বেশি বেশি চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন এখানে করতে হয়েছিলো। সেই জন্য আজো পর্যন্ত চীনদেশের লিখিত ভাষায় বিপুলসংখ্যক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মিশরের হায়ারোগ্লিফিক

সুমের-এ যে সময় লিপির আবিষ্কার হয়েছিলো তার কিছু পরে, খ্রীষ্ট পূর্ব তিন হাজার বছরের কাছাকাছি মিশরেও লেখার প্রচলন হয়েছিলো। প্রাচীন মিশরে এই লিপির নাম ছিলো "দেব-ভাষা"; তাই থেকে পরবর্তী কালের গ্রীকরা গ্রীকভাষায় এর নামকরণ করেছিলো "পবিত্র ভাষা" বা হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic).

মিশরীয়দের এই লিপির প্রাচীন চিত্র-লিপির কোনো নমুনা পাওয়া যায় নি। এই লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে বিদ্বান মহলে দুটি মত আছে। একটি হলো যে মিশরে লিপির প্রবর্তকদের কাছে

নিশ্চয়ই সুমের-এর লিপির কথা জানা ছিলো; সেই জন্য তাঁরা একবারেই ভাব-ব্যঞ্জক লিপির প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। অন্যদের মত হলো এই যে যেমন সুমেরদের কিউনিফর্ম লিপি, তেমনি মিশরীয়দের এই হায়ারোগ্লিফিক লিপিও চিত্র-লিপি থেকেই উদ্ভূত। সে যাই হোক, মিশরীয়দের প্রাচীনতম লিপির যে নমুনা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে ভাব এবং ধ্বনি, এ দুটোই এক একটা চিহ্নে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মিশরীয়দের এই প্রাচীন লিপির একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে কতকগুলি ব্যঞ্জন ধ্বনি যেমন ম্, ন, স্, খ্ প্রভৃতি বোঝাবার জন্য এক-একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। কতকগুলি চিহ্ন একটিমাত্র ব্যঞ্জন ধ্বনিকে প্রকাশ করতো, কতকগুলি আবার দুটো-তিনটে ব্যঞ্জন ধ্বনির মিলিত ধ্বনিকে প্রকাশ করতো। মিশরীয়দের এই হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে



মিশরের হায়ারোগ্লিফিক লিপি

প্রথম পদের ২৪টি এবং দ্বিতীয় পদের ৭৫টি চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। মিশরীয়রা ধ্বনি-চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নের সংখ্যা এতো কমিয়ে আনতে পারলেও তারা কখনই ভাব-ব্যঞ্জক চিহ্নকে পরিত্যাগ করতে পারে নি; তাই বর্ণমালার পর্যায়ে উন্নত হওয়াও এই ভাষার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের সময় জনৈক ফরাসী সৈনিক রোজেটা দুর্গে একটি লিপিযুক্ত পাথরখণ্ড আবিষ্কার করেন। এই পাথরখণ্ডে প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিক, মধ্য যুগের মিশরীয় ভাষা এবং গ্রীক ভাষা—একসঙ্গে এই তিনটি ভাষা লিখিত ছিলো। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত শাঁপোলিয়ঁ প্রায় তেইশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। মিশরের প্রাচীন ইতিহাস জানবার পক্ষে যেটি একটি যুগান্তকরী ঘটনার সৃষ্টি করেছিলো, সেই পাথরের খণ্ডটি "রোজেটা পাথর" বলে আজো পরিচিত হয়ে আছে।

সিন্ধু উপত্যকার লেখা

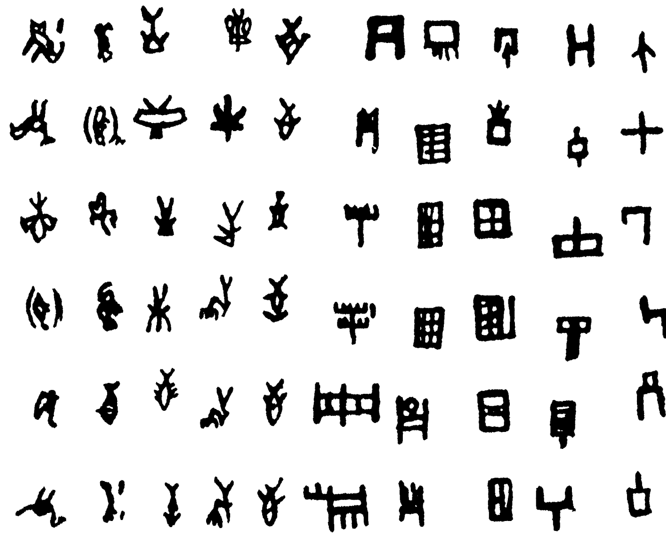
পশ্চিম ভারতে সিন্ধু উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতার যে ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই সভ্যতায়ও লেখার প্রচলন হয়েছিলো। কারণ, এখানকার মোহেন-জো-দারো, হরাপ্পা প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রচুর সংখ্যায় যে সব শীলমোহর পাওয়া গেছে, সেগুলোতে লেখার চিহ্ন খুবই সুপরিস্ফুট। অবশ্য, সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কৃত হবার পর তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেলেও, এখনো পর্যন্ত এই লিপির পাঠোদ্ধার করা যায় নি। দেশবিদেশের বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করেছেন, এবং এখনো করছেন। এঁদের মধ্যে গ্যাড ও স্মিথ, ল্যাংডন, হান্টার, রোজনি প্রভৃতিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরা কেউ এখনো পর্যন্ত এই লিপির

চিত্রলিপি থেকে ভাবব্যঞ্জক ও আক্ষরিক লিপির ক্রমবিকাশ

প্রথম চিত্রলিপি	কিউনিফর্ম বা তিনকোণা লিপি	প্রাচীন ব্যাবিলন	আসীরিয়	অর্থ
				পাখী
				মাছ
				গাধা
				ষাঁড়
				শস্য
				ফল বাগান
				লাঙল দেওয়া
				দাঁড়ানো, যাওয়া

পাঠোদ্ধার সম্পর্কে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। এর ফলে, সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসের বহু বিষয় আজো পর্যন্ত আমাদের জানবার বাইরে রয়ে গেছে। লিখিত লিপির পাঠোদ্ধার করে সুমের বা মিশর-এর প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে যতো পরিষ্কার ভাবে জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের আজো পর্যন্ত বেশির ভাগ ধারণার উপরই নির্ভর করতে হয়।

সিন্ধু সভ্যতার লিপি সম্পর্কে যতোটুকু জানা গেছে তা থেকে মনে হয় যে এই লিপিও চিত্র-লিপি এবং ধ্বনিযুক্ত আক্ষরিক লিপির একটা মাঝামাঝি অবস্থার লিপি। এই লিপি যে চিত্রলিপির পর্যায় পার হয়ে এসেছিলো, সেটা বোধ হয় সুনিশ্চিত। কিন্তু পুরোপুরি ধ্বনিযুক্ত আক্ষরিক লিপির পর্যায়ে পৌঁছেছিলো কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ পণ্ডিতদের মতে এই লিপি-তে ২৫৩ থেকে ৩৯৬টি পর্যন্ত চিহ্ন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এতো বেশি চিহ্ন ব্যবহার ধ্বনিযুক্ত আক্ষরিক লিপির পক্ষে প্রয়োজন হয় না। এই লিপিতে পাখি, মাছ, মানুষের বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি এঁকে একদিকে যেমন চিত্রলিপির মূল নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে কতকগুলি চিহ্নের দ্বারা সেগুলোর মধ্যে ভাব এবং ধ্বনি প্রকাশের চেষ্টাও বেশ স্পষ্ট। এ ছাড়া এই লিপির



সিন্ধু-উপত্যকার লিপি। এখনো পর্যন্ত এই লিপির পাঠোদ্ধার হয় নি।

আরেকটি বিশেষত্ব হলো এই যে, এই লিপিতে উচ্চারণের তারতম্য ঘটানোর জন্য খুব সম্ভব স্বরচিহ্নজ্ঞাপক প্রায় ৪০০ রেখার ব্যবহার। এ থেকে মনে হয় যে, প্রাচীন সুমেরীয় কিউনিফর্ম লিপি যে পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলো, সিন্ধু সভ্যতার এই লিপি সে পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে নি।

হান্টারের মতে সিন্ধু সভ্যতার এই লিপি পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মী লিপির জন্ম দিয়েছিলো। ল্যাংডন-এরও অভিমত তাই। হিট্টাইট লিপির পাঠোদ্ধারক রোজনি-র মতে হিট্টাইট লিপির সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার লিপির অনেক মিল পাওয়া যায়। এই ভিত্তিতে তিনি এই লিপি পাঠোদ্ধারের প্রাথমিক একটি প্রচেষ্টাও করেছেন।

বর্ণমালার আবিষ্কার

লেখা আবিষ্কারের প্রায় একহাজার দেড়হাজার বছর পরে লেখার ইতিহাসে বর্ণমালার আবির্ভাব ঘটেছিলো। এই সময়ের মধ্যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সিনাই, ক্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে যে বর্ণমালার প্রচলন দেখা যায়, পরের যুগে বিভিন্ন ভাষার সমস্ত বর্ণমালাই আদিম এই বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত হয়েছিলো। ওই বর্ণমালাই ক্রমশ ক্রমশ বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় ছড়িয়ে আধুনিক কালের সমস্ত সভ্যভাষার বর্ণমালার জন্ম দিয়েছিলো। অবশ্য পণ্ডিতমহলে এ বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদও আছে। তবে এই সময়ে পশ্চিম এশিয়ার বুকের উপর প্রচণ্ড রাজনৈতিক আলোড়নের মধ্যে সেমিটিক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশ ক্রমশ যে লিপি ব্যবহারের প্রচলন হয়েছিলো, সেই লিপিই বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হবার পর আধুনিক বর্ণমালায় আত্মপ্রকাশ করেছিলো—এই সিদ্ধান্তের পক্ষে এতো বেশি তথ্য-প্রমাণ পাওয়া

গেছে যে, এইটাই ঠিক বলে মনে হয়। পণ্ডিতরা আদিম এই বর্ণমালাকে "সেমিটিক বর্ণমালা" বলে অভিহিত করেছেন। পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এই বর্ণমালার দুটি অধ্যায় আছে। গোড়ার যুগে হলো "প্রোটো-সেমিটিক" বা আগের যুগের সেমিটিক বর্ণমালা। পরে এটি দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো— "উত্তর সেমিটিক", অর্থাৎ উত্তর অঞ্চলের সেমিটিক জাতিগুলির মধ্যে ব্যবহৃত বর্ণমালা, এবং "দক্ষিণ সেমিটিক", বা দক্ষিণ অঞ্চলের সেমিটিক জাতিগুলির মধ্যে ব্যবহৃত বর্ণমালা। আধুনিক বর্ণমালা সৃষ্টির ক্ষেত্রে "উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার"ই হলো প্রধান অবদান।

বর্ণমালার জন্মভূমি

প্রধানত সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনেই যে প্রথম বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয়েছিলো, তার প্রমাণ হলো এই যে, এই দুটি দেশে খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৯০০ পর্যন্ত, এই নশো বছরের মধ্যে বর্ণমালার শুরু থেকে চরম পরিণতির সব কটা ধাপ পরের পর চোখে পড়ে। উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার প্রাচীনতম নমুনা "আব্দো লিপি" (খ্রীঃ পূঃ ১৮শ শতাব্দী) থেকে ফিনিশীয়, এবং ফিনিশীয় থেকে গ্রীক বর্ণমালার ক্রমবিবর্তন এতোই সুস্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ।

সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনেই বর্ণমালা প্রথম আবিষ্কৃত হবার অন্য দিক দিয়েও যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিলো। পূর্বে মেসোপটেমিয়া এবং পশ্চিমে মিশর—এই দুটি প্রাচীন সভ্যতার সেতু ছিলো সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন। স্মরণাতীত কাল থেকে যুগের পর যুগ, হাজার হাজার বছর ধরে সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের বুকের উপর দিয়ে মানুষের অসংখ্য গোষ্ঠীর আসা-যাওয়া চলেছিলো ; দুটি প্রাচীন সভ্যতার ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প-কারিগরি,

সভ্যতা-সংস্কৃতির অসংখ্য আদান-প্রদানও এই দুটি দেশের বুকের উপর দিয়েই ঘটেছিলো। এই দুটি দেশের বুকের উপর দিয়েই অসংখ্য অভিযানকারীদের দল বারবার জয়পরাজয়ের ঝড় উড়িয়ে গিয়েছিলো। কাজেই, সভ্যতার জন্মভূমি বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের মানুষের অগ্রগতির পথে, তার ব্যবসাবাণিজ্য, সমাজ ও রাষ্ট্রের টানাপোড়েনের মধ্যে এই দুটি দেশ বরাবর একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এসেছে। সমাজ এবং সভ্যতার সে জটিল অবস্থায় বর্ণমালার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে সেই অবস্থা ক্রমশই পরিপক্ক হয়ে উঠছিলো। এই দুই দেশেই তাই বর্ণমালার আবিষ্কারও খুব স্বাভাবিক।

সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে আবিষ্কৃত উত্তর সেমিটিক এই বর্ণমালার মোট বর্ণসংখ্যা ছিলো ২২টি। সব কটিই ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণ একটিও ছিলো না। পরবর্তীকালে সেমিটিক ফিনিশীয় বণিকদের কাছ থেকে গ্রীকরা যখন এই বর্ণমালা গ্রহণ করেছিলো, তখন তারাই প্রথম এই ২২টি বর্ণমালার সঙ্গে স্বরবর্ণগুলি যোগ করেছিলো। উত্তর সেমিটিক এই বর্ণমালায় কোনো স্বরবর্ণ কেন ছিলো না, তার মীমাংসা আজো হয় নি। তবে স্বরবর্ণ না থাকায় অন্যদিক দিয়ে আরেকটি প্রচণ্ড সুবিধাও হয়েছিলো। বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে স্বরবর্ণের উচ্চারণের অনেক ভেদাভেদ থাকে ; কাজেই পরের যুগে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির পক্ষে উত্তর সেমিটিক এই বর্ণমালা ব্যাপকভাবে সহজেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিলো। কারণ, প্রত্যেকেই নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গির স্বরবর্ণ-গুলিকে উত্তর সেমিটিক-এর ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পেরেছিলো।

ভারতবর্ষ : ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী

ভারতবর্ষে প্রাচীনতম যে বর্ণমালার নমুনা পাওয়া গেছে, বিদ্বানরা তার নাম দিয়েছেন : "খরোষ্ঠী" এবং "ব্রাহ্মী"। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে সব লিপির প্রচলন আছে, সেগুলি প্রধানত ব্রাহ্মী-লিপি থেকেই উদ্ভূত। বৈদিক আর্যদের বৈদিক যুগে লিখিত লিপি খুব সম্ভব ছিলো না : কারণ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে "লিপি"-র উল্লেখ একবারও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ যুগের শুরুতেই ভারতে প্রথম "লিপি"র সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ; এ থেকে মনে হয় যে, ভারতে বৌদ্ধ যুগ শুরু হবার ত্নু-তিন শো বছর আগে থাকতে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট পূর্ব ৯ম শতাব্দী থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে, ভারতে বর্ণমালার লিপি প্রচলিত হয়েছিলো। উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার আরামিক উপশাখা থেকেই খরোষ্ঠী লিপির উদ্ভব হয়েছিলো বলে পণ্ডিতরা মোটামুটি সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু খরোষ্ঠী লিপি স্বল্পস্থায়ী হয়েছিলো ; কারণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে ভারতবর্ষে এই লিপির ব্যবহার আর চোখে পড়ে না।

ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি নিয়ে বিদ্বান মহলে এখনো পর্যন্ত প্রচুর মতভেদ আছে। আগেই বলেছি যে অনেকে মনে করেন যে এই লিপির পূর্বপুরুষ হলো সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীন লিপি। এঁদের মতে ভারতবর্ষে নিতান্ত স্বতন্ত্রভাবেই বর্ণমালার আবিষ্কার হয়েছিলো, এবং এই আবিষ্কারই ক্রমশ ব্রাহ্মীলিপিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো। কিন্তু অন্যদের মত হলো এই যে, সেমিটিক ওই বর্ণমালার কোনো একটি শাখা এবং উপশাখা থেকেই ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়েছিলো। ভারতবর্ষে স্বতন্ত্রভাবে কখনো বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয় নি। এঁদের এক পক্ষের মতে দক্ষিণ সেমিটিক গোষ্ঠীর স্যাবাটিয়ান্ নামে প্রাচীন আরব-বণিকদের লিপি থেকে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম ; অন্য পক্ষের মতে, খরোষ্ঠীর মতো, উত্তর সেমিটিক্-এর

আরামিক উপশাখা থেকেই ব্রাহ্মী লিপি গড়ে উঠেছিলো। এ বিষয়ে এ পর্যন্ত বিদ্বান মহলে যে গবেষণা হয়েছে, তা থেকে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে সেমিটিক বর্ণলিপির কোনো একটি উপশাখা থেকেই যে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছিলো, তার পক্ষেই তথ্য-প্রমাণ এখনো পর্যন্ত বেশি।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন জেম্‌স্ প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০)। মাত্র ২০ বৎসর বয়সে তিনি কলকাতার টাঁকশালে চাকরি নিয়ে আসেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ডাঃ উইল্‌সন্ তখন টাঁকশালের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। প্রিন্সেপ ১৮৩১ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে প্রাচীন ভারতের লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি অশোকের আমলের কয়েকটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই শিলালিপিগুলি ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত ছিলো। এর কিছু পরে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ারের কয়েকটি শিলালিপি থেকে তিনি আংশিকভাবে খরোষ্ঠীলিপিরও পাঠোদ্ধার করেন। মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপির পাঠোদ্ধারে শাঁপোলিঁয়-র যে অবদান, ভারতের ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপ-এরও অবদান তার সমতুল্য।

ব্রাহ্মীলিপি থেকে আধুনিক বাঙলা লিপির ক্রমবিবর্তন

	মৌর্য যুগ : খ্রীষ্ট পূর্ব ৩য় শতক (ব্রাহ্মী লিপি)	কুষাণ যুগ : খ্রীষ্টাব্দ ২য় শতাব্দী	গুপ্ত যুগ : „ ৪র্থ „	মৌখরি যুগ : „ ৬ষ্ঠ „	শশাঙ্ক যুগ : „ ৭ম „	পাল যুগ : „ ৯ম „	পাল যুগ : „ ১০ম „	সেন যুগ : „ ১১শ/১২ „	সেন যুগ : „ ১২শ „	কৃষ্ণকীর্তন পাণ্ডুলিপি : ১৪শ শতাব্দী
অ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	অ
ক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ক
ট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ট
ড	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ড
ন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ন
প	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	প
ম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ম
শ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	শ
হ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	হ

নবম পরিচ্ছেদ

নগর-সভ্যতার পটভূমি

নতুন পাথরের যুগের শেষাশেষি যুগান্তকারী যে আবিষ্কার-গুলোর ফলে মানুষের সমাজ-বিকাশের ধারায় একটা তীব্র অগ্রগতির স্রোত বয়ে গিয়েছিলো, আমরা যদি মনে করি যে পৃথিবীর সব জায়গায় সমস্ত মানুষের মধ্যেই একই সময়ে সেই অগ্রগতি ঘটেছিলো, তাহলে খুব ভুল হবে। কারণ পৃথিবীর সব জায়গায় সমস্ত মানুষ একই সময়ে ঠিক এক তালে এক ভাবে এগোয় নি।

পুরোনো পাথর থেকে নতুন পাথর, নতুন পাথর থেকে তামা বা ব্রোঞ্জ, এবং তামা ব্রোঞ্জ থেকে আরো পরে লোহা—অগ্রগতির চিহ্ন হিসাবে মোটামুটি এই যে কটি পরের পর যুগ, সেটা হলো পৃথিবীর বুকে মানুষের গোটা সমাজের অগ্রগতির একটা মোটামুটি নিশানা। নৃতত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়ে অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলিয়ে পণ্ডিতরা এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা মানুষের পুরো অগ্রগতির ধারা হলো এই রকম। তার মানে এই নয় যে আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সবাই সমান তালে ঠিক এইভাবেই এগিয়ে এসেছে।

অগ্রগতির অসমতা

গোটা মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস খুবই অসম। হাতিয়ারের উন্নতিসাধন করে কোনো অঞ্চলে যখন কোনো কোনো মানুষের

সমাজ পুরোনো পাথরের যুগ থেকে নতুন পাথরের যুগে এগিয়ে এসেছে, তখনো হয়তো অন্য কোনো অঞ্চলে মানুষের সমাজ পুরোনো পাথরের যুগেই রয়ে গিয়েছে। আবার নতুন পাথর থেকে তামাব্রোঞ্জ, বা তামাব্রোঞ্জ থেকে লোহা ব্যবহারের দিক দিয়েও এইরকম অসমতা থেকে গিয়েছে। অগ্রগতির ধারায় কেন এই অসমতা থেকে গিয়েছে, তার আলোচনা আপাতত আমাদের এই প্রসঙ্গের মধ্যে আসে না। তবে অসমতা যে ছিলো, এমনকি আজ পর্যন্তও যে সেটা আছে, তার ভুরি ভুরি নিদর্শন আমাদের চোখের সামনেই আছে।

মাত্র শ দুয়েক বছর আগে চূড়ান্ত সভ্য দেশ ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন কুক যখন অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন, তখন তিনি সেই দেশের যে আদিম বাসিন্দাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তারা তখনো পর্যন্ত অনেক পিছনে পড়ে ছিলো। অস্ট্রেলিয়ার আরুণ্টা-রা পুরোনো পাথরের যুগে, এবং নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি-রা নতুন পাথরের যুগে তখনো আটকে রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান এবং উত্তর আমেরিকার আর্কটিক অঞ্চলের এসকিমোরা আজো পর্যন্ত পুরোনো পাথরের যুগেই থেকে গিয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেও এখনো পর্যন্ত আনাচে-কানাচে এমন অনেক মানুষের সমাজ টিকে রয়েছে, যেমন, নাগা, টোডা, জুয়াঙ্গ, যারা সেই নতুন পাথরের যুগের অবস্থাতেই দিন কাটাচ্ছে। খ্রীষ্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগে যখন মিশর-মেসোপটেমিয়ার মানুষ নতুন পাথরের যুগকে অনেক পিছনে ফেলে সভ্যতার পুরোপুরি অবস্থায় এসে পৌঁছেছিলো, তখনো পর্যন্ত ইউরোপের ডেনমার্ক-এ নতুন পাথরের যুগের অবস্থা চলছে।

মানুষের সমাজে অসম অগ্রগতির ধারার আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। অগ্রগতির গোটা ধারায় কেউ কেউ দু-কদম এগিয়ে

গেছে, আবার কেউ কেউ তু-কদম পিছিয়ে পড়েছে। যারা পিছিয়ে পড়েছে, তারা হয়তো অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অনেকে সেই অবস্থাতেই আটকে রয়ে গেছে। আজকের দিনেও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে আদিম "উপজাতি" মানুষের যে অস্তিত্ব রয়ে গেছে, তারা হলো পিছনের-ধাপে-আটকে-পড়া এই মানুষের দলগুলি।

নীল নদী থেকে সিন্ধু নদী

সে যাই হোক, নতুন পাথরের যুগে চাষবাস শেখবার পর অনেকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে খ্রীষ্টের জন্মের ছ হাজার বছর আগে থেকে তিন হাজার বছরের মধ্যে মানুষের সমাজে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো, তার প্রধান পটভূমি ছিলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে। পশ্চিমে নীল নদী থেকে পূর্বে সিন্ধু নদী পর্যন্ত শুষ্ক রুক্ষ বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলটিকেই মানুষের সভ্যতার জন্মকেন্দ্র বলা যায়। আরো ভালোভাবে নির্দিষ্ট করলে বলা যায়: পশ্চিমে বিশাল সাহারা মরুভূমি এবং ভূমধ্যসাগর, পূর্বে হিমালয় পর্বত এবং রাজপুতনার থর মরুভূমি, উত্তরে বল্কান ককেশাস এলবুর্জ হিন্দুকুশ প্রভৃতি ইউরো-এশিয়াটিক পর্বতমালা, এবং দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি—মোটামুটি এই ছিলো এই অঞ্চলটির চারদিকের সীমারেখা।

পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলে না হয়ে ঠিক এই অঞ্চলটিতেই কেন সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিলো, সে প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। এটা কি মানুষের অগ্রগতির পথে খামখেয়ালী ঘটনা? না, তা নয়। কারণ একটু ভালো ভাবে খোঁজ করলেই দেখা যাবে যে নতুন পাথরের যুগ থেকে তামা বা ব্রোঞ্জের যুগে এবং তা থেকে সভ্যতার পথে তীব্র অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এই অঞ্চলটিতেই ছিলো। ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে, ভৌগোলিক দিক দিয়ে, ধাতু-প্রকৃতির দিক দিয়ে এই

অঞ্চলটিতে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা ছিলো, পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলে আর সে রকম সুযোগসুবিধা ছিলো না। যে সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে মানুষের সমাজে এই তীব্র অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিলো, তার পক্ষে অনুকূল প্রায় সবগুলি মৌলিক উপাদানই এই অঞ্চলে ছিলো। এ অঞ্চলের পাহাড়-পর্বত এবং শুষ্ক রুক্ষ মরুভূমির মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড উর্বর যে নদী-উপত্যকাগুলো রয়েছে সেই উপত্যকায় চাষবাস এবং বসবাস করবার জন্যে নিতান্ত দরকার ছিলো বহু লোকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। আর, পায়েচলা পথে বা নদীপথে এদেশ থেকে ওদেশে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যাওয়া-আসার সুবিধা ছিলো প্রচুর। এর ফলে এক দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অভিজ্ঞতার সম্পদ খুব তাড়াতাড়ি দূরে-কাছের অন্য দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে পারতো। অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক দরকারী জিনিসপত্র যেমন, তামা টিন ইত্যাদি লেনদেনেরও অনেক সুবিধা ছিলো। তাছাড়া, চাষবাস শেখবার পর মানুষের প্রধান খাদ্য যখন হয়ে উঠলো শস্য, সেই খাবার মতো উপযুক্ত গম, বার্লি বা যবের মতো শস্যের আদিম পূর্বপুরুষ বন্য "এমের" বা "ডিনকেল"-এর জন্মভূমিও ছিলো এই অঞ্চলটি।

"উর্বর হাঁসুলি"

বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের পশ্চিমের অংশটিকে আধুনিক কালে পণ্ডিতরা "উর্বর হাঁসুলি" (Fertile Crescent) নামে অভিহিত করেছেন। উর্বর এই হাঁসুলির পশ্চিম সীমানা হলো নীল নদীর কোলে মিশর —দুপাশের ধু-ধু মরুভূমির মধ্যে শস্যশ্যামল সবুজ একটুকরো মাটি। তারপর প্যালেস্টাইনের উর্বর উপত্যকা এবং ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষে সিরিয়ার উপকূল পার হয়ে ইরানের পাহাড়ী অঞ্চল পর্যন্ত এই হাঁসুলি বিস্তৃত। হাঁসুলীর পুবদিকের সীমানা

হলো মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদীর উপত্যকা অঞ্চল।

যাযাবরী ছেড়ে থিতিয়ে বসা

নতুন পাথরের যুগের প্রথম বিপ্লব, অর্থাৎ চাষবাস শেখবার পর, পূর্বে ভূমধ্যসাগর এবং নীল নদী থেকে শুরু করে সিরিয়া, ইরাক এবং ইরান পেরিয়ে ভারতবর্ষের সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলে চাষবাস-জানা মানুষের অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বসতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। আমরা আগেই দেখেছি যে চাষবাস শেখবার পর মানুষের জীবনধারা ও ব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো। এর আগে, শিকার এবং সংগ্রহই যখন মানুষের খাদ্য সংস্থানের প্রধান উপায় ছিলো, তখন এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার কোনো প্রয়োজন মানুষের ছিলো না। বরঞ্চ তাতে অসুবিধাই ছিলো বেশি। কারণ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একই জায়গায় শিকার বা ফলমূল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। ঘুরে ঘুরে এ জায়গা থেকে ও জায়গা, এদেশ থেকে ওদেশে গিয়ে তবেই এমন পরিমাণ শিকার বা ফলমূল সংগ্রহ করা যেতো যা দিয়ে কোনো রকমে দিনযাপন করা সম্ভব হতো। কাজেই পুরানো পাথরের পুরো যুগটাতে মানুষকে অনবরত চলে-ফিরে বেড়াতে হয়েছে, এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার কথা তার মনে কখনো ওঠে নি। এমনকি, পুরোনো পাথরের যুগের পরেও যে সব মানুষের সমাজে পশুপালনই খাদ্য সংস্থানের প্রধান উপায় হয়ে দেখা দিয়েছিলো, ঠিক একই কারণে তাদের পক্ষেও এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব হয় নি। কারণ প্রকাণ্ড একটা গৃহপালিত পশুদলের উপর যখন গোটা একটা সমাজের খাবার এবং জীবন নির্ভর করছে, তখন সেই পশুদলকে

যথেষ্ট পরিমাণ খাবার যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার সমস্যাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। গৃহপালিত পশুর প্রধান খাবার হলো ঘাস ; কাজেই প্রচুর ঘাসের খোঁজেই পশুপালক মানুষের সমাজকে অনবরত এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। যেখানে ঘাস প্রচুর, সেখানেই ডেরা বাঁধো ; ঘাস ফুরিয়ে এলে ঘাসের সন্ধানে আবার কোনো অঞ্চলে চলো—পশুপালক মানুষের সমাজেও এই ছিলো জীবনযাত্রার পদ্ধতি, যাযাবর বৃত্তি।

চাষ, চাষের জমি, গ্রাম

কিন্তু চাষবাস মানুষের খাবারের অভাব যেমন মেটালো, তেমনি তাকে সেই চাষের জমির পাশেই চিরকালের জন্যে বেঁধে ফেললো। কারণ, জমি তৈরি করা, লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা, আগাছা পরিষ্কার করা, জলসেচের ব্যবস্থা করা, ফসলের বাড় ঠিক রাখা, জন্তুজানোয়ার ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করা, এবং সব শেষে ফসল কেটে গোলায় তোলা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একটানা এই এতগুলো কাজ ধৈর্য ধরে করে গেলে তবে একটা জমি থেকে ফসল পাওয়া যায়, আর সেই ফসলে সকলের খাওয়া-পরা চলে। একটা ফসল উঠতে না উঠতেই পরের বার ফসল পাবার জন্যে আবার সেই প্রথম থেকে শুরু করতে হয়। কাজেই চাষবাস শিখে ফসলের উপর নির্ভরশীল যে সব মানুষের সমাজ দেখা দিলো, তাদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলো। জমির আশেপাশে ঘর বেঁধে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে তারা বাধ্য হলো। যাযাবর মানুষের সাময়িক ডেরা আর নয়, থিতিয়ে-বসা মানুষের টেঁকসই ঘর-বাড়ি বসতি, অর্থাৎ গ্রাম গড়ে উঠলো। সভ্যতার জন্মভূমি বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলে নতুন পাথরের যুগের অসংখ্য গ্রাম এই ভাবেই দেখা দিয়েছিলো।

অবশ্য পুরো এই অঞ্চলটিতে কেবলমাত্র চাষবাস-জানা মানুষেরই বসতি ছিলো, তা নয়। ফাঁকে ফাঁকে, এদিকে ওদিকে পুরোনো পাথরের যুগের শিকার এবং সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল, এবং পরের যুগের পশুপালক যাযাবর মানুষের সমাজও নিশ্চয়ই অনেক ছিলো। কিন্তু এই যুগের এই সব মানুষের জীবনধারার তেমন কোনো খুঁটিনাটি খবর এখনো পাওয়া যায় নি। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার ফলে এখনো পর্যন্ত এ অঞ্চলে প্রধানত চাষবাস-জানা থিতিয়ে-বসা মানুষের জীবন সম্পর্কেই আমরা বেশি জানি। কেন, তারো কারণ আছে।

থিতিয়ে-বসা সমাজের চিহ্ন

আমরা আগেই দেখেছি যে, চাষবাস-জানা মানুষের সমাজকে বছরের পর বছর, বংশের পর বংশ চাষের জমির পাশে স্থায়ীভাবে থিতিয়ে বসতে হতো। কিন্তু বাড়িঘর যে সব জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি হতো সেগুলো কিছু কাল অন্তর অন্তর ভেঙে পড়তো; ভাঙা আবর্জনা সমান করে কিছুকাল অন্তর অন্তর তাই আবার নতুন করে বাড়িঘর তুলতে হতো। আর, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ওই একই জায়গায় পুরোনো ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন বসতি স্থাপন করার ফলে জায়গাটা মাটির সাধারণ স্তর থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতো। হাজার হাজার বছর পরে এই ধরনের এক-একটা বসতি রীতিমতো এক-একটা ঢিবি হয়ে উঠতো। সেই ঢিবির পরের পর এক-একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে থাকতো সেই আমলের ব্যবহৃত মানুষের হাজার রকমের জিনিসপত্র। হাজার হাজার বছর পরে তাই সেই ঢিবি খুঁড়ে পরের পর মানুষের জীবনযাত্রার নিখুঁত পরিচয় পাওয়া আজ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

"ঢিবি"-র ইতিহাস

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, মেসোপটেমিয়া, ইরান পেরিয়ে ভারতবর্ষের সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলে এই ধরনের অসংখ্য ঢিবি আজো চোখে পড়ে। এই ঢিবিগুলো খুঁড়ে উপর থেকে নিচে নামতে শুরু করলে এই যুগের মানুষের পুরো অগ্রগতির ইতিহাস পরিষ্কার হয়ে আসে। নতুন পাথরের যুগের সেই ভোরবেলায় সদ্য চাষবাস-শেখা কোনো মানুষের দল যখন এই জায়গাটায় বসবাস করতে শুরু করেছিলো, তখন থেকে যুগের পর যুগ কি ভাবে আদিম এই বসতিটি বাড়তে বাড়তে ফেঁপে-ফুলে একেবারে উপরের তলার পুরোপুরি নগর-সভ্যতার মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিলো—তার সমস্ত চিহ্ন ওই ঢিবিটার স্তরে স্তরে আটকে আছে, আর প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতরা ঠিক এই উপায়েই সে যুগের মানুষের ইতিহাসের সমস্ত খুঁটিনাটি খবর আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস এইভাবে উদ্ঘাটন করবার কাজে বোট্টা, লেয়ার্ড, ডি. সারজাক্, উইনক্লার, উল্লী, হল্, ডি. মার্গান্, স্পাইজার, স্টাইন্, রোজনি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিশারদদের নাম উল্লেখযোগ্য।

মিশরের ফাউম এবং মেরিম্‌দে; প্যালেস্টাইনের ওয়াদি-এল-নাটুফ; পশ্চিম এশিয়ার টেল হালাফ, টেল হাস্সুনা, টেপ্ গাওরা, টেল আরপাচিয়া, নিনেভে, জেম্‌দেতনাসের, ইরেক, উর, সুসা, আল-উবায়েদ্, এরিদু, টেপ্ সিয়ালক্, টেপ্ হিসার; বেলুচিস্তানের রানা ঘুণ্ডাই, কুল্লী, শাহীটুম্প, নান্দারা, নাল; এবং পশ্চিম ভারতের হরপ্পা, মোহেন-জো-দারো, চান্হু-দারো-আম্‌রি—প্রত্নতত্ত্বের কাজের দিক দিয়ে এগুলোই হলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জায়গা।

আদিম গ্রাম থেকে নগর-সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ—যুগে যুগে, স্তরে স্তরে মানুষের সমাজের এই অগ্রগতির পুরো ছবি পাওয়া যায়

পশ্চিম ইরানের কাশানের কাছাকাছি টেপ্ শিয়াল্ক্-এ। খ্রীষ্টের জন্মের তিনহাজার বছর আগেই এখানে পরের পর ১৭টি ধ্বংসস্তূপ মিলে ৯৯ ফুট উঁচু একটি ঢিবির সৃষ্টি করেছিলো। পণ্ডিতরা হিসেব করে দেখেছেন যে, এখানকার সবচেয়ে নিচের, অর্থাৎ সবচেয়ে আগের বসতি, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪৩০০ বছর আগেই পত্তন হয়েছিলো। মোসাল্-এর কাছে টেপ্ গাওরা-তেও এইরকম ২৬টি ধ্বংসস্তূপ মিলে প্রায় ১০৪ ফুট উঁচু একটি ঢিবির সৃষ্টি করেছিলো। এখানকার আদিম বসতিও খ্রীষ্টের জন্মের ৭০০০ বছর আগেই স্থাপিত হয়েছিলো বলে পণ্ডিতদের মত। সিরিয়ার উত্তর উপকূলে রাস্-সাম্‌রা-তে খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে ৪০ ফুট উঁচু ঢিবি দেখা দিয়েছিলো ; এখানেও খ্রীষ্টের জন্মের অন্তত ৮০০০ বছর আগেই প্রথম বসতি স্থাপিত হয়েছিলো।

সুতরাং নীল নদী এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে ভারতবর্ষের সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলেই মানুষ প্রথমে চাষবাস শিখে চাষের জমির পাশাপাশি জোট বেঁধে স্থায়ীভাবে থিতিয়ে বসেছিলো। এই অঞ্চলেরই মানুষের সমাজ প্রথম বাড়তি খাবার উৎপন্ন করে আস্তে আস্তে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং নগর-সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছিলো। এখানকার এই দীর্ঘস্থায়ী বসতিগুলোর মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে স্তরে স্তরে এই অগ্রগতির ইতিহাস বের করে আনা হয়েছে। মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধু সভ্যতার যে আলোচনা আমরা এবার করবো, মনে রাখতে হবে যে তার সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি খবর এই ভাবেই আমরা জানতে পেরেছি।

দশম পরিচ্ছেদ

সুমের-আক্কাদ : ব্যাবিলোনিয়া

সদ্য চাষবাস-শেখা নতুন পাথরের যুগের চাষীর ছোট্ট বসতি থেকে ব্যবসাবাণিজ্য এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিতে নগর-সভ্যতার জটিল জীবনের পূর্ণ বিকাশ—এই অগ্রগতির খুঁটিনাটি ইতিহাস সব চেয়ে ভালো জানা যায় মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী দুটির উপত্যকায়। টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্এর বাহুবন্ধনের মধ্যে যে ছোট্ট দেশ, প্রাচীন গ্রীকরা তার নাম দিয়েছিলো মেসোপটেমিয়া। দুই নদীর মধ্যেকার দেশ বলে গ্রীকভাষায় একে মেসোপটেমিয়া বলা হতো। মেসোপটেমিয়া বলতে বর্তমান সময়ে ইরাক দেশটিকেই বোঝায়। কিন্তু, সুদূর অতীতে মেসোপটেমিয়া বলে কোনো দেশ ছিলো না। তার জায়গায় তখন ছিলো উত্তরে আসীরিয়া এবং দক্ষিণে ব্যাবিলোনিয়া। আবার, ব্যাবিলোনিয়ার উত্তর অংশটির নাম ছিলো আক্কাদ, আর দক্ষিণ অংশটিই সে যুগে সুমের নামে পরিচিত ছিলো।

সুদূর অতীতেরও অনেক আগে সুমের দেশটিরই কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কারণ সে সময় গোটা এই এলাকাটি পারস্য উপসাগরের গর্ভে বিলীন ছিলো। পারস্য উপসাগরের উত্তর উপকূল তখন আরো অনেক উপরে ছিলো। টাইগ্রিস্ ইউফ্রেটিস্ আজকের মতো সংযুক্ত হয়ে তখন পারস্য উপসাগরে এসে পড়তো না; অনেক উপরে আলাদা আলাদা ভাবেই তার সঙ্গে মিলিত হতো। উত্তরে উৎসের মুখে পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এই দুটি নদী



যে পলিমাটি বয়ে নিয়ে আসতো, বছরের পর বছর তাই জমা হতে হতে, দুটি নদীর মুখে চড়া পড়তে পড়তে সাগরের কোল থেকে সুমের দেশটি আস্তে আস্তে জেগে উঠেছিলো। অবশ্য, এইভাবে গোটা এই দেশটির জন্মলাভ করতে নিশ্চয়ই হাজার হাজার বছর কেটে গিয়েছিলো।

তাই অতীতের সেই যুগে সুমের ছিল বিরাট বিরাট জলা এবং নলখাগড়ার ঘন জঙ্গল আর কাদামাটিতে ভর্তি। দুপাশে শুষ্ক রুক্ষ দিগন্তবিস্তৃত মাটি। মাঝে মাঝে প্রায়ই দুই নদীর বন্যার তোড়ে সারা দেশটাই যেতো তলিয়ে। কিন্তু অন্যদিকে এই দুটি নদীতে এবং ওই সমস্ত জলায় হতো প্রচুর মাছ; নল-

খাগড়ার ঘন জঙ্গল ভরে থাকতো অজস্র পশুপাখিতে; আর যেখানে যেটুকু শক্ত জমি দেখা দিতো সেখানেই গজিয়ে উঠতো অসংখ্য খেজুর গাছ। দুপাশে মরুভূমির মতো প্রায় মরা মাটির তুলনায় এ দেশের মাটি ছিলো প্রচণ্ড উর্বর। এতো উর্বর যে, বীজ বোনার তুলনায় ফসলের পরিমাণ প্রায় একশোগুণ বেশি হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক ছিলো না। বস্তুত খ্রীষ্টের জন্মের ২৫০০ বছর আগের নথিপত্র থেকেই জানা যায় যে এখানে বার্লির একটি খেতে বীজের তুলনায় প্রায় ৮৬ গুণ বেশি ফসল পাওয়া যেতো। সুতরাং, বন্যাকে যদি কোনোরকমে একবার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, জলাজঙ্গল থেকে একবাব যদি জল নিকাশের ব্যবস্থা করা যায়, আর নদীর জলকে যদি সুবিধামতো দুপাশের শুকনো মাটির মধ্যে চালিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে এই অস্বাস্থ্যকর, স্যাঁতসেতে, ভিজে দেশটা যে ফুলে ফলে ফসলে সোনার দেশ হয়ে উঠবে, তাতে আর সন্দেহ কি? আব তাই যদি হয়, তাহলে খেটেখুটে একবার মাটি তৈরি কবে তাতে চাষবাস করলে এতো ফসল ফলবে যে সারা বছরের খাবারের ভাবনা একেবারে চুকে যাবে। নিজেদের দরকার মিটিয়েও প্রচুর বাড়তি খাবার তৈরির পক্ষে এমন দেশ আর কোথায় পাওয়া যাবে?

তাই, পুরোনো পাথরের যুগেব শেষাশেষি শিকার এবং সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল যে সমস্ত মানুষের দল এদেশে এসে ডেরা বেঁধেছিলো, তাদের কাছে প্রথম থেকে একটাই প্রশ্ন ছিলো: যেমন আছি তেমনি ভাবেই থেকে সারা বছর খাবার যোগাড়ের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো; আর না হয় খেটেখুটে জমি তৈরি করে সারা বছরের খাবারের ভাবনা চুকিয়ে ফেলা। তারা অবশ্য শেষের পথটাই গ্রহণ করলো।

আমদানি এবং সহযোগিতা

গ্রহণ করলো বটে, তবে কাজটা অতো সহজ ছিলো না। জলাজঙ্গল সাফ করা, খাল কেটে বদ্ধ জল নিকাশ বা বন্যার জল নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য প্রথমেই যার খুব বেশি দরকার, অর্থাৎ নানান কাজের জন্য অজস্র হাতিয়ার, তার ছিলো একান্ত অভাব। কারণ দেশটা মোটেই পাহাড়ী ছিলো না। কাজেই উপযুক্ত হাতিয়ার তৈরি করবার জন্য অনেক দূর-দূরান্ত থেকে পাথর টেনে নিয়ে আসতে হতো। অবশ্য, এ দিক দিয়ে একটা খুব বড়ো রকমের সুবিধা করে দিয়েছিলো টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ নদী দুটি। নদীতে নৌকা চালিয়ে অনেক দূর থেকে ভারি ভারি জিনিসপত্র বেশ সহজেই বয়ে নিয়ে আসা যেতো। আর হাতিয়ার তৈরির মালমশলা অতো দূর থেকে বয়ে নিয়ে আসতে হতো বলেই এদেশের মানুষ পাথরের চেয়ে তামার ব্যবহারের সুবিধা অনেক তাড়াতাড়ি বুঝতে শিখেছিলো। এখানে সেই যুগের যে সমস্ত আদিম বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো থেকেই বোঝা যায় যে এখানে পাথরের চেয়ে তামার ব্যবহার বেশি প্রচলিত ছিলো।

সুমের-এর সেই আদিম অধিবাসীদের কাছে আরেকটি বড়ো সমস্যা ছিলো এই যে, বন্যা, জলা এবং জঙ্গল থেকে জমি উদ্ধার করবার কাজ একজন দুজন বা দশবিশ জনের সাধ্যের মধ্যে ছিলো না। ভারি ভারি এই কাজগুলো করবার জন্য দরকার ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি লোকের জোটবাঁধা খাটুনি। আর এই দরকার থেকেই সে যুগের সুমের দেশে অনেক বেশি লোকের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার ভাব গড়ে উঠেছিলো।

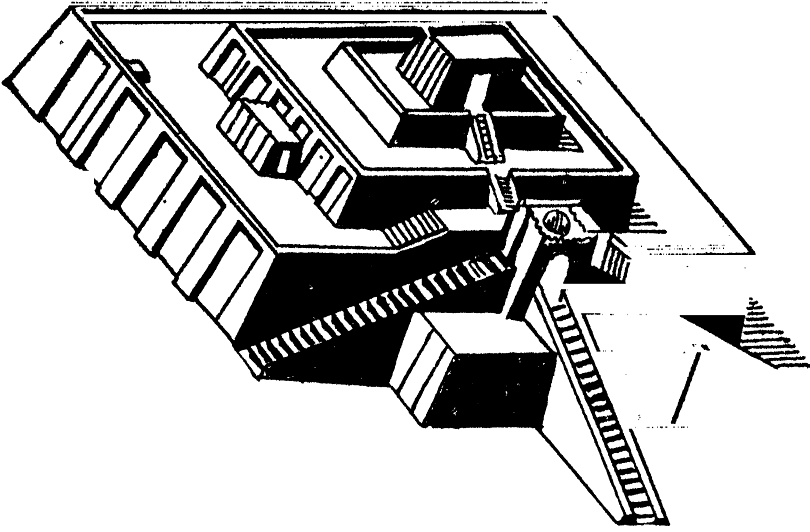
ইরেক, এরিদু, লাগাস্, উর্, প্রভৃতি জায়গায় সে যুগের আদিম যে সমস্ত বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবগুলোতেই এই

ব্যাপারটা চোখে পড়ে। বন্য প্রকৃতির হাত ছিনিয়ে চাষের জমি উদ্ধার করবার সেই প্রথম খাটুনি থেকে ধনসম্পদ সুখ ঐশ্বর্যে ভরা নগর-জীবনের বিকাশের প্রতিটি ধাপও এই জায়গাগুলোর স্তরে স্তরে আটকে আছে। এর সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইরেক্-এ।

ইরেক্-এর ইতিহাস

ইরেক্-এ খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেই পরের পর বসতির ধ্বংসস্তূপ মিলে প্রায় ৬০ ফুট উঁচু একটি ঢিবির সৃষ্টি হয়েছিলো। এখানে সবচেয়ে নিচের স্তরে, অর্থাৎ সবচেয়ে প্রাচীন যে বসতি, তাতে নতুন পাথরের যুগের একেবারে গোড়ার দিকের চাষীদের আদিম বসবাসের চিহ্ন সুস্পষ্ট। নলখাগড়ার পাটি এবং হাতে গড়া কাদামাটির ইট দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ির এই বসতি তারপর বাড়তে বাড়তে ক্রমশ একটি সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হয়েছে। আগে আমরা যে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোর কথা বলেছি, তার প্রায় সবগুলোই মোটামুটি চালু হয়েছে। তলা থেকে উপরের ৫০ ফুট পর্যন্ত ইবেক্-এর মোটামুটি অবস্থা ছিলো এইরকমের।

কিন্তু শেষ দশ ফুটে এসে, পণ্ডিতদের হিসাবে খ্রীষ্টের জন্মের তিনহাজার বছরের কিছু আগে, ইরেক-এর জীবনধারার মধ্যে বেশ একটা বড়ো পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। জরাজীর্ণ ভাঙা কুঁড়ে ঘরের বদলে এখন চোখে পড়ে প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো বাড়িঘর মন্দির। ঠিক মাঝখানে রয়েছে ২৪৫ ফুট লম্বা এবং ১০০ ফুট চওড়া পরিধি নিয়ে বিরাট একটি মন্দির। এই মন্দিরের লাগালাগি রয়েছে হাতে তৈরি ৩৫ ফুট উঁচু একটি কৃত্রিম পাহাড়, পরের যুগে যাকে "জিগ্‌গুরাট" (Ziggurat) বলা হতো। এই পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে আরেকটি ছোটো মন্দির। এর পরিধি হলো লম্বায় ৭৩



প্রাচীন সুমের-এর উর নগরেব জিগ্‌গুরাট এবং মন্দিব : খ্রীঃপূঃ ২১২৩

ফুট, চওড়ায় ৫৭ ফুট ৬ ইঞ্চি। কাদামাটির ইট দিয়ে তৈরি এই মন্দিরের দেয়ালগুলোকে চুনকাম করা হয়েছিলো। আর অনেক দূর দেশ থেকে ভালো ভালো কাঠ এনে এতে দরোজা-জানালা বসানো হয়েছিলো। বড়ো বড়ো মন্দির এবং কৃত্রিম পাহাড়শুদ্ধ বসতির এই বিরাট পরিধি, বাইরে থেকে আমদানি করা অজস্র জিনিসপত্র,—এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আদিম যুগের সেই সহজ সরল ছোট্ট গ্রামটি এখন আর নেই; এটি এখন ধনসম্পদ ঐশ্বর্য প্রাচুর্যে ভরা রীতিমতো একটা জাঁকালো নগর।

অবশ্য আজকালকার বড়ো বড়ো শহরের সঙ্গে এই নগরগুলোর মোটেই কোনো তুলনা চলে না; কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যে নতুন পাথরের যুগের সবচেয়ে বড়ো গ্রামের আয়তন ছ-সাত কাঠার বেশি ছিলো না, তা হলে এই নগরগুলো যে সে তুলনায় কি বিরাট ছিলো তার একটা আন্দাজ করা যায়। ইরেক-এর এই নগরটির মোট পরিধি ছিলো প্রায় দুই বর্গমাইল। ২২০ একর

আয়তন নিয়ে ছিলো উর্। তাছাড়া এক-একটা নগরের অধিবাসী-সংখ্যাও বড়ো কম ছিলো না। খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগেই লাগাস্, উম্মা এবং খাফাজা—এই নগরগুলোর মোট অধিবাসী-সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১৯০০০, ১৬০০০ এবং ১২০০০।

মন্দির ও দেবতার প্রাধান্য :

সুমের-এর এই প্রাচীন নগরগুলির প্রায় সবগুলোই এক ছাঁচে গড়া। মাঝখানে সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে কৃত্রিম পাহাড়শুদ্ধ বিরাট একটি মন্দির। নগরেব মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং সব চেয়ে দামি জিনিসপত্র দিয়ে মন্দিরটি সাজানো গোছানো। মন্দিরের বিরাট চত্বরের মধ্যেই রয়েছে গোলাঘব, অস্ত্রাগার এবং কারখানা। এ থেকে, এবং এই যুগের যে অসংখ্য লিখিত নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায় যে সুমেরদের এই নগরগুলির প্রায় সমস্ত ধনসম্পদ এবং জমিজমার মালিক ছিলো এক-একজন নগর-দেবতা। আব এই নগর-দেবতাদের পূজা-অর্চনা করা বা মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশুনা করবার ভার যাদের উপর ছিলো, সেই পুরোহিত শ্রেণীই ক্রমশ নগরদেবতার প্রতিনিধি হিসাবে নগরগুলির প্রধান হয়ে উঠেছিলো।

নগরদেবতাদের যে কি একচ্ছত্র আধিপত্য ছিলো, তার সব চেয়ে ভালো পরিচয় পাওয়া যায় লাগাস্ নগরের লিখিত নথিপত্র থেকে। লাগাস্-এর সমস্ত জমিজমা প্রায় ২০টি ছোটখাটো দেবতার মধ্যে ভাগ করা ছিলো; এদের সকলের উপরে সবচেয়ে বেশি জমির ভাগ ছিলো নগরের প্রধান দেবতা নিন্‌গির্স্‌-র। এই নগরদেবতার পত্নী দেবী বাউ-এর অধিকারে ছিলো প্রায় ১৭ বর্গ-মাইল জমি। বাউ-এর এই জমি চাষবাস করতো নগরের সাধারণ বাসিন্দারা—ফসলের ভাগ নিয়ে বা মজুরির বিনিময়ে। দেবী

বাউ-এর এই বিরাট সম্পত্তি দেখাশুনা করবার জন্য যেমন একদিকে ছিলো কর্মচারী, কেরানী ও পুরোহিতের দল, তেমনি অন্যদিকে নানারকম জিনিসপত্র তৈরি করবার জন্যও ছিলো অনেক কারিগর। রুটি তৈরি করবার জন্য ছিলো একুশ জন, এদের সবাইকে বার্লি দিয়ে মজুরি দেওয়া হতো; এদের সাহায্য করবার জন্য ছিলো সাতাশ জন মেয়ে ক্রীতদাস। ছজন ক্রীতদাসের সাহায্য নিয়ে পঁচিশ জন কারিগর পানীয় তৈরি করতো। দেবীর যে নিজস্ব ভেড়ার পাল ছিলো, সেগুলো থেকে পশম তৈরি করবার কাজে নিযুক্ত ছিলো চল্লিশ জন মেয়ে কারিগর। সুতো কাটা এবং তাঁত বুনবার জন্যেও ছিলো মেয়ে কারিগর। তাছাড়া ছিলো পুরুষ কর্মকার এবং আরো নানান কাজের অনেক কারিগর। এই সমস্ত কাজে যা কিছু হাতিয়ার-পত্র দরকার হতো, অর্থাৎ ধাতুর হাতিয়ার, লাঙল, লাঙল টানবার পশু, মাল বইবার গাড়ি, নৌকো, প্রভৃতি সবকিছুই দেবী বাউ-এর এই মন্দিরে মজুত থাকতো। সেগুলোও মন্দিরেরই সম্পত্তি ছিলো।

দুটি শ্রেণী

ব্যবসা-বাণিজ্যে কারিগরিতে সমৃদ্ধ, ধনসম্পদ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ সুমের-এর এই প্রাচীন নগরগুলোর প্রায় সবকিছুর ষোলো আনা মালিকানা ছিলো নগর-দেবতাদের। অর্থাৎ তাদের প্রতিনিধি হিসাবে বিশিষ্ট একটি পুরোহিত শ্রেণীর। এই নগরগুলোর জীবনধারায় দুটি বিপরীত বিশিষ্ট দিক ছিলো। একদিকে ছিলো এই পুরোহিত শ্রেণী—সুখ সম্পদ ঐশ্বর্যে বিলাসে যাদের জীবন কাটতো; আরেকদিকে ছিলো সাধারণ চাষী, কারিগর এবং ক্রীতদাস শ্রেণী—দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগের মধ্যেই যাদের জীবন কেটে যেতো। লাগাস্-এর ওই লিখিত হিসেব-পত্র থেকেই

জানা যায় যে, যেখানে সাধারণ একটি চাষী কখনোই আড়াই একরের বেশি জমি পেতো না, সেখানে কোনো কোনো পুরোহিতের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ পঁয়ত্রিশ একরের বেশি ছিলো। ভাগচাষী এবং দিন-মজুররা প্রায় কিছুই পেতো না। মন্দিরে যে সব কারিগররা কাজ করতো তারা তাদের খাটুনির বিনিময়ে স্বল্পমাত্র বার্লি মজুরি পেতো। আর ক্রীত-দাসদের যে কি হাল ছিলো তা না বললেও চলে; কষ্টেস্বষ্টে দুবেলা পেটের ভাতও তাদের জুটতো কিনা সন্দেহ!



প্রাচীন সুমের-এর জনৈক মহিলার মূর্তি। মহিলাটি যে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের তা বুঝতে কষ্ট হয় না। খ্রীঃ পূঃ ২২০০।

দেবতার প্রতিনিধি এই পুরোহিতরা দেবতার সমস্ত সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তি বলেই মনে করতো। নানারকম অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ তারা চালাতো। সে যুগের সেই লিখিত নথিপত্রের মধ্যে আছে যে তারা যা খুশি তাই করতে পারতো। গরিবের ঘর থেকে দাম না দিয়ে কাঠ নিয়ে যাওয়া, গরিবের বাড়িঘর দখল করে নেওয়া, অধীন লোকদের ভালো ভালো জিনিসপত্র এবং পশু বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া—ক্ষমতামদমত্ত পুরোহিতদের হামেশা এই সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী এই নথিপত্রেই লেখা আছে।

রাজায় রাজায় ঝগড়া

অর্থাৎ নগরসভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশে অগ্রসর হয়ে সুমের-এর মানুষের সমাজব্যবস্থার মধ্যে বেশ একটা বড়ো ফাটলের সৃষ্টি

হয়েছিলো। সমাজ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। খ্রীষ্টের জন্মের আগে তিনহাজার বছরের কাছাকাছি সুমের-এর এই সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের আবির্ভাবের আর বেশি দেরি ছিলো না। এই সময় থেকেই শুরু করে আমরা দেখতে পাই যে এক-একটা নগরে খুব সম্ভব ঐ পুরোহিতদেরই একজন ক্রমশ নগরের প্রধান হয়ে উঠছে। প্রথম প্রথম এদের পদবী ছিলো এন্‌সি (সুমের ভাষায় যা লেখা হতো পাটেশী বলে) বা ইস্‌সাক্‌কু। এর অর্থ ছিলো দেবতার পার্থিব প্রতিনিধি। পরে ক্ষমতা প্রতিপত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেকে লুগাল্ বা মহামানব, অর্থাৎ রাজা উপাধিও ধারণ করতে লাগলো। সমাজের অন্যান্যদের তুলনায় এরা যে কি বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী ছিলো, তা এই সময়কার লাগাস্ নগরের বিবরণী থেকে জানা যায়। এখানকার ইস্‌সাক্‌কু বিপুল পরিমাণ খাজনা, ভেট এবং অন্য অনেক জমিজমা ছাড়াও শুধু দেবী বাউ-এর সম্পত্তি থেকেই ৬০৮ একর জমির পুরো ফসল পেতো।

সুমের এবং আক্কাদ-এর জীবন এবং সভ্যতার প্রধান ভিত্তিই ছিলো টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ নদী দুটির জল। জলসেচের ভালো ব্যবস্থা করলে তবে চাষবাসের কাজ চলতো। তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে নিতান্ত দরকারী অনেক জিনিসপত্রের জন্য দূর দূর দেশ থেকে আমদানি বাণিজ্যের উপর নির্ভর করতে হতো। কাজেই জমিজমা এবং নদীর জল নিয়ে, এবং বাইরের ওই আমদানি বাণিজ্যের সম্পদ নিয়ে এই নগরগুলোর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লাগতো। শুধু লাগতো বললে কম করে বলা হয়, সে যুগের সুমের এবং আক্কাদের ইতিহাসই হলো এই নগরগুলোর মধ্যে একটানা ঝগড়া এবং যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস।



সুমেরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আক্কাদ-এর বীরবা জয়ী হয়েছে।

লাগাস্

একটানা এই যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য থেকে খ্রীঃপূঃ ২৬০০-২৫০০ সালের মধ্যে লাগাস্-এর একটা প্রাধান্য আমাদের চোখে পড়ে। এখানে প্রথম রাজা উর্-নিনা বা উর্-নান্সে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তার সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি হয়েছিলো তাঁর নাতি ইয়ান্নেটুম্ বা এণ্টেমিনা-র আমলে। ইনি তাঁর বিজয়কাহিনী খোদিত করে যে শিলালিপি রেখে গিয়েছিলেন, সেই "stele of the Vulture" নামে পরিচিত বিখ্যাত শিলালিপিটি থেকে আমরা জানতে পাবি যে একখণ্ড উর্বর জমির অধিকার নিয়ে লাগাস্ এবং উম্মা-র মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে রেষারেষি চলছিলো; উম্মা-র পক্ষ থেকে সীমানা-ভঙ্গের উপক্রম হলে, ইয়ান্নেটুম্ উম্মা-র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে উম্মা-কে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। উম্মা ছাড়াও কিস্, উর্ এবং ইরেক্ নগরগুলোর উপরও তিনি লাগাস্-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য ইয়ান্নেটুম্-এর দুর্ধর্ষতায় একদিকে যেমন গোটা সুমের-দেশের উপর লাগাস্-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, অন্যদিকে তেমনি লাগাস্-এর রাজবংশ এবং পুরোহিত

অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর হাতে গোটা সুমের-এর বিপুল ধনসম্পদ এসে জমা হতে লাগলো। এর ফলে পরবর্তী সময়ে লাগাস্-এর শাসক-শ্রেণী বিলাস-ব্যসনে একেবারে ডুবে গেলো। দেশের মধ্যে অত্যাচার, পীড়ন এবং শোষণ বাড়তে লাগলো। এতোই বেড়ে উঠেছিলো যে, খুব সম্ভব সেই জন্যই এই বংশেরই পরবর্তী একজন রাজা উর্-কাগিনা প্রায় ২৪৩০ খ্রীঃ পূর্বে আইন করে শোষণ পীড়ন বন্ধ করবার কিছু কিছু চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু এই সময়েই পুরোনো শত্রু উম্মা-র সঙ্গে লাগাস্-এর বিরোধটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। উম্মা-র রাজা লুগাল্ জাগ্গিসি লাগাস-কে পরাজিত করে ইরেক্-এ তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

লুগাল জাগ্গিসি-ও সে যুগের একজন বিরাট যোদ্ধা ছিলেন : কারণ সুমের এমন কি সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার উপর তিনি তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর পরে খ্রীঃ পূঃ ২৪০০-তে তিনি কিস্-এর রাজা সার্-রু-কিন্ বা সারগন্ কর্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত হন।

আক্কাদ্-এর সারগন

সেমিটিক জাতি থেকে উদ্ভূত সারগন সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে খ্যাতনামা রাজা। এঁর জন্ম সম্বন্ধে যে নানারকম কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাতে বলা আছে যে তিনি ছিলেন জারজ সন্তান। এক বাগানের মালী তাঁকে শিশুকালে লালন করেন। বয়স হলে তিনি কিস্-এর রাজা উর্-জমামার পরিচারক-পদে নিযুক্ত হন ; এই পদে নিযুক্ত থাকতে থাকতে তিনি উর্-জমামাকে অপসারণ করে কিস্-এর সিংহাসন লাভ করেন। তারপর তিনি ইরেক্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, এবং



আক্কাদের রাজা সারগন-এর ব্রোঞ্জ-মূর্তি

লুগাল জাগ্‌গিসিকে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় বন্দী করে নিপ্‌পুর-এর এন্‌লিল্‌ দেবতার মন্দিরে নিয়ে আসেন।

সারগন একটি নতুন রাজধানী গড়ে তোলেন। এর নাম হলো আগেদ্‌ বা আক্কাদ। আক্কাদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সারগন এ যুগের বিশ্ববিজয়ী ছিলেন। কারণ, উর্‌ লাগাস্‌ উম্‌মা প্রভৃতি সুমের এবং আক্কাদ-এর সমস্ত নগরগুলি তো বটেই, তিনি এমনকি মিশর এবং সিন্ধু উপত্যকা ছাড়া সে যুগের প্রায় সমগ্র পরিচিত জগতের উপরও নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর

শিলালিপি থেকে জানা যায় যে পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং ইরান থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং ক্রীট, এমনকি গ্রীস-এর উপকূল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিলো। সিন্ধু সভ্যতার উপর তাঁর আধিপত্যের কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, এই সভ্যতার সঙ্গে যে সারগনের আমলের ব্যাবিলোনিয়া সভ্যতার ব্যবসা-বাণিজের নিবিড় যোগাযোগ ছিলো, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রাচীন এই নগরসভ্যতার যুগে সারগন্-এর আমলের আক্কাদ-ই ছিলো সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। আক্কাদ-এর রাজসভা ঐশ্বর্যসমৃদ্ধে ছিলো অতুলনীয়। একটি শিলালিপিতে সারগন নিজেই এই বলে গর্ব করেছেন যে রাজ-বাড়িতে দৈনিক ৫৪০০ লোক আহার করতো।

প্রায় ৫৬ বছর রাজত্ব করবার পর সারগন-এর মৃত্যু হয়। শেষদিকে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো।

নারম্-সিন্

সারগনের পরে আক্কাদ রাজবংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা হলেন নারম্-সিন্। খ্রীঃ পূঃ ২৩২০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২২৮৪ পর্যন্ত প্রায় ৩৭ বছর হলো তাঁর রাজত্বকাল। ইনি "আক্কাদ-এর ঈশ্বর" এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। একমাত্র ক্রীট বাদে তিনি তাঁর পিতামহ সারগন্-এর পুরো সাম্রাজ্যের উপর তাঁর আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রান্তে অনেকগুলি সামরিক ঘাঁটিও তৈরি করেছিলেন। সুসা-তে তাঁর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এই শিলালিপিতে নারম্-সিন্ ছবি এবং লেখায় তাঁর বিজয়-কাহিনী অবিস্মরণীয় করে রেখে

গেছেন। এই শিলালিপিটি সে যুগের ব্যাবিলোনিয়ার সেমিটিক সভ্যতার ভাস্কর্য-শিল্পের উৎকর্ষস্বরূপ। নারম্-সিন্-এর আমলেই ব্যাবিলোনিয়ার পূর্বে এলাম-এর সঙ্গে নারম্-সিন্-এর একটি সন্ধি-চুক্তি হয়। এলামাইট ভাষায় লিখিত দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে এই সন্ধিচুক্তিটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সন্ধিচুক্তি।

আক্কাদ রাজবংশের এই চূড়ান্ত সমৃদ্ধির সময়ে উত্তরে অস্সুর নামে একটি নগরের পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুকাল আগেই এই নগরটি গড়ে উঠেছিলো। এর প্রধান দেবীর নাম ছিলো ইস্তার। পরবর্তী কালে এই নগরটির সঙ্গে জড়িত হয়েই মেসোপটেমিয়ার দুর্ধর্ষ আসীরিয়দের উদ্ভব হয়েছিলো।

সারগন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আক্কাদরাজবংশেব অভ্যুত্থান ও পতনে প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাসের একটি অধ্যায় শেষ হলো। এর পর প্রায় পাঁচশো বছর ধরে একবার ইরেক, একবার লাগাস্, একবার উর্—এই নগরগুলোর স্বল্পস্থায়ী প্রাধান্য চোখে পড়ে। এদের মধ্যে লাগাস্-এর রাজা গুডিয়া এবং উর-এর রাজা উর-নাম্মু (খ্রীঃ পূঃ ২১২৩—২১০৬) বিশেষভাবে বিখ্যাত। গুডিয়ার আমলেই প্রাচীন সুমের-এর শিল্প, কলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছিলো। গুডিয়ার রাজত্বকেই প্রাচীন সুমের-এর স্বর্ণযুগ বলা যায়। উর-এর রাজা উর-নাম্মু তাঁর বিজয়কীর্তির স্মারক হিসাবে উর-এর বিশ্ববিখ্যাত বিরাট জিগ্গুরাট্টি তৈরি করিয়েছিলেন। ২০০ ফুটের চেয়ে কিছু বেশি লম্বা এবং ১৪০ ফুটের বেশি চওড়া ভিত্তিব উপর তিনতলা এই বিরাট মন্দিরটিই পরে "টাওয়ার অফ্ ব্যাবেল" নামে পরিচিত হয়েছিলো।

এই যুগে পূর্ব, উত্তর এবং পশ্চিম থেকে এলামাইট, গুটিয়ান ও অ্যামোরাইট্রা বারবার ব্যাবিলোনিয়ায় অভিযান চালিয়েছিলো। এদের অভিযান এবং নগরগুলোর মধ্যে ক্রমাগত ঝগড়া-বিবাদের

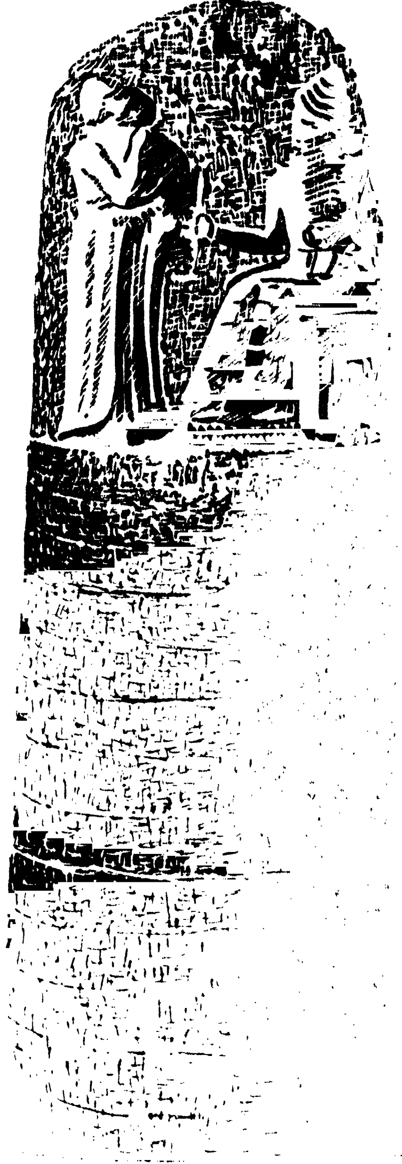
ফলে গোটা এই যুগটা ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাস অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো।

ব্যাবিলোনিয়ার হাম্মুরাবি

এই অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে উত্তর ব্যাবিলোনিয়ায়, অর্থাৎ আক্কাদের একটি নগর ব্যাবিলন অ্যামোরাইট্‌দের নেতৃত্বে ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো। এইখানে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই রাজবংশই সুমের এবং আক্কাদ-কে ঐক্যবদ্ধ করে প্রাচীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ব্যাবিলোনিয়া নামটি আমরা এর আগে ব্যবহার করলেও সত্যিকারের ব্যাবিলোনিয়া-র উৎপত্তি হয়েছিলো এই সময় থেকেই। এই রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা হাম্‌মুরাবি ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাসে এই যুগান্তকারী ঘটনার নায়ক।

খ্রীঃ পূঃ ১৭৯১ থেকে ১৭৪৯ পর্যন্ত প্রায় ৪৩ বছর হাম্‌মুরাবি ব্যাবিলোনিয়ার রাজা ছিলেন। সমগ্র মেসোপটেমিয়া এবং ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম এশিয়ার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে তিনি "সর্বাধিপতি" উপাধি ধারণ করেন।

ছোটো ছোটো স্বতন্ত্র নগরগুলির একটানা ঝগড়া-ঝাঁটিতে কন্টকিত ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাসে হাম্‌মুরাবি-ই প্রথম এদের স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে একটি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। গোটা সাম্রাজ্যের উপর চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। তাঁর নিজের লেখা যে সমস্ত চিঠিপত্র এবং নির্দেশনামা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে, বিরাট এই সাম্রাজ্যের ছোটো-বড়ো অসংখ্য ব্যাপারে হাম্‌মুরাবি নিজেই প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতেন। যেমন, "ইরেক নগরের একটি খাল পরিষ্কার করবার নির্দেশ" "উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের নির্দেশ", "জনৈক মহাজন কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত সম্পত্তির প্রত্যর্পণের নির্দেশ," "মন্দিরের রাজস্ব



হাম্‌মুরাবির আইন সংহিতা। পাথরের গায়ে যে অসংখ্য দাগ চোখে পড়ছে, ওইগুলোই হলো প্রাচীন আক্কাদ ভাষার কিউনিফর্ম লিপি। উপবে দেখানো হয়েছে যে সূর্যদেবতা যেন হাম্‌মুরাবিকে ব্যাবিলোনিয়ার ওই আইন-সংহিতা উপহার দিচ্ছেন।

তছরুপ করা সম্বন্ধে তদন্ত," ইত্যাদি হাম্মুরাবি-র আমলের বহু চিঠিপত্র এবং নির্দেশনামা থেকে বোঝা যায় প্রতিটি বিষয়ে তাঁর কী রকম কড়া নজর ছিলো।

কিন্তু যে কারণে হাম্মুরাবি-র নাম অমর হয়ে আছে তা হলো ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা আক্কাদ-ভাষায় লিখিত তাঁর বিখ্যাত "আইন সংহিতা"। ব্যাবিলনের দেবতা মার্ডুক-এর মন্দিরে একটি শিলালিপিতে খোদিত করে এই আইন সংহিতাটি রাখা হয়েছিলো। প্রায় ২৮২-টি অনুচ্ছেদে রচিত এই "আইন-সংহিতা"-য় হাম্মুরাবি সে যুগের ব্যাবিলোনিয়ার প্রচলিত প্রায় সমস্ত আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মানুষের সমগ্র ইতিহাসে আইন লিপিবদ্ধ করার নজির এই প্রথম। এই আইনগুলি থেকে আমরা সে যুগের ব্যাবিলোনিয়ার সমাজ জীবনের প্রায় পুরো পরিচয় পাই। সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো : স্বাধীন, প্রজা এবং ক্রীতদাস। যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করবার জন্য সৈনিকেরা জমিজমার অধিকার পেতো। হত্যা, চুরি, তহবিল তছরুপ, শিশু বা ক্রীতদাস অপহরণ ইত্যাদির জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের আইন-কানুনও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো। হাম্মুরাবি-র "আইন-সংহিতায়" সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, এই ছিলো হাম্মুরাবি-র আইনের মূল নীতি।

হাম্মুরাবির মৃত্যুর পর তাঁর ব্যাবিলোনিয়া সাম্রাজ্য বেশি দিন টিকে থাকতে পারে নি। কারণ এর কিছুকাল পরেই উত্তরের জাগ্রস্ পর্বতমালা থেকে ক্যাস্সাইট্ নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি ব্যাবিলোনিয়া অভিযান করে সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ার উপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যাবিলোনিয়ার উপর এদের এই প্রাধান্য প্রায় ছশো বছর ধরে টিকে ছিলো (খ্রীঃ পূঃ ১৭৪০-১১৬৪)।

এই ক্যাস্‌সাইট্‌-রা ছিলো ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের প্রধান দেবতার নাম ছিলো "সূর্যস্‌" ; আমাদের ভারতবর্ষের বৈদিক আর্যদের "সূর্য"-র সঙ্গে এর মিল সহজেই চোখে পড়ে। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর যে বিভিন্ন শাখা এই সময় পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিলো, ক্যাস্‌সাইট্‌রা ছিলো তাদের অগ্রদূত। এদের কথা আমরা পরে আলোচনা করবো।

হাম্‌মুরাবির রাজবংশের আমলেই প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায় শেষ হলো।

সুমের এবং আক্কাদ, এবং পরের যুগের ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাসের ঘটনাবলীর সনতারিখ নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানারকম মতভেদ আছে। সাম্প্রতিক প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য গবেষণার ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতরা যে সনতারিখ অনুসরণ করেন। তাঁদের সেই সিদ্ধান্তকেই মোটামুটি অনুসরণ করে আমরা এ অধ্যায়ের সনতারিখ ব্যবহার করেছি। প্রাচীনতর পশ্চিম-এশিয়া-বিশারদরা যেমন হল্‌ প্রভৃতি অবশ্য ভিন্ন সনতারিখ ব্যবহার করতেন। তাঁদের মতানুযায়ী সুমের এবং আক্কাদ-এর ইতিহাস আরো ২১২ বছর পিছন থেকে শুরু করতে হয় ; অর্থাৎ হাম্‌মুরাবি-র রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ২০০৩-১৯৬১ পর্যন্ত ছিলো বলে ধরে নিতে হয়। আমরা মোটামুটি আধুনিক গবেষণাকেই প্রামাণ্য বলে মনে করি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মিশর

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে বিশাল সাহারা মরুভূমির গা ঘেঁষে লম্বালম্বি যে অঞ্চলটি, তারই নাম হলো মিশর। নতুন পাথরের যুগের বিপ্লব সাধন করে এই দেশের মানুষ সেই প্রাচীন যুগে এখানে একটি বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। মিশরের এই প্রাচীন সভ্যতা যুগের পর যুগ মানুষের মনে একটি পরম বিস্ময় হয়ে রয়েছে।

সভ্যতার উৎস?

সুদীর্ঘকালের চেষ্টায় বন্য এবং বর্বর অবস্থা অতিক্রম করে মানুষ যখন সভ্যতার রাজপথে এসে দাঁড়ালো, তখন প্রাচীন মিশরের মানুষ মিশরের বুকে খুব তাড়াতাড়ি সভ্যতার একটি চূড়ান্ত রূপ সৃষ্টি করতে পেরেছিলো। ধনসম্পদ এবং ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধিতে, সমাজ-সংগঠন এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে বিকাশ এখানে সেই প্রাচীন যুগে ঘটেছিলো, মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার তুলনা অল্পই মেলে। এই কারণেই আধুনিক কালের পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের অনেকেই মনে করেন যে মানুষের গোটা সভ্যতার আসল উৎসই হলো মিশর। এলিয়ট্ স্মিথ, পেরী প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের মত হলো এই যে প্রাচীনকালের এই মিশরেই মানুষের সভ্যতার প্রথম সূচনা হয়েছিলো। মিশর থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে এই সভ্যতা ক্রমশ ছড়িয়ে

পড়েছিলো। প্রচুর তথ্য-প্রমাণ দিয়ে তাঁরা এই মত ঘোষণা করলেও, অন্যান্য বহু পণ্ডিত কিন্তু এটা মানতে রাজী নন। এঁরা বলেন যে, সভ্যতার অগ্রগতির পথে বিভিন্ন সভ্যজাতি ও দেশের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চয়ই ঘটেছিলো, এবং সেটা খুব স্বাভাবিকও ছিলো। তাছাড়া, এই যোগাযোগ এবং সহযোগিতার যথেষ্ট প্রমাণও নানাদিক থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে মিশর থেকেই মানুষের সমস্ত সভ্যতার শুরু হয়েছিলো—এ কথাটা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কারণ, এই যুগেরই বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে এমন আরো অনেক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মিশরের প্রভাব ছাড়াই এই সব অঞ্চলে আলাদা আলাদা ভাবে এক-একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধু উপত্যকায়, হোয়াং হো বা পীত নদীর উপত্যকায়, এবং মিশরে—সভ্যতার প্রথম বিকাশের এই সবগুলো অঞ্চলেই আলাদা আলাদা ভাবে নতুন পাথরের যুগের বিপ্লব ঘটে গিয়েছিলো; তাই কিছু আগে পরে এই সবগুলো অঞ্চলেই আলাদা আলাদা ভাবেই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিলো। তবে এদের পরস্পরের মধ্যে যে খানিকটা আদানপ্রদান হতোই, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

নীল নদী

মিশর দেশটি কিন্তু আসলে খুব ছোটো। উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, দক্ষিণে নিউবিয়ার মরুভূমি এবং পশ্চিমে লিবিয়ার মরুভূমি—এই চার সীমানার মধ্যে লম্বা একফালি দেশটিই হলো মিশর। আর, মিশর বলতে প্রধানত যা বোঝায়, অন্তত সে যুগের মিশরীদের কাছে নিশ্চয়ই যা সবচেয়ে বেশি বোঝাতো, তা হলো নীল নদী। নীল নদীর উৎস হলো দক্ষিণে সুদূর অ্যাবিসিনিয়ার

প্রাচীন মিশর ও নিকটবর্তী অঞ্চল

BRITISH STATUTE MILES 69'16=1 DEGREE

০ ১০০

পাহাড়ে। সেইখান থেকে এই শীর্ণ ক্ষীণ স্রোতটি দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি এবং রুক্ষ পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে পথ করে নিয়ে ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে ফাঁপতে-ফাঁপতে সোজা উত্তরমুখী হয়ে প্রায় চার হাজার মাইল অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। চারদিকের ধূ-ধূ মরুভূমির মধ্যে নীল নদী যেন সবুজ শ্যামল একটি প্রাণের প্রবাহ। মরুভূমির রাক্ষসী গ্রাস থেকে মাটিকে ছিনিয়ে নিয়ে, তাকে রসসিঞ্চিত করে তার বুকে জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে, এই নদী যেন তার দুহাত দিয়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে। যুগ যুগ ধরে নীল নদী মিশরের মাটির এই সবুজ সজীবতা বাঁচিয়ে আসছে—মরা ধুলোবালির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে আসছে উদ্দাম জীবন। মিশরের মাটিতে রুক্ষ মরুভূমি এবং শ্যামল মাটির, মৃত্যু এবং জীবনের এই সংগ্রাম এতোই তীব্র যে মিশরে এমন অনেক জায়গাও আছে যেখানে



নীল নদীকে দেবতার আসনে বসিয়ে মিশরের মানুষ তার পুজো শুরু করেছে

এক পা মরুভূমিতে এবং আরেক পা সবুজ মাটিতে রেখে দাঁড়ানো পর্যন্ত যায়। মিশরের মানুষের কাছে তাই নীল নদীই হলো জীবনের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। তাদের ধ্যান-ধারণায়, ভাবনাচিন্তায়, কাজকর্মে—সব কিছুতেই নীল নদী জড়িয়ে আছে। সেকালে গ্রীকরা তাই মিশরকে "নীল নদীর দান" বলেই অভিহিত করতো।

অ্যাবিসিনিয়ার পাহাড় থেকে শুরু হয়ে বহুদূর পর্যন্ত নীল নদী কিন্তু মানুষের তেমন কাজে লাগে না। কারণ, আগেই বলেছি দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নীল নদীকে পথ করে বয়ে আসতে হয়েছে। গতিপথে ছোটোখাটো পাহাড় পড়ায় মাঝে মাঝে তার বুকে অনেকগুলি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরাজিতে এইগুলিকে ক্যাটারাক্ট বলে। গোটা নীল নদীর গতিপথে এই ধরনের ছটি ক্যাটারাক্ট আছে। এই অঞ্চলে নীল নদীর ধারা খুব ক্ষীণ ; এবং পাহাড় ও মরুভূমির মধ্যে আটকে থাকায় এখানে তার জীবনদায়িনী শক্তিও তেমন কিছু নয়। তাছাড়া, ক্যাটারাক্টগুলোর ফলে নৌকোপথে যাতায়াত করাও চলে না। ক্যাটারাক্টগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম ক্যাটারাক্টের পর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বাকি পথটুকু নীল নদীর গতিপথ খুব স্বচ্ছন্দ। এইখান থেকেই তার সত্যিকারের জীবন শুরু। এইখান থেকেই মিশরেরও শুরু। প্রথম ক্যাটারাক্টের কাছেই সেই প্রাচীনকালে যে শহরটি গড়ে উঠেছিলো তার নাম "আসোয়ান্", মিশরী ভাষায় যার মানে হলো "বাজার"। খুব সম্ভব, দক্ষিণের নিউবিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের বেদুইনদের সঙ্গে প্রাচীন মিশরীদের জিনিসপত্র লেনদেন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা হিসাবেই মিশরের দক্ষিণ প্রান্তের এই শহরটি গড়ে উঠেছিলো।



প্রাচীন মিশরের হাট-বাজারের দৃশ্য

আসোয়ান থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত নীল নদীর গতিপথের দুধারের যে জমি, মিশর বলতে এইটুকুই বোঝায়। লম্বায় ৪৯০ মাইল এবং সবচেয়ে বেশি চওড়া যেখানে, সেখানে মাত্র দশ মাইলেরও কিছু কম। সবসুদ্ধ গোটা মিশরদেশের আয়তন দশ হাজার বর্গমাইলও নয়, এর মধ্যে আবার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ আরো কম—প্রায় ইটালির সিসিলি দ্বীপের সমান। ভূমধ্যসাগরে পড়বার কিছু আগে থেকে নীল নদী অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটা ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন সুমের দেশের মতো ব-দ্বীপের এই অঞ্চলটিও অনেক পরে সমুদ্রের বুক থেকে উঠেছিলো। কারণ এখানে মাটি খুঁড়ে দেখা গেছে যে মাত্র ৩৩ থেকে ৩৮ ফুট পর্যন্ত হলো এখানকার মাটির গভীরতা।

দুদিকে সমুদ্র এবং দুদিকে মরুভূমি, আর রুক্ষ আবহাওয়া—এই আবেষ্টনীর মধ্যে নীল নদীর কোল ঘেঁষে সেই আদিম যুগে যে মানুষের দল এখানে বসবাস শুরু করেছিলো, তাদের জীবনে এইটুকুই ছিলো গোটা জগৎ। এর বাইরে পৃথিবীর অন্য মানুষ-জনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ শুরুতেই তেমন ছিলো না।

তাছাড়া, প্রকৃতির বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করে এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগহীন, নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত, মিশরের সেই আদিম অধিবাসীরা বোধ হয় তাই নিজেদের "রেমি" বলতো। "রেমি" মানে মানুষ। অর্থাৎ, মানুষ বলতে ওরা শুধু নিজেদেরই বোঝাতো। শুধু তাই নয়, নদী বলতেও ওরা শুধু মিশরের নদীটির কথাই বুঝতো। তাই তাদের জগতে যে একটিমাত্র নদী ছিলো, প্রাচীন নিশরীরা তাকে "হাপি" বলেই অভিহিত করতো। "হাপি" শব্দটির মানে হলো—নদী, শুধু নদী। "Nile" বা "নীল" নামটি পরের যুগে গ্রীকরা দিয়েছিলো।

শিকার সংগ্রহ থেকে চাষবাস

মিশরের এই আদিম মানুষরা যে কারা ছিলো তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। তবে চারদিকের ধূ-ধূ-করা রুক্ষ মরুভূমির মধ্যে ছোট্ট একফালি এই সবুজ দেশের সন্ধান পেয়ে যারা এখানে প্রথম বসবাস শুরু করেছিলো, তারা যে বহুকাল আগেই এখানে এসেছিলো, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ব-দ্বীপের মুখেই মাটি খুঁড়ে মাটির পাত্র, ইট, এমনকি মাথার খুলি পর্যন্ত যে সব জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে, তা থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে অন্তত ষোলো হাজার বছর.আগেই এখানে মানুষের বসবাস ছিলো।

শিকার এবং সংগ্রহের অবস্থা থেকে চাষবাসের উপর নির্ভরশীল সমাজ—মিশরের মাটিতে এই ক্রমপরিবর্তনের ধারাটিও চোখে পড়ে। ফাইয়ুম এবং মেরিম্‌ডে-র কথা আমরা আগেই বলেছি। এই দুটি অঞ্চলে প্রাচীন যুগের মানুষের যে বসতিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে শিকার এবং সংগ্রহের উপযোগী পুরোনো পাথরের



জলাজঙ্গলে প্রাচীন মিশরের মানুষ শিকার করছে

যুগের হাতিয়ার থেকে চাষবাসের পক্ষে উপযোগী হাতিয়ারের ধারাবাহিক আবির্ভাব বেশ সুস্পষ্ট। তাছাড়া নীল নদীর দুধারে গোটা মিশর জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা আরো অসংখ্য যে সব বসতি এবং কবর আবিষ্কার করেছেন, সেগুলো থেকেও বোঝা যায় যে চাষ-বাসই ক্রমশ জীবনযাত্রার প্রধান ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। নেগাদা, অ্যাবিডোস, এল্-আম্রা প্রভৃতি অঞ্চলের কবরগুলিতে পাথরের হাতিয়ারের পাশাপাশি তামা, রুপো, সোনা প্রভৃতি ধাতুর তৈরি জিনিসপত্রও পাওয়া গেছে। এই কবরগুলি খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগেকার। এগুলো থেকেই বোঝা যায় যে পুরোনো পাথরের যুগের শিকার এবং সংগ্রহের অবস্থা থেকে মিশরের মানুষ খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগেই কি বিরাট অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছিলো। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগেই মিশরের মানুষ যে ঢালাওভাবে বড়ো বড়ো জমিতে চাষবাস করতো, এই কবরগুলো থেকে পাওয়া লাঙল এবং কোদাল-ই হলো তার প্রমাণ। তাছাড়া মৃতদেহগুলির পেটে গম,



প্রাচীন মিশরে চাষবাসের কাজে মানুষ ব্যস্ত

বার্লি এবং ভুট্টার কণাও পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, তারা যে শুধু তামার ব্যবহার শিখেছিলো তাই নয়, সোনা রুপো প্রভৃতি ধাতু এবং হাড় চামড়া ইত্যাদি জিনিস দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্যের নানারকম জিনিসপত্রও তারা ব্যবহার করতো।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। সেটা হলো এই যে প্রাচীন যুগের মিশরের মানুষের যে বসতি এবং কবরগুলি নীল নদীর গোটা উপত্যকা জুড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবগুলোই চাষের জমি যেখানে শেষ হয়ে মরুভূমি শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সীমানায় অবস্থিত। নীল নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে এই ধরনের বসতি বা কবর খুব কমই পাওয়া যায়। এর কারণ কী?

নীল নদের বন্যা

এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা বেরিয়ে আসে, সেটাই হলো মিশর এবং নীল নদীর জীবনে আরেকটি প্রধান ঘটনা।

আমরা আগেই বলেছি যে চারদিকের রুক্ষ মরুভূমির মধ্যে নীল নদী যেন সবুজ শ্যামল প্রাণের একটি প্রবাহ। মরুভূমির গ্রাস থেকে যুগ যুগ ধরে কেমন করে, কী উপায়ে নীল নদী মিশরের মাটির এই সবুজ শ্যামলতা রক্ষা করে আসছে? এর উত্তর খুঁজতে যেতে হবে সুদূর অ্যাবিসিনিয়ার পাহাড় চূড়ায়, ছোট্ট একটি ক্ষীণ ধারায় যার কোল থেকে নীল নদী নেমে এসেছে। বর্ষার সময় এখানে যে প্রবল বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির অঢেল জল এই ক্ষীণ স্রোত বেয়ে নেমে আসে। হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতে করতে এই জল ক্রমশই বাড়তে থাকে, নীল নদী ক্রমশই ফেঁপে-ফুলে ওঠে, তারপর একটা সময়ে দুকূল ভাসিয়ে শুকনো খটখটে মাটিকে জলে জলে শান্ত স্নিগ্ধ করে কিছুদিন পরে আবার ফিরে যায়। উদ্বিগ্ন মানুষ তখন এসে সেই নরম শ্যামল মাটিতে বীজ বোনে। পলিমাটির নতুন আস্তর পড়ায় নিদারুণ উর্বর সেই মাটি মানুষকে ফিরিয়ে দেয় একশো দুশো গুণ বেশি ফসল। মানুষ নিশ্চিন্ত হয়, নীল নদী আবার কবে দুকূল ভাসাবে তার জন্য অপেক্ষা করে।

একবার নয়, দুবার নয়, স্মরণাতীত কাল থেকে বছর বছর নীল নদীতে এই ব্যাপারটি ঘটছে। প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম দিকে আসোয়ানের কাছে নীল নদীর জল বাড়বার চিহ্ন চোখে পড়ে, তারপর ক্রমশ বাড়তে-বাড়তে সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি এই জল সবচেয়ে বেশি বেড়ে ওঠে। গোটা অক্টোবর মাস ধরে এবং নভেম্বরের প্রথম কয়েকদিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলে; তারপর আস্তে আস্তে কমতে-কমতে কিছুদিনের মধ্যেই নীল নদী আবার তার সেই পুরোনো শান্ত মূর্তিতে ফিরে যায়। অক্টোবর মাসে আসুয়ানের কাছে নীল নদীর জল তার সাধারণ স্তর থেকে প্রায় ৫০ ফুট বেশি উঁচু হয়ে ওঠে, আরো উত্তরে কায়রোর কাছে সেটা তখন ২৫ ফুট উঁচু। পুরো একমাসেরও উপর নীল নদীর দুপাশে

বহুদূর বিস্তৃত জমিজমা এই জলে ডুবে থাকে। এই সময়ে গোটা মিশর দেশের চেহারাটা হয়ে দাঁড়ায় বন্যাপ্লাবিত একটি বিরাট অঞ্চলের মতো। মিশরের সেই প্রাচীন যুগের মানুষ বহুবছর ধরে বন্যার এই নিয়মিত আবির্ভাব লক্ষ্য করে একটা জিনিস শিখেছিলো। সেটা হলো স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য নদীর ধার ঘেঁষে বাড়িঘর করা অনর্থক; কারণ আগামী বছরের বন্যাতেই সে সব ভেসে যাবে। তাই তারা দূরে সরে গিয়ে, বন্যার জল যেখানে আর পৌঁছতে পারে না সেই মরুভূমির ধার ঘেঁষে স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করতো। আর যেহেতু মিশরের আবহাওয়া হলো রুক্ষ, এবং মরুভূমির সীমানার মাটিতে শুকনো বালির ভাগ বেশি, তাই এতো দিন পরে সেই প্রাচীন যুগের সমস্ত জিনিসপত্র, মৃতদেহের কঙ্কাল, এখনো পর্যন্ত প্রায় অবিকল অবস্থায় টিকে রয়েছে।

নীল নদী যখন প্রবল বেগে ফেঁপে-ফুলে উঠে চারদিক ভাসিয়ে দিতে আসতো, তখন তার চেহারা হতো ভয়ংকর। কিন্তু মিশরের মানুষ নীল নদীর এই ভয়ংকর রূপে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো না। কারণ এই ভয়ংকর রূপই তো মিশরবাসীর কাছে ছিলো একটা আশীর্বাদের মতো। নীল নদী ভয়ংকর রূপ না ধরলে তাদের যে মৃত্যু! তারা যে কি চোখে এই বন্যাকে দেখতো তার পরিচয় পাওয়া যায় সেই প্রাচীন যুগের লিখিত নথিপত্র থেকে। এক জায়গায় লেখা আছে :

"হাপি (অর্থাৎ নীল নদী) যখন উন্মত্তভাবে তার বুক আছড়ায়, তখন মানুষ ভয়ে কাঁপে। কিন্তু মাঠঘাট সব হেসে ওঠে, দুকূল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আর আকাশ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেমে আসে ; মানুষ শ্রদ্ধায় প্রণত হয়……"

বছর বছর নীল নদী যদি এইভাবে খেপে না ওঠে তাহলে কী

অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে তৃতীয় রাজবংশের একজন রাজা জেসের লিখে গেছেন :

"শোকেদুঃখে আমি অভিভূত হয়ে আছি; কারণ আমার আমলে পর পর সাতবছর ধরে নীল নদী দুকূল ভাসিয়ে দেয় নি। খামারে শস্য নেই, মাঠঘাট সব শুকিয়ে খটখট করছে···শিশুরা কাঁদছে, যুবকরা ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ছে, আর বৃদ্ধদের পায়ের জোর কমে যাচ্ছে—তারা ক্রমশ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে; হাতপা গুটিয়ে তারা মাটিতে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে···"

মানুষের কৃতিত্ব: জলসেচ

বছর বছর নীল নদীর বুকে এই বন্যার আবির্ভাব মিশরবাসীর জীবনে প্রকৃতির একটি বিরাট দান ছিলো সন্দেহ নেই; কিন্তু তাকে জীবনরক্ষার কাজে লাগানোর কৃতিত্ব পুরোপুরি মিশরের মানুষেরই প্রাপ্য। কারণ আগেই বলেছি, বন্যার জল থাকে মাত্র মাসখানেক। মিশরের নিদারুণ শুষ্ক রুক্ষ আবহাওয়ায় সেই মাটিকে সারা বছর জলসিঞ্চিত করে না রাখতে পারলে চাষবাস অসম্ভব। বন্যার জল সরে গেলে নরম পলিমাটিতে বীজ বোনা সম্ভবপর হলেও, সেই বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়ে উঠতো তখন মিশরের প্রচণ্ড খরার তাপ থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিলো। আর মিশরের মানুষ এই দুঃসাধ্য ব্যাপারকেও সম্ভব করে তুলেছিলো। কী ভাবে?

বন্যার জল যখন দুকূল ছাপিয়ে যেতো, তখন ছোটোবড়ো অসংখ্য খাল কেটে এবং বাঁধ বেঁধে মিশরের মানুষ এই জল আটকে রাখতো। তারপর বন্যা যখন নেমে যেতো, তখন খালবিলে ঐ আটকে-রাখা জল দিয়ে তারা সারা বছর চাষের কাজে জলসেচনের ব্যবস্থা করতো। খরার তাপে শস্য অকালে আর শুকিয়ে যেতে

পারতো না। জলসেচের এই ব্যবস্থায় সে যুগের মিশরবাসীরা দারুণ উন্নতিসাধন করেছিলো। আর তা না করে তাদের উপায়ও ছিলো না; কারণ এক কথায় বলতে হলে, জলসেচের এই ব্যবস্থার উপরেই তাদের চাষবাস, জীবন, ঐশ্বর্যসমৃদ্ধি, সভ্যতা—সবকিছুই নির্ভর করতো। মিশরের প্রাচীন ইতিহাসে তাই আমরা বারবার দেখতে পাই যে জলসেচ এবং চাষবাসের কাজই মিশরের রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের জীবনের প্রধান দায়িত্ব। খ্রীষ্টের জন্মের ২৮০০ বছর আগে প্রাচীন রাজবংশের একজন রাজাকে আমরা তাই দেখতে পাই যে তিনি একটি খোন্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাষের কাজ শুরু করছেন, কোদাল দিয়ে খালের মুখ কেটে তিনি জলসেচের ব্যবস্থা করছেন, আবার শস্য পেকে উঠবার পর তিনিই একটি কাস্তে নিয়ে প্রথম ফসল কাটছেন। হিয়েরোকন্‌পোলিস্ থেকে পাওয়া একটি ছবিতে দেখা যায় যে সেখানকার রাজা নিজের হাতে একা একটি খাল কেটে যাচ্ছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্-এর মতে প্রাচীন মিশরের প্রথম রাজা মেনেস্ যে গোটা মিশরের একচ্ছত্র রাজা হতে পেরেছিলেন তার প্রধান কারণই ছিলো এই যে একটি বাঁধ বেঁধে তিনি অত্যধিক বন্যার কবল থেকে ব-দ্বীপ অঞ্চলকে চাষযোগ্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সহযোগিতা : শৃঙ্খলা

নীল নদীর দুরন্ত বন্যাকে বশ করে তাকে জলসেচের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কাজে লাগানোর উপরেই মিশরবাসীর জীবন নির্ভর করতো। কিন্তু এই কাজটা তেমন সহজ ছিলো না; কারণ একজন দুজনের পক্ষে এটা করা নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিলো। খাল কাটতে বা বন্যার জলকে বাগে আনতে শয়ে শয়ে হাজার হাজার লোকের একযোগে

খাটুনি এবং সহযোগিতার প্রয়োজন হতো। আর, তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই মিশরের মানুষের মধ্যে নেহাত বাঁচবার তাগিদেই এই সহযোগিতা দেখা দিয়েছিলো। শুধু সহযোগিতা নয়, তাদের জীবনের সংগঠনের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা, একটা নিয়মিত ব্যবস্থারও খুব প্রয়োজন হয়েছিলো। কারণ, বন্যার জল নিয়মিত ভাবে বছরে ঠিক একটি সময়েই আসে ; আর ঠিক সেই সময়েই সকলে মিলে খাল কেটে, বাঁধ বেঁধে, বীজ বুনে চাষের কাজে না লাগলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই জন্যই মিশরে অতি প্রাচীন কালেই রক্তের উপর নির্ভরশীল পুরোনো জ্ঞাতিসম্পর্কের ক্ল্যান-ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে জমির চৌহদ্দিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন একরকমেব সমাজসংগঠন ব্যবস্থা দেখা দিয়েছিলো। এগুলোর নাম ছিল “নোম” (Nome)। অবশ্য এই নামটি পরবর্তী যুগের গ্রীকদের দেওয়া। আসল মিশরীরা একে কী বলে অভিহিত করতো তা আর এখন জানবার উপায় নেই। মিশরের প্রাচীন ইতিহাসে, রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত, এই “নোম”গুলিরই ছিলো প্রধান ভূমিকা। পরে আমরা এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করবো।

একটি রাষ্ট্র

মিশরের মানুষেব জীবনে নীল নদীর প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে মিশরে রাষ্ট্রসংগঠনও একটা বিশিষ্ট পথে বিকাশলাভ করেছিলো। এবং এই বিষয়ে সুমের-আক্কাদ-এর সঙ্গে মিশরের ছিলো একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য। সুমের-আক্কাদ-এ টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস্ দুটি নদী ছিলো। সারাবছর ধরে এ দুটো নদীতেই মোটামুটি জল থাকতো। তা ছাড়া এদের অনেকগুলো শাখাপ্রশাখা দেশের ভিতরে ভিতরে বয়ে গিয়েছিলো। মিশরের মতো অতো রুক্ষ আবহাওয়াও এখানে ছিলো না। কাজেই চাষবাসের কাজে জলের একটা প্রচণ্ড

অসুবিধা এখানকার মানুষ তেমন গভীরভাবে কখনই অনুভব করে নি। এই কারণেই সুমের-ব্যাবিলনে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র শহর-গুলোকে ভিত্তি করে অনেকগুলি ছোটো ছোটো স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিলো। মাঝে মাঝে কোনো একটি রাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ কোনো নায়ক বা রাজবংশ হয়তো পুরো দেশটিকে নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন; কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত সুমের-আক্কাদে ছোটো ছোটো এই শহর-রাষ্ট্রগুলিই নিজেদের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে ছিলো।

প্রাকৃতিক পরিস্থিতির জন্য মিশরে ঠিক এর বিপরীতভাবে রাষ্ট্রসংগঠনের বিকাশ ঘটেছিলো। শুরুতে ওই "নোম"-ভিত্তিক আলাদা আলাদা ছোটো ছোটো অনেকগুলি রাষ্ট্র মিশরেও ছিলো; কিন্তু নতুন পাথরের যুগের বিপ্লব ঘটে যাবার পর এই রাষ্ট্রগুলি খুব সম্ভব বেশিদিন টিকে থাকতে পারে নি; কারণ খ্রীষ্টের জন্মের ৩২০০ বছর আগেই দেখতে পাই যে সমগ্র মিশর জুড়ে একটি রাজা এবং তাঁর রাজবংশের একচ্ছত্র প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে মিশরে ওই একটিই মাত্র নদী, এবং সেই নদীতে বছরে একবার মাত্র বন্যা আসে। বন্যার সেই জলের উপর গোটা মিশরের জীবন নির্ভর করে। কাজেই বন্যার জল যাতে সমানভাবে সমস্ত অঞ্চলের চাষবাসের কাজে লাগানো যায়, সেটা একটা ভীষণ জরুরী সমস্যা ছিলো। যারা গোড়ার দিকে থাকে, তারা যদি বাঁধ বেঁধে খাল কেটে বন্যার বাড়তি সব জলটুকু আটকে রাখে, তাহলে পরের দিকে যারা থাকে তারা তো এক ফোঁটা জলও পাবে না। তা ছাড়া চারদিকে রয়েছে দুর্গম পাহাড় আর মরুভূমি—সেখানে থাকে দুর্ধর্ষ বর্বর বেদুইনদের দল। মিশরের মানুষ এত কষ্ট করে, এত খেটেখুটে মাটিতে যে সোনার ফসল ফলাতো, বর্বর বেদুইনরা সুবিধা পেলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে এক নিমেষে সমস্ত লুটপাট করে নিয়ে চলে যেতো মিশরের মানুষের সারা বছরের নিদারুণ খাটুনি সমস্ত ব্যর্থ হতো। হাজার হাজার বছর ধরে মিশরের সেই নতুন পাথরের যুগের শান্তিপ্রিয় চাষীরা এই সমস্ত সমস্যায় বারবার ভুগেছে। তাই একদিকে তারা যেমন নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলো, তেমনি তীব্রভাবেই একটি সুদৃঢ় সুসংগঠিত ঐক্যবদ্ধ শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রসংগঠনের প্রয়োজনও তাদের কাছে দেখা দিয়েছিলো। আর এই চাহিদা থেকেই মিশরে ছোটো ছোটো আলাদা রাষ্ট্রগুলির জায়গায় দেখা দিয়েছিলো গোটা মিশর জুড়ে একটি রাষ্ট্রের, একটি রাজ্যের।

মৃত্যুর পরে জীবন

মিশরের আদিম অধিবাসীদের জীবনে আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য ছিলো, সে বিষয়ে খানিকটা আলোচনা না করলে মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কিছুই বোঝা যায় না। এটি হলো তাদের একটি বিশ্বাস, যার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীকালের মিশরীদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিলো ; শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে মিশরের গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্র এই বিশ্বাসটিকে কেন্দ্র করেই যেন চালিত হতো।

আদিম এই মিশরীরা মনে করতো যে জীবনের যা যা লক্ষণ সেগুলো বন্ধ হয়ে গেলেই মানুষের সব শেষ হয়ে যায় না। আমরা যাকে মৃত্যু বলে মনে করি, মিশরীদের বিশ্বাসে সেটি ছিলো একটি সাময়িক বিরতি মাত্র—জীবনের পূর্ণচ্ছেদ নয়। বিরতির পরে আবার জীবন শুরু হবে ; যে মানুষটির মধ্যে জীবনের লক্ষণগুলো বন্ধ হয়ে গেলো, সে মানুষটি তার ফেলে-যাওয়া পুরনো জীবনের একই ধারায় আবার তার নতুন জীবন চালিয়ে যাবে। এ ঘটনাটি হলো জীবনের এক অধ্যায়ের শেষে নতুন আরেক অধ্যায়ের শুরু।

অবশ্য, মৃত্যুতেই শেষ নয়, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে—এ বিশ্বাসটি মানুষের খুবই আদিম বিশ্বাস। কারণ, পুরোনো পাথরের যুগের গোড়ার দিকে বন্য অবস্থার মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে যেটুকু আন্দাজ করা যায়, তাতে দেখা যায় যে তাদের মধ্যেও অল্পবিস্তর এই ধারণা নিশ্চয়ই ছিলো। আর হয়তো এই ধারণা থেকেই মৃত্যুর পরে দেহটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে না দিয়ে, তাকে খানিকটা জিইয়ে রাখার চেষ্টা তারা করতো। এই চেষ্টার ফলেই বোধ হয় আদিম মানুষের সমাজে মৃতদেহ কবর দেবার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিলো। কবর দেবার পদ্ধতি যে খুবই আদিম, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।



কবরের দেয়ালে সে যুগের মিশরের মানুষ যে সব ছবি এঁকে রাখতো সেগুলো থেকেই মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রাজার মৃতদেহ থেকে তাঁর আত্মাটি সিঁড়ি বেয়ে বাইরে থেকে ফিরে আসছে। আত্মাটিকে পাখির মতো কল্পনা করা হয়েছে।

কিন্তু, মিশরের মানুষের মনে এই বিশ্বাসটি এতো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার দুটি বিশেষ কারণ ছিলো। এক: নীল নদীর বাৎসরিক বন্যা। গরমের সময় যে নদী মৃতের মতো, সেই নদীই আবার নিয়মিতভাবে একটা সময়ে নবজীবনের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বন্যার জল নেমে গেলে প্রতি বছর নীল নদীর যেন

মৃত্যু হয়, কিন্তু সে মৃত্যুই একেবারে শেষ নয়, আবার সে পূর্ণ-জীবনের মধ্যে বেঁচে ওঠে। মিশরের মানুষের কাছে বছর বছর এটি একটি অবিচলিত নিয়মিত ঘটনা ছিলো। দুই: মিশরের প্রচণ্ড রুক্ষ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। বৃষ্টির পরিমাণ মিশরে খুব কম। দিনে ও রাত্রে মাথার উপরে দিগন্তপ্রসারিত আকাশ মোটামুটি শুভ্র এবং নির্মল। আর এই আকাশে সূর্যের উদয়-অস্তের নিয়মিত প্রাত্যহিক ঘটনা কোনো মিশরবাসীরই চোখ এড়াবার নয়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর প্রতি সন্ধ্যায় যে জ্বলন্ত সূর্য রক্তের ম্লান ছটায় মরে যায়, পরের দিন ভোরে আবার সে নতুন আলোয় বিকশিত হয়ে ওঠে, নতুন জীবনের প্রচণ্ড তেজে আবার সে এগিয়ে আসে। দিনের পর দিন এই ঘটনা ছিলো অবধারিত। এক্ষেত্রেও সেই একই দৃশ্য, একই অভিজ্ঞতা—সন্ধ্যাবেলার মৃত্যুতেই সব শেষ নয়, বিরতি মাত্র; সকালেই আবার নবজীবনের শুরু। সুতরাং, মিশরের সেই আদিম মানুষের মনে এই বিশ্বাসটি যে এতো তীব্রভাবে গেঁথে যাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এই বিশ্বাস থেকে তারা যে শুধু মৃতদেহটিকে অবিকল অবস্থায় রক্ষা করবার চেষ্টা করতো তাই নয়, মৃত্যুর পরের জীবনে তার যাতে কোনো বিষয়ে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য তার সমাধিতে প্রয়োজনীয় নানারকম খাবারদাবার জিনিসপত্র রেখে দেবার ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়েছিলো। আর ক্রমশ ক্রমশ এ দুটি বিষয়ের চর্চা মিশরের মানুষের জীবনে এতো প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়েছিলো যে শেষ পর্যন্ত এইটাই হয়ে উঠেছিলো জীবনের সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব। শেষ পর্যন্ত মিশরের মানুষের কাছে বর্তমানের এই জীবনটারই তেমন কোনো বিশেষ অর্থ ছিলো না। তারা মনে করতে শুরু করলো যে, মৃত্যুর পরের ভবিষ্যতের জীবনের প্রস্তুতিই



সমাধির ভিতরে এই সমস্ত পাত্রে মৃতের উদ্দেশে
খাবারদাবার, পানীয় ইত্যাদি রাখা হতো

হলো এই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য। এক কথায় বলা যায়, মৃত্যুর সাধনা, মৃত্যুর চর্চা—এই ছিলো ঐতিহাসিক যুগের মিশরের জীবনের অর্থ।

কবরের দেশ

তাই আমরা দেখতে পাই যে বেঁচে থাকতে থাকতেই মানুষ এখানে তার নিজের সমাধি তৈরি করবার চিন্তায় মশগুল। রাজারাজড়া বড়লোকদের জীবনে তো এটি ছাড়া ভাববার কোনো অবকাশই ছিলো না। যে দিন থেকে অভিষিক্ত হলেন, সেদিন থেকে রাজার একমাত্র চিন্তা, একমাত্র লক্ষ্য হলো—কিভাবে তিনি তাঁর সমাধি তৈরি করবেন, সেই সমাধিতে মৃত্যুর পরের যে জীবন শুরু হবে তার জন্য দরকারী কতো অসংখ্য জিনিসপত্র তিনি সেখানে রাখবেন। এর ফলে আধুনিক কালে মিশরে একটি বড়ো আশ্চর্য ঘটনা চোখে পড়ে। প্রাচীন মিশরের যে ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বছর ধরে সে যুগের পৃথিবীতে একটা প্রচণ্ড ছাপ রেখে দিয়েছিলো,

সেই মিশরের সাধারণ বাড়িঘর বা রাজা ও বড়োলোকদের সৌধ-প্রাসাদের সামান্যতম ধ্বংসস্তূপও আজ চোখে পড়ে না। এমনকি, মেম্ফিস্, থিব্স্ প্রভৃতি সে যুগের ইতিহাস-বিখ্যাত শহরগুলির লেশমাত্র চিহ্নও আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ যে কোনো জায়গায় মিশরের মাটি খুঁড়লেই যা বেরিয়ে আসে সেটা হলো সে যুগের কবরখানা। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে শুধু কবরখানা আর তার মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত টুকিটাকি অসংখ্য জিনিসপত্র। এর কারণ হলো এই যে, যেহেতু প্রাচীন মিশরীরা বর্তমান জীবনের উপর খুব একটা গুরুত্ব দিতো না তাই তাদের বাড়িঘর সৌধপ্রাসাদ সব কিছু খুব সাধারণ জিনিসপত্র দিয়েই তৈরি হতো। কাদামাটির ইট, কাঠ—এইগুলোই ছিলো প্রধান মালমসলা; কাজেই মাটির সঙ্গে মিশে এগুলো অনেক আগেই কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু যে সমাধিগুলো তারা তৈবি করতো, সেগুলো পাথর দিয়েই তৈরি হতো। মিশরে শুধু পাথরেব অভাব ছিলো না তাই নয়, পাথরের রকমটাও ছিলো খুব ভালো। তাছাড়া এই সমাধিগুলো সবই তৈরি হতো মাটির নিচে; কাজেই ঝড়জলের ঝাপটা এগুলোর কোনো ক্ষতি করতে পারতো না। তাই হাজার হাজার বছর পরে আজও এগুলো অক্ষত অবস্থায় প্রায় একইভাবে টিকে রয়েছে। আর প্রাচীন মিশরের যাবতীয় খবর আমরা পেয়েছি এই কবরগুলি এবং তার মধ্যেকার অসংখ্য জিনিসপত্র থেকে। আধুনিক কালের একজন ঐতিহাসিক তাই বলেছেন প্রাচীন মিশর হলো মৃতের দেশ, কবরের দেশ।

কবরের জাঁকজমক

প্রাচীন মিশরীরা মৃত্যুর পরে জীবনের উপর বিশ্বাস করতো বলে, এবং সেটাকেই আসল জীবন বলে মনে করতো বলে, সমাধির

ব্যাপারটিও এখানে তাই ক্রমশ ক্রমশ প্রচণ্ড গুরুত্ব পেয়ে বসেছিলো। সবচেয়ে প্রাচীন যে সমাধিগুলো এখানো চোখে পড়ে, সেগুলো খুব সাধাসিধা ছিলো। বালি-মাটিতে একটি চৌকো বা গোল গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহটিকে মাদুরে জড়িয়ে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রাখা হতো। সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র, যেমন অলংকার, শিকারের হাতিয়ার, পানীয় ও খাবার-ভর্তি পাত্র ইত্যাদি রেখে দেওয়া হতো। তারপর বালি-মাটি চাপা দিয়ে এটা ঢেকে দেওয়া হতো। এর উপরে কোনো সমাধিস্তূপ তৈরি করার নজির এই যুগে মেলে না। কিন্তু; এইভাবে সমাধিস্থ করবার ফলে ক্রমশ একটা প্রকাণ্ড অসুবিধা দেখা দিলো। সেটা হলো এই যে, ঝড়ে বালি উড়ে গিয়ে গিয়ে কিছুকালের মধ্যেই মৃতদেহটি অনাবৃত হয়ে পড়তো, তার ফলে মৃতদেহটি শিগগিরই নষ্ট হয়ে যেতো।

তাই ঐতিহাসিক যুগের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে সমাধির উপর রোদে-পোড়ানো কাদামাটির ইট দিয়ে একটি সৌধ তৈরি করা হচ্ছে—ঝড়ে যাতে সমাধির কোনো ক্ষতি না করতে পারে। এই ধরনের সমাধিগুলো আধুনিক আরবী ভাষায় "মস্তবা" বলে পরিচিত। কারণ, ঝড়ে এবং হাওয়ায় বালি উড়ে এসে সৌধগুলিকে পুরোপুরি ঢেকে ফেললে সেগুলিকে ঠিক একটি নিচু বেঞ্চির মতো দেখায়। এই ধরনের নিচু বেঞ্চিকে আরবীরা "মস্তবা" বলে। সাক্কারাতে এই ধরনের মস্তাবার সবচেয়ে প্রাচীন একটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি গোটা মিশরের দ্বিতীয় রাজা আহা-র সমাধি। এই সমাধিটি হলো পাঁচটি ছোটো ছোটো ঘরে বিভক্ত চৌকো একটি গর্ত। মাঝখানের ঘরটিতে মৃতদেহ এবং আশেপাশের ঘরগুলিতে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র রাখা হয়েছিলো। গর্তটিকে ঢেকে তার উপরে ইট দিয়ে অনেক বড়ো একটি সৌধ তৈরি করা হয়েছিলো। এটি সাতাশটি ছোটো

ছোটো ঘরে বিভক্ত ছিলো। এই ঘরগুলিতে তাঁর খাবার-দাবার পানীয়, হাতিয়ার, পাত্র এবং জীবনে প্রয়োজন এমন অসংখ্য জিনিসপত্র রাখা হতো। দেখেশুনে মনে হয় যে এই মস্তবাগুলি হুবহু বাড়িঘরের মতো করেই তৈরি করা হতো। এই ধরনের সমাধি-সৌধ তৈরি করার ফলে মৃতদেহ অনাবৃত হয়ে পড়ার আশঙ্কা আর থাকলো না বটে, কিন্তু সমাধিগুলির আড়ম্বর যতো বাড়তে লাগলো ততোই আর-একটি সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিলো। আগেই বলেছি, মৃতদেহগুলির সঙ্গে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্রও সমাধিস্থ করা হতো। এই সমস্ত জিনিসপত্রের মধ্যে মূল্যবান জিনিসপত্রও অনেক থাকতো। বিশেষত রাজা এবং বড়োলোকদের সমাধিতে ক্রমশ ক্রমশ এগুলি বেশ প্রচুর পরিমাণেই রাখা হতো। ফলে, মূল্যবান জিনিসপত্রের লোভে চোরডাকাতের দল সমাধিগুলোতে হানা দিতে শুরু করলো, আর সেটা ক্রমশ এমন ব্যাপকভাবে বেড়ে উঠেছিলো যে সমাধিগুলি রীতিমতো সুরক্ষিত ভাবে তৈরি না করলে আর চলছিলো না। কাজেই সমাধির উপরে প্রকাণ্ড ভারীভারী পাথর দিয়ে বড়ো বড়ো সৌধ তৈরি হতে লাগলো, যাতে কিনা চোর-ডাকাতের দল এই ভারী পাথর ভেঙে বা সরিয়ে কোনোমতেই সমাধির মধ্যে সংরক্ষিত মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি না করতে পারে। আর এরই ফলে প্রাচীন মিশরে সমাধির উপরে নিরেট পাথর দিয়ে তৈরি বিরাট বিরাট সৌধ দেখা দিতে লাগলো।

পিরামিড

মৃতদেহটি কোনোরকমে টিকিয়ে রাখার জন্য গর্ত খুঁড়ে কবর দেবার যে রীতি শুরু হয়েছিলো, তারই চরম পরিণতি হলো বিরাট বিশাল সৌধ তৈরির মধ্যে। আর শেষ পর্যন্ত এই সৌধগুলি এতো বিরাট

আড়ম্বরপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে আজো পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে এগুলি একটি পরম বিস্ময়ের জিনিস হয়ে আছে। এগুলিই হলো "পিরামিড"। পিরামিড শব্দটি প্রাচীন গ্রীকদের দেওয়া। গ্রীক ভাষায় শব্দটির মানে হলো "খুব উঁচু"। এ পর্যন্ত মিশরে প্রায় আশীটি পিরামিড বা তাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই পিরামিডগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে উঁচু সেটি খ্রীষ্টের জন্মের আগে প্রায় ২৮০০ বছর নাগাদ তৈরি হয়েছিলো। এটি বর্তমান কায়রোর কাছে, নীল নদের পশ্চিমে গিজাতে অবস্থিত রাজা কুফুর পিরামিড বলেই বিখ্যাত। এই পিরামিডটির চৌকো ভিতের এক-একটি পাশ ৭৫৫ ফুট লম্বা, আর মাটি থেকে চূড়া পর্যন্ত ৪৮১ ফুট উঁচু। তেরো একরেরও বেশি জমি জুড়ে এটি তৈরি হয়েছে। অনেক হিসাবপত্র করে দেখা গেছে যে এই পিরামিডটি তৈরি করতে প্রায় ২,৩০,০০০০ পাথরের চাঁই লেগেছিলো—গড়পড়তায় এক-একটি চাঁইয়ের ওজন হলো প্রায় ৬৮ মন; কোনো কোনোটির ওজন ৯৪০০ মনেরও বেশি ছিলো। হিসেব করে এও দেখা গেছে যে এই পিরামিড তৈরী করতে যে পরিমাণ পাথর লেগেছে, সেই পাথরকে যদি একফুট ঘনকের পরিমাণে সমান করে ছোটো ছোটো টুকরোয় কেটে ফেলা হয় এবং সেই টুকরোগুলোকে যদি এক লাইনে পরপর বসিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বিষুবরেখা ধরে পৃথিবীর গোটা ব্যাসের দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তাতে ঢেকে দেওয়া যায়। গিজার এই বড়ো পিরামিডের মধ্যে অসংখ্য যে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার পুরো তালিকা দু-এক পৃষ্ঠায় কুলিয়ে উঠবে না। সোনাদানার নানারকম জিনিস থেকে শুরু করে, চেয়ার, টেবিল, খাট, পালং, বাসন-কোসন এমনকি নখ পালিশ করবার সুন্দর ছোট্ট যন্ত্রপাতি

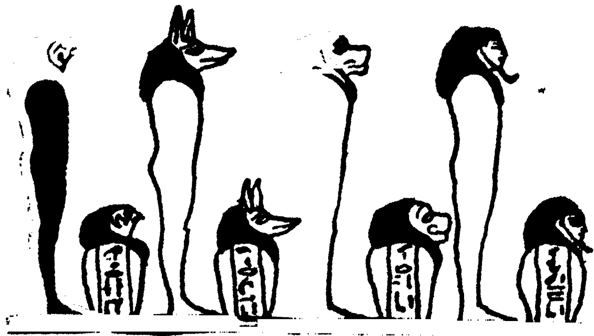
পর্যন্ত এই পিরামিডে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া পাওয়া গেছে পাথর বা মাটির তৈরি ছোটো ছোটো অনেকগুলি মূর্তি। জীবদ্দশায় রাজার যে সমস্ত পাত্রমিত্র, সভাসদ এবং দাসদাসী ছিলো, তাদের অভাবে তাঁর যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সেইজন্যই জীবন্তের প্রতীক হিসাবে এই মূর্তিগুলি কবরের মধ্যে রাজার আশেপাশেই রাখা হতো। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে গোড়াতে এদের জীবন্ত অবস্থাতেই সমাধিস্থ করা হতো। পণ্ডিতদের এই অনুমান অন্য নানা দিক দিয়েও বিশ্বাসযোগ্য। প্রাচীন মিশরের এই সমাধি-গুলির মধ্যে ঐশ্বর্য-সম্পদ এবং জাঁকজমক ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যেটি সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য সেটি হলো সম্রাট তুতেন খামেনের সমাধি। এটি অবশ্য অনেক পরের সমাধি; খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৬০ থেকে ১৩৫০-এর মধ্যেই এটি তৈরি হয়েছিলো। আর এটি তৈরি হবার কিছুকালের মধ্যেই পরবর্তী আরেকজন সম্রাট এর ঠিক উপরেই তাঁর নিজের সমাধিসৌধ তৈরি করেছিলেন বলে আধুনিক কাল পর্যন্ত চোরডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিঁকে ছিলো। ১৯২২ সালে তুতেন খামেনের এই সমাধিটি আবিষ্কৃত হয়। সূক্ষ্ম কারিগরির অসংখ্য মূল্যবান জিনিসপত্রের দিক দিয়ে এই সমাধিটি অতুলনীয়।

"নোম"

আমরা আগেই বলেছি যে নতুন পাথরের যুগের বিপ্লব ঘটে যাবার পর এবং মিশরের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক অবস্থার দরুন খুব প্রাচীন কালেই মিশরে সমাজ-সংগঠনের মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন এসে গিয়েছিলো। জ্ঞাতি-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সংগঠন মানুষের সমাজের ইতিহাসে খুবই প্রাচীন। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগ শুরু হবার কিছু আগে মিশরের মানুষের সমাজ-

সংগঠনের যে রূপটি চোখে পড়ে, সেটি প্রধানত আর জ্ঞাতিভিত্তিক নয়। এক-একটি এলাকার ভিত্তিতে, মোটামুটি চাষবাসের কাজের সুবিধার জন্যই নতুন এক ধরনের সমাজ-সংগঠন এখানে গড়ে উঠেছিলো। অর্থাৎ, নেহাত প্রয়োজনের খাতিরে যে জমিতে একদল মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলো, সেই জমিকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে নতুন একটি সম্পর্কের সৃষ্টি হলো। নতুন এই সম্পর্কটিকেই প্রাচীন গ্রীকরা "নোম্" ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছিলো। "নোম"-ব্যবস্থায় পৌঁছে প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা নিছক মানুষে মানুষে জ্ঞাতি-সম্পর্কের ক্ল্যান-ব্যবস্থাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছিলো।

ঐতিহাসিক যুগ শুরু হবার আগে পর্যন্ত মিশরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলতে প্রধানত এই নোম-ব্যবস্থারই ইতিহাস বোঝায়। ক্ল্যান-ব্যবস্থা অতিক্রম করে এলেও এই নোমগুলির কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো, যার সঙ্গে ক্ল্যানের খুব মিল ছিলো। সেটি হলো, যেমন প্রত্যেকটি ক্ল্যানের তেমনি প্রত্যেকটি নোম্-এরও আলাদা আলাদা এক-একটি টোটেম ছিলো। নেকড়ে, বিড়াল, মেষ, শিয়াল, বাজপাখি প্রভৃতি হরেক রকম পশু-পাখির নাম অনুযায়ী এক-একটি



বিভিন্ন নোম্-এর টোটেম-চিহ্ন

নোম্ পরিচিত ছিলো। পতাকার উপরে নিজের নিজের টোটেমের চিহ্ন এঁকে এক-একটি নোম্-এর স্বাতন্ত্র্য বোঝানো হতো।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মিশর দেশটি মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলো—দক্ষিণ দেশ এবং উত্তর দেশ। এ বিভাগটি অবশ্য নেহাত প্রাকৃতিক বিভাগই ছিলো; কারণ আসোয়ান থেকে মেম্ফিস পর্যন্ত নীল নদের এই উপত্যকাটির সঙ্গে এর উত্তরে ব-দ্বীপ অঞ্চলের একটি পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। উত্তর দেশ বলতে ব-দ্বীপ অঞ্চলটিকে এবং দক্ষিণ দেশ বলতে উপত্যকার ওই দক্ষিণ অঞ্চলটিকেই বোঝাতো। ঐতিহাসিক যুগ শুরু হবার আগে পর্যন্ত মিশরের ইতিহাসে এ দুটি অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য মোটামুটি বজায় ছিলো; এবং এই দুটি অঞ্চলেই নোম-ব্যবস্থার প্রতিপত্তি ছিলো।

নোমগুলির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস জানবার উপায় নেই; কারণ এ বিষয়ে এমন কোনো লিখিত নথিপত্র নেই যা থেকে আমরা এই বিষয়টি জানতে পারি। সে যুগের মিশরীরা কবরের মধ্যে হাতির দাঁত, শ্লেটপাথর কিংবা অন্য সব জিনিসে নানারকম ছবি এঁকে রেখে দিতো এবং মাঝে মাঝে সেগুলোর সঙ্গে দু-এক ছত্র লেখাও লিখে রাখতো। এই ছবিগুলো থেকেই নোম্-এর খানিকটা ইতিহাস জানা যায়। গোটা মিশরে এই ধরনের কতোগুলি নোম ছিলো তা সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। সব সময়েই এব সংখ্যার পরিবর্তন হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিলো; কারণ শক্তিসামর্থ্যে যে নোম্-টি অন্য সকলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলো, সে যে আশেপাশের দুর্বলতর নোমগুলির উপর তার আধিপত্য বিস্তার করবে, তাতে আর সন্দেহ কি? তবে ঐতিহাসিক যুগ শুরু হবার আগে গোটা মিশরে প্রায় ৪২টি নোম্-এর পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাইশটি ছিলো দক্ষিণ মিশরে এবং বিশটি ছিলো উত্তর মিশরে।

"বাজপাখি"র প্রাধান্য

নোমগুলির মধ্যে মারামারি হানাহানি লেগেই ছিলো। এই মারামারি হানাহানির কারণটাও বেশ বোঝা যায়। কারণ ছোট্ট এই দেশের মধ্যে যেখানে পাশাপাশি অনেকগুলি নোম, সেখানে একটুকরো ভালো চাষের জমি নিয়ে বা নীল নদের বন্যার জল নিয়ে, বা জলসেচের ব্যবস্থা নিয়ে যে ঝগড়া-বিবাদ হবেই তাতে আর আশ্চর্য কি? আগেই বলেছি যে ওই ছবি এবং লেখাগুলো থেকে এই ঝগড়া-বিবাদের খবর কিছু কিছু জানা যায়; তবে এগুলোর যে বিবরণী দেওয়া আছে তা হলো ওই টোটেম্‌দের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের কাহিনী—এ টোটেম ও টোটেমকে খেয়ে ফেললো, অমুক টোটেম অমুক টোটেমকে গিলে ফেললো। এই টোটেমগুলো যে আসলে প্রাচীন ওই নোমগুলিরই প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো সে কথা বুঝতে পারা যায়। ক্রমাগত এই ঝগড়া-বিবাদের মধ্য দিয়ে গোটা মিশরে ক্রমশ দুটি প্রাচীন রাজ্য সংগঠিত হয়ে উঠেছিলো—উত্তর রাজ্য এবং দক্ষিণ রাজ্য। দক্ষিণ রাজ্যের প্রধান রাজধানী ছিলো হিয়েরোকনপোলিস্‌-এ; যে নোমটি এখানে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো তার নেতার নাম ছিলো হোরাস, এবং তার টোটেম ছিলো বাজপাখি। এই শহরটিরও তাই আরেকটি নাম ছিলো "বাজপাখি শহর"। উত্তর রাজ্যের রাজধানী ছিলো নীল নদের মোহনায় বুটো-তে। এর পরের যে ইতিহাস সেটা হলো দক্ষিণ রাজ্য কর্তৃক উত্তর রাজ্যের উপর আধিপত্যের বিস্তারের ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে হাতির দাঁতের উপর আঁকা খুব প্রাচীন একটি ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ছবিতে দেখা যায় যে নানারকম পশুপাখির মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিবাদ চলতে চলতে বাজপাখি ক্রমশ সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠছে; আর এই ছবির সঙ্গে একছত্র লেখায় বলা আছে যে,

"বাজপাখি অন্য সকলকে গিলে খেলো"। অর্থাৎ "বাজপাখি" যার টোটেম, দক্ষিণ রাজ্যের সেই দুর্ধর্ষ নোম্‌টিই যে ক্রমশ উত্তর এবং দক্ষিণ, এই দুটি রাজ্যের উপরেই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, এই ছবিতে সেই কথাটিই বলা আছে। আর সেটা যে সত্যি ঘটনা সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না, যখন আমরা দেখতে পাই যে, এই সময় থেকেই দুটি রাজ্য এক হয়ে একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছে। গোটা মিশরের এই একচ্ছত্র প্রথম রাজার নাম হলো মেনেস্‌। তাঁর টোটেম ছিলো বাজপাখি আব তাঁর নোম-এর প্রধান দেবতার নাম ছিলো হোরাস্‌। মেনেস্‌-ই প্রথম দুটি বাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে মেম্ফিসে রাজধানী স্থাপন করেন। অবশ্য দুটি রাজ্য ঐক্যবদ্ধ করলেও, এদের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য অনেকদিন পর পর্যন্তও টিকে ছিলো; আর তার প্রমাণও পাওয়া যায় বাজার উপাধি থেকে; কারণ শেষ পর্যন্ত মিশরের সমস্ত রাজারই প্রধান উপাধি ছিলো "উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের রাজা"। মিশরীরা রাজাকে "ফেরাও" বলে অভিহিত করতো। মিশরী ভাষায় এর অর্থ হলো "বড়ো বাড়িতে যে থাকে"। বড়ো বাড়ি যে রাজপ্রাসাদ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ৩২০০ বছর আগে মিশরে মেনেস-এর এই একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য অনেক পণ্ডিতের মতে আরো দুশো বছর আগেই এটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো।

ম্যানেথো

মেনেস-এর আমল থেকেই মিশরের ঐতিহাসিক যুগের শুরু। গোটা মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে মেনেস যে রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রায় তিন হাজার বছর ধরে সেই রাজত্ব প্রাচীন ইতিহাসে টিকে ছিলো। এই ইতিহাস জানবার একটি প্রধান উপাদান হলো অনেক পরের যুগের মিশরেরই একজন ঐতিহাসিকের

লেখা ইতিহাস। মিশরের এই ঐতিহাসিকের নাম হলো ম্যানেথো। খ্রীষ্টের জন্মের আগে ৩০৫ থেকে ২৮৫ সালের মধ্যে টোলেমিদের আমলে তিনি তাঁর এই ইতিহাস গ্রীকভাষায় রচনা করেছিলেন। অবশ্য তাঁর লিখিত মূল গ্রন্থটি এখন আর পাওয়া যায় না, অনেককাল আগেই সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে প্রাচীন রোমানদের যে সমস্ত লিখিত পুঁথিপত্র পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে ম্যানেথোর এই গ্রন্থের শুধু যে যথেষ্ট উল্লেখ আছে তাই নয়, তাঁর গ্রন্থ থেকে বহু দীর্ঘ উদ্ধৃতিও এগুলোতে করা আছে। এ ছাড়া গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ এবং ডিয়োডোরাস্-এর রচনাবলীতেও প্রাচীন মিশরের অনেক খুঁটিনাটি খবর পাওয়া যায। অবশ্য আগেই বলেছি যে, মিশরেরই বুক থেকে অসংখ্য কবর খুঁড়ে যে সমস্ত জিনিসপত্র, ছবি এবং লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোই হলো মিশরের গোটা ইতিহাস জানবার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

যুগবিভাগ

মিশরের রাজা-রাজড়াদের ইতিহাসকে ম্যানেথোই প্রথম ৩১টি ধারাবাহিক রাজবংশের ইতিহাসে বিভক্ত করেন। সনতারিখের হিসাবের সুবিধার জন্য আধুনিক ঐতিহাসিকরা প্রায় সকলেই ম্যানেথোর এই রাজবংশের তালিকা মেনে নিয়েছেন। অবশ্য বোঝবার সুবিধার জন্য এই একত্রিশটি রাজবংশকে আবার চারটি প্রধান যুগ এবং আরো পাঁচটি অপ্রধান যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। সবশুদ্ধ এই নটি যুগ হলো :

১। **প্রাচীনতম যুগ ঃ** খ্রীঃ পূঃ ৩২০০-২৮১৫—১ম ও ২য় রাজবংশের আমল

২। **পুরোনো যুগের রাজত্ব** „ ২৮১৫-২২৯৪—৩য় থেকে ৬ষ্ঠ „ „

৩। **প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন যুগ** „ ২২৯৪-২১৩২—৭ম থেকে ১০ম „ „

৪। **মাঝের যুগে রাজত্ব** খ্রীঃ পূঃ ২১৩২-১৭৭৭
—১১শ ও ১২শ রাজবংশের আমল

৫। দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন যুগ
" ১৭৭৭-১৫৭৩—১৩শ থেকে ১৭শ " "

৬। **নতুন যুগের রাজত্ব** " ১৫৭৩-১০৯০—১৮শ থেকে ২০তম " "

৭। সাম্প্রতিক নতুন যুগের রাজত্ব
" ১০৯০-৬৩৬—২১তম থেকে ২৫তম " "

৮। সেইট্ যুগ " ৬৬৩-৫২৫—২৬তম " "

৯। সাম্প্রতিক যুগ " ৫২৫ ৩৩২—২৭তম থেকে ৩১তম " "

প্রথম থেকে চতুর্থ রাজবংশ

প্রাচীনতম যুগ এবং প্রথম চারটি রাজবংশের আমলে মিশরের ইতিহাসে একটা প্রচণ্ড তোলপাড় চলেছিলো। পরস্পরের মধ্যে হানাহানি কাটাকাটি বন্ধ করে, জলসেচের সুবন্দোবস্ত করে এবং ঐক্যবদ্ধ একটি শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রবর্তন করে, এই আমলেই মিশরের মানুষ তার বর্বর অবস্থা অতিক্রম করে সভ্যতার রাজপথে এসে পৌছেছিলো। এই অগ্রগতি যে কি তীব্র বেগে এবং চূড়ান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো তার প্রমাণ হলো তৃতীয় ও চতুর্থ রাজবংশের আমলে তৈবি পিবামিডগুলি। বস্তুত, এর আগে এবং এর পরে মিশরের রাজারাজড়ারা যতোগুলি পিরামিড তৈরি করেছিলেন তার সবগুলির মধ্যে বিরাটত্বে, সৌন্দর্যে এবং আড়ম্বরের দিক দিয়ে এই যুগের পিরামিডগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ। এর আগে গিজার যে বড়ো পিরামিডটির বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সেটা চতুর্থ রাজবংশেরই রাজা কুফুর তৈরি। চতুর্থ রাজবংশের অন্যান্য বিখ্যাত রাজাদের নাম হলো সেনেফ্রু, কাফরা, মেনকাউরা। শিল্পকলা এবং ভাস্কর্যে এই যুগে যে বিরাট

উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো, তা এই পিরামিডগুলির মধ্যে সংরক্ষিত সূক্ষ্ম কারিগরির অসংখ্য জিনিসপত্র থেকেই জানা যায়। অঙ্ক এবং জ্যামিতি-বিজ্ঞানেরও যে প্রচণ্ড অগ্রগতি হয়েছিলো তার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন হলো পিরামিড তৈরির নির্ভুল মাপ। সেই প্রাচীন যুগে এখনকার মতো ইঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞান ছিলো না, একথাটা মনে রাখলে সত্যিই অবাক হতে হয় যখন দেখি বড়ো পিরামিডের চৌকো সমান পাশগুলির মধ্যে মাত্র সাত ইঞ্চির পার্থক্য ছিলো।

পঞ্চম রাজবংশের আমলে পিরামিড এবং মন্দিরগুলোর দেয়ালে দেবতা এবং রাজারাজড়াদের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ছবি এঁকে রাখার রীতি প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ছবিগুলি থেকে সে যুগের মিশরের অনেক খুঁটিনাটি খবর জানা যায়। এই বংশেরই শেষ রাজার আমলে পিরামিডের মধ্যে তুকতাক জাদুমন্ত্র লিখে রাখার রীতিও প্রচলিত হয়েছিলো।

ষষ্ঠ রাজবংশ

ষষ্ঠ রাজবংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা হলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পেপি। উত্তর এবং দক্ষিণে উভয়দিকেই তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে কায়েম করেন। এঁর কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় পেপি-ই বোধ হয় ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী রাজা। ছ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি প্রায় একশো বছর বেঁচেছিলেন। এই ষষ্ঠ রাজবংশের আমলেই প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো। আগের যুগে নোম্‌গুলির যে স্বাতন্ত্র্য ছিলো, ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাদের সেই স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়। নোমগুলি টিকে থাকলেও, মেনেস-এর আমল থেকেই কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যেই

তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। রাজাই প্রত্যেকটি নোম্-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন, এবং গোড়াতে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই নিযুক্ত হতেন। পরে অবশ্য শাসনকর্তার এই পদগুলি প্রায় বংশগতই হয়ে গিয়েছিলো। বংশানুক্রমে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে এক-একটি নোম-এর শাসকবংশ ক্রমশই ক্ষমতায় এবং প্রতিপত্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো; আর তার ফলে কোনো কোনো নোম-এর শাসকবংশ শেষ পর্যন্ত প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য চালাতে শুরু করেছিলো। ষষ্ঠ রাজবংশের শেষ দিকেই এই ব্যাপারটি চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়, এবং ষষ্ঠ রাজবংশ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে "পুরোনো যুগের রাজত্বের" পতনের কারণও হলো এইটাই। এর পর প্রায় পৌনে দুশো বছর ধরে মিশরের ইতিহাস হলো অরাজকতার ইতিহাস। বিভিন্ন নোমগুলির মধ্যে একটানা ঝগড়াবিবাদ প্রথম এই অন্তর্বর্তীকালীন যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

একাদশ রাজবংশের আবির্ভাবে মিশরের এই অরাজকতা শেষ হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নেব্-হাপেট্-রা (Neb-Hapet-Ra) নোমগুলির এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বকলহ দৃঢ়হস্তে দমন করে আবার গোটা মিশরকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে এনেছিলেন। শুধু তাই নয়, ইনি লিবিয়া, নিউবিয়া এবং সেমাইট্‌দের বিরুদ্ধেও যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়েছিলেন। এই বংশের রাজধানী ছিলো ইতিহাস-বিখ্যাত থিব্‌স্ নগরে। এই বংশের আমলেই প্রাচীন মিশরের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী মার্টিসেন জীবিত ছিলেন। থিব্‌স্ নগরীকে কেন্দ্র করে এই বংশের আমল থেকেই প্রাচীন মিশরের "মাঝের যুগের রাজত্বের" শুরু হয়।

দ্বাদশ রাজবংশ

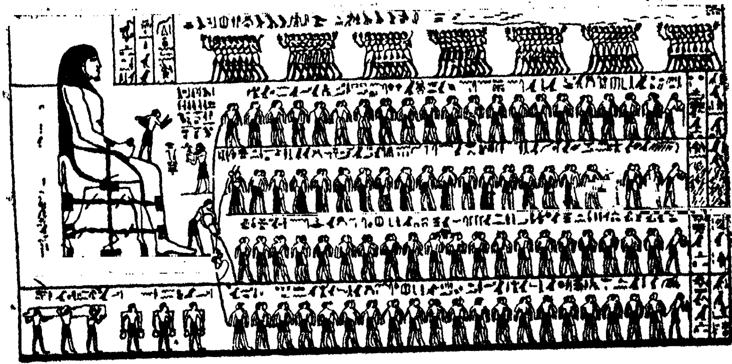
কিন্তু মিশরের সত্যিকারের পুনরভ্যুত্থান এবং নবজাগরণ শুরু হয় দ্বাদশ রাজবংশের আমল থেকে। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে এটিকে একটি "স্বর্ণযুগ" বলে অভিহিত করা যায়। ঐশ্বর্য-সম্পদে, শিল্পকলায়, ভাস্কর্যে, মন্দির ও পিরামিড রচনায় এই যুগে প্রচণ্ড অগ্রগতি হয়েছিলো। এই বংশের রাজা তৃতীয় আমেন্‌এম্‌হাট্ ফাউয়ুম-এর জলা অঞ্চল থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে প্রায় চল্লিশ বর্গমাইল পরিমাণ জমি চাষযোগ্য করে তুলেছিলেন। তাছাড়া অনেকগুলি বাঁধ ও খাল কেটে তিনি মোইরিস্ হ্রদকে কেন্দ্র করে জলসেচের একটি খুব ভালো ব্যবস্থারও সৃষ্টি করে-ছিলেন। দক্ষিণে নিউবিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে মিশরের সত্যিকারের প্রাধান্য এই বংশের আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, এবং মিশরবাসীর জীবনে যা একটি পরম আশীর্বাদের মতো ছিলো, সেই "নাইলোমিটারও" এই যুগেই প্রচলিত হয়েছিলো। প্রতি বছর বন্যার জলে ধুয়ে ভেসে যেতো বলে সীমানা নিয়ে প্রতি বছরই নোম-গুলির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগতো। দ্বাদশ রাজবংশের আমলেই এই নোমগুলির পাকাপাকি সীমানা নির্ধারিত করা হয়। শুধু তাই নয়, নোমগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং রাজার প্রতি তাদের আনুগত্য—এই বিষয়গুলি সম্পর্কেও পাকাপাকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দ্বাদশ রাজবংশের আমলে নোমগুলির উপর কেন্দ্রীয় শাসন কঠোরভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বাদশ রাজবংশের আমলে মিশর যে ধনসম্পদে কি পরিমাণ সমৃদ্ধিলাভ করেছিলো তার নিদর্শন এই বংশের রাজাদের তৈরি মন্দিরগুলো থেকে পাওয়া যায়। কার্‌নাকে দেবতা আমনের মন্দির, হেলিওপোলিস্-এ রা-র মন্দির, বুবাসটিস্-এ উবাস্‌টেট্-এর মন্দির, হেরাক্লিওপোলিস্-এ হেরশেফ্-এর মন্দির—



এই যুগের তৈরি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রায় ৩৫ হাত উঁচু থামগুলো থেকে মন্দিরটা যে কি বিরাট বড়ো ছিল তা বোঝা যায়

অনেকগুলি মন্দিরের মধ্যে এইগুলিই স্থাপত্যে, রচনাকৌশলে এবং ঐশ্বর্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোইরিস হ্রদের কাছে একটি বাঁধ তৈরি করা উপলক্ষ্যে তৃতীয় আমেন্‌এম্‌হাট্ বাঁধের উপর পাথরের তৈরী তাঁর দুটি বিরাট মূর্তি স্থাপন করেন। এক-একটি পুরো চাঁই থেকে কেটে তৈরি করা ৩৯ ফুট উঁচু এই মূর্তি দুটি



পাথরেব তৈরি বিরাট বাজমূর্তি বয়ে নিয়ে চলেছে অসংখ্য ক্রীতদাসের দল। পিরামিডের অসংখ্য পাথরের চাঁই কিভাবে বয়ে আনা হয়েছিলো সেটাও এই ছবি থেকে খানিকটা আন্দাজ করা যায়

মূর্তি-শিল্পের ইতিহাসেও একটি পরম বিস্ময়। হাবারা-তে তাঁর পিরামিডের সামনে তৃতীয় আমেন্‌এম্‌হাট যে বিরাট গোলকধাঁধাটি তৈরি করান, স্থাপত্যকৌশলে সেটিও একটি অতুলনীয় সৃষ্টি।

ব্যবসাবাণিজ্য

এই সমস্ত বিরাট মন্দির এবং পিরামিড তৈরি করার জন্য প্রয়োজন হতো নানারকম জিনিসের। তাছাড়া রাজা এবং বড়োলোকদের বিলাস-ব্যসনের অসংখ্য জিনিসপত্রও তো ছিলোই। মিশরে এর অধিকাংশের খুব অভাব ছিলো। তাই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই সমস্ত জিনিসপত্রের যোগাড় করতে হতো। এই সময়ে তাই আমরা দেখি যে কিছুটা ব্যবসা-বাণিজ্যের মারফত, কিছুটা সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে জোর করে বিভিন্ন দেশ থেকে এই জিনিসগুলি নিয়ে আসা হতো। সিরিয়ার সিডার উপত্যকা থেকে আসতো ভাল সিডার কাঠ, সাইপ্রাস থেকে আসতো তামা, দক্ষিণের নিউবিয়া থেকে আনা হতো সোনা এবং হাতির দাঁত, দামী পাথর, রঙ, সুগন্ধি প্রভৃতি আসতো দূরে-কাছের নানা দেশ থেকে। উত্তরে প্যালেস্টাইন এবং ফিনিশীয়দের সঙ্গে যোগাযোগও এই সময়ে স্থাপিত হয়। সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত এই ফিনীশীয়রা যে কোন সময় ভূমধ্যসাগরের তীরে প্রথম বসবাস শুরু করেছিলো, তা বলা কঠিন। তবে ওস্তাদ সওদাগর হিসাবে ইতিমধ্যেই তাদের বেশ নামডাক ছড়িয়ে পড়েছিলো। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে স্থাপিত টায়ার সিডন্‌ প্রভৃতি তাদের বিখ্যাত যে শহরগুলি পরবর্তী যুগে ব্যবস্যবাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো, সেগুলোও খুব সম্ভব ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছিলো। ফিনিশীয়রা প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো নৌকায় মাল বোঝাই করে সে যুগে

দূর-পাল্লার দেশ-বিদেশে পাড়ি দিতো। মিশরীদের সঙ্গে তাদের যে বাণিজ্যের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

হাইক্‌সস্‌ অভিযান

দ্বাদশ রাজবংশের শেষাশেষি থেকে "মাঝের যুগের রাজত্বে"র অবসান শুরু হয়; এবং এর পর ত্রয়োদশ রাজবংশের আমলে প্যালেস্টাইনের দিক থেকে হাইক্‌সস্‌ নামে বিদেশী অভিযান-কারীদের দল মিশরের উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই হাইক্‌সস্‌রা ছিল পশ্চিম এশিয়ার দুর্ধর্ষ একটি জাতি। দ্রুতগামী ঘোড়া এবং চাকাওয়ালা যুদ্ধরথ ব্যবহার করে এরা অতি সহজেই মিশরীদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলো। হাইক্‌সস্‌দের মিশরে আসার আগে পর্যন্ত মিশরীরা ঘোড়া বা চাকা কোনোটির ব্যবহারই জানতো না। খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ বছরের কাছাকাছি হাইক্‌সস্‌রা মিশরে অভিযান করেছিলো এবং প্রায় দুশো বছর ধরে তারা তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিলো। এশিয়া মাইনরের বুকে এই সময় ঘোড়া এবং যুদ্ধরথ ব্যবহারকারী নতুন যে জাতিগোষ্ঠীর আনাগোনা শুরু হয়েছিলো, হাইক্‌সস্‌-রা খুব সম্ভব তাদেরই একটি শাখা ছিলো। হাইক্‌সস্‌ রাজারা মিশরে "রাখাল রাজা" (Shepherd Kings) বলে অভিহিত হতো। হাইক্‌সস্‌দের আমলেই মিশর সর্বপ্রথম পশ্চিম এশিয়ার উন্নত মেসোপটেমিয়া-সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। এর আগে পর্যন্ত মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা ও ইতিহাস প্রায় আলাদা আলাদা ভাবেই বিকাশ লাভ করেছিলো; কিন্তু হাইক্‌সস্‌দের আগমনের ফলে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেও, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে মিশরের একটি অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র রচিত হলো।

হাইক্‌সস্‌দের আগমনে মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের একটি বড়ো অধ্যায় শেষ হলো। দুশো বছর পরে হাইক্‌সস্‌দের বিতাড়িত করে মিশরীরা যখন আবার "নতুন যুগের রাজত্ব" প্রতিষ্ঠিত করে ততোদিনে গোটা পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ওলটপালট ঘটে গিয়েছে। আর ততোদিনে মিশরীরাও তার মধ্যে বেশ খানিকটা জড়িয়ে পড়েছিলো। এই ওলটপালটের ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করবো।

বাড়তি খাবার : বিপুল ঐশ্বর্য

প্রাচীন মিশরের যে ইতিহাস আমরা এতোক্ষণ আলোচনা করলাম, তার দুটি দিক আছে। মিশরের কথা মনে হলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে তার অতুল ধনসম্পদ এবং ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি, তার পিরামিড মন্দির এবং সুখ-সম্ভোগের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যবস্থা। রুক্ষ আবহাওয়ায় নীল নদীর জলকে কাজে লাগিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নতুন পাথরের যুগের মানুষ এখানে যে চাষের কাজ শুরু করেছিলো, তারই উপর গড়ে উঠেছিলো মিশরের এই অতুলনীয় ঐশ্বর্য। কারণ নীল নদীর উপত্যকায় ছোট্ট এই দেশের মাটিতে কঠোর পরিশ্রম করে যে পরিমাণ বীজ বোনা হতো, মাটি তার অনেকগুণ বেশি ফসল মানুষকে ফিরিয়ে দিতো। নিজেদের প্রয়োজন তো মিটতোই, হাতে থেকে যেতো তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়তি খাবার। আর প্রচুর পরিমাণ এই বাড়তি খাবারই ছিলো মিশরের সমস্ত অগ্রগতি-উন্নতির মূলে। খুব সাধাসিধা একটা হিসাব দেখলেই এটা আরো পরিষ্কার হবে। গিজার বড়ো পিরামিডটার কথা আমরা আগেই বলেছি। পণ্ডিতদের হিসাবে প্রায় একলক্ষ মানুষ বিশ বছর ধরে একটানা খাটলে তবে সে যুগে এই বিরাট পিরামিড তৈরি করা সম্ভব ছিলো।

অর্থাৎ বিশ বছর ধরে এই একলক্ষ মানুষ তাদের নিজেদের খাবার জোগাড়ের জন্য কোনো চেষ্টাই করতে পারে নি। তাহলে বিপুল-সংখ্যক এতো মানুষের খাবারের সংস্থান হলো কি করে? এর জবাব থেকেই বাড়তি খাবারের পরিমাণটা আন্দাজ করা যায়। শুধু এটা কেন, অন্য দিক থেকেও এই বিষয়টি একটু ভেবে দেখা যায়। কবরগুলিতে অজস্র জিনিষের যে সূক্ষ্ম কারিগরির নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে এবং অসংখ্য ছবি ও লেখা থেকে বোঝা যায় যে কুমোর, কামার, ছুতোর, মুচি, তাঁতী, শিল্পী, খোদাইকর, লেখক—প্রভৃতি নানারকম কাজের অসংখ্য কারিগরকে পুরো সময় তাদের নিজের নিজের কাজে নিযুক্ত থাকতে হতো। এদেরও খাবারের জোগাড় হতো ওই বাড়তি খাবার থেকেই। এ ছাড়া রাজারাজড়া এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও সৈন্যসামন্ত পুরোহিত-সওদাগরের দলও তো ছিলোই। সমাজের হাতে বিপুল পরিমাণ বাড়তি খাবাব সঞ্চিত হবার ফলেই মিশরের এই বিরাট অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিলো।

ক্রীতদাস

কিন্তু চরম এই উন্নতির পাশাপাশি মিশরের আর-একটি দিকও আছে। বাড়তি খাবার জমা হবার পর মানুষের সমাজ কিভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে তা আমরা আগেই দেখেছি। মিশরেও এই শ্রেণীবিভাগ হয়ে গিয়েছিলো। আর সেটা এতো তীব্র এবং নির্মম হয়ে দেখা দিয়েছিলো যে তার টানে মিশরের গোটা উন্নতির ধারাই শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ওই পিরামিডের কথাই ধরা যাক। ৬৮ মন ওজনের বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই নীল নদীর অন্য পারে দশ-বারো মাইল দূর থেকে মানুষকেই বয়ে আনতে হয়েছিলো। একটা দুটো নয়, তেইশ লক্ষ

পাথর। জোর-করে-খাটানো এই মানুষগুলো রাজার সিপাই-শান্ত্রীর চাবুক খেয়ে ডাণ্ডা-লাঠি খেয়ে পাথরচাপা পড়ে কতো হাজারে হাজারে মরেছে, তার পাকা হিসাব অবশ্য নেই; কিন্তু থাকলে আমরা নিশ্চয়ই শিউরে উঠতাম। অবশ্য, এ সব কাজে বেশির ভাগ ক্রীতদাসদেরই খাটানো হতো। আর, সে যুগের মানুষের কাছে ক্রীতদাসরা তো মানুষ বলে গণ্যই হতো না। যুদ্ধবিগ্রহে যারা বন্দী হতো, ক্রীতদাস হওয়া ছাড়া তাদের আর অন্য গতি ছিলো না। মিশরের মানুষ এই ক্রীতদাসদের বলতো, "জীবন্ত মৃত"। কারণ, শুরুতে এদের মেরে ফেলাই হতো; পরে যখন দেখা গেলো যে নানারকম অমানুষিক খাটুনির কাজে এদের লাগানো যায়, তখন আর এদের মেরে ফেলা হতো না। কিন্তু মানুষ হিসাবে এরা "মৃত" ছাড়া আর কিছুই ছিলো না; কাজেই ওই নামটি। সে যুগের কবরের দেয়ালের গায়ে আঁকা কিংবা পাথরে খোদাই করা অসংখ্য ছবিতে "জীবন্ত মৃতে"র দল এই ক্রীতদাসদের দেখা যায়। চাষবাসের কাজে, খাল কাটা বাঁধ বাঁধার কাজে, পিরামিড তৈরির কাজে, অমানুষিক নির্যাতন করে এদের খাটানো হতো। ক্রীতদাসের ব্যাপারটা এমনই বেড়ে গিয়েছিলো যে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে "নতুন পথের সন্ধান দেবার দেবতা ভেস্‌পুয়াট"-এর নেতৃত্বে মিশরীরা ঘন ঘন যুদ্ধের আয়োজন করছে। কারণ যুদ্ধে বন্দী করে ক্রীতদাস সংগ্রহ করাই ছিলো এই "নতুন পথের সন্ধান।"

শ্রেণীবিভাগ

শুধু ক্রীতদাস নয়, দেশের ভিতরে সাধারণ লোকজনের অবস্থাও যে কি রকম ছিলো, সেটাও ওই অজস্র ছবি এবং লেখা থেকে বোঝা যায়।

"....কামার তার হাপরের মুখে সারাদিন কাজ করে, পুরোনো কুমিরের চামড়ার মতো হয়ে গেছে তার আঙুলগুলো, পচা মাছের মতো দুর্গন্ধ তার গায়ে! পাথর কুঁদে-কুঁদে যারা রোজগার করে, কাজ করতে করতে যখন হাত উঠতে চায় না, তখন তারা কাজ বন্ধ করে; কিন্তু পরদিন ভোরবেলাই যদি আবার কাজে না লাগে, তাহলে পিছমোড়া করে তাদের বেঁধে ফেলে রাখা হয়।...শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা,—রাজমিস্ত্রি সমানে কাজ করে যায়, পরনে শুধু এক টুকরো নেংটি। হাত দুটো অবশ হয়ে আসে; জঞ্জালের মধ্যে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দু এক টুকরো খাবার কখনো-সখনো মুখে দেয়। বেশির ভাগ সময় নিজের আঙুল চুষেই তার খিদে মেটাতে হয়। কাজের শেষ নেই, এক মুহূর্ত অবসরও নেই। তার ছেলেমেয়েরা মার খেয়ে, লাথি খেয়ে, না খেয়ে—দিন কাটায়। ছোট্ট একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে বুকে হাঁটু লাগিয়ে তাঁতী সারাদিন তাঁত চালায়, এক মুহূর্ত ঢিলে হয়েছে কি ডাণ্ডাবেড়ি! সারাদিন রঙের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে রংরেজীদের আঙুলগুলো পচে গেছে— সারাদিন একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো কোটরে ঢুকেছে, তবু তাদের কাজের বিরাম নেই। চামড়ার মধ্যে সারাদিন, সারাজীবন কাটিয়ে জুতো তৈরি করে যারা, তাদের দুঃখের আর দীর্ঘশ্বাসের শেষ নেই।"

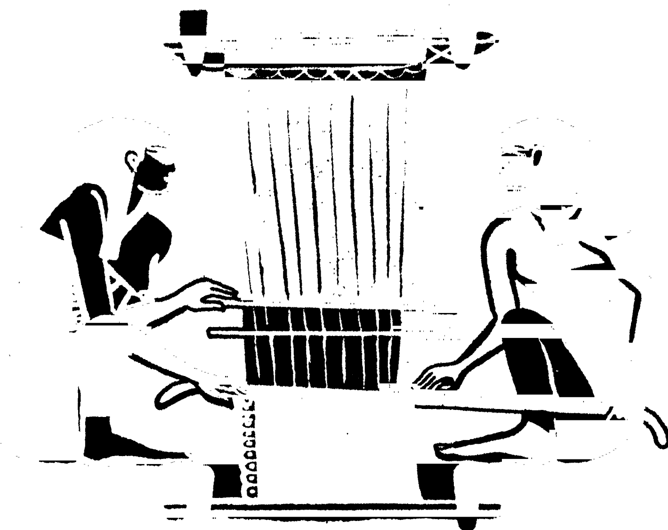
—মনগড়া নয়, প্রাচীন মিশরেরই কোনো মানুষের মনের খেদ এইগুলো। পাথর কুঁদে কুঁদে যারা তৈরি করতো বিরাট সব মূর্তি আর সুন্দর সব ছবি, ব্রোঞ্জ তামা সোনা থেকে যারা তৈরি করতো সূক্ষ্ম কারিগরির জিনিসপত্র, মন্দির ও পিরামিড তৈরি করতো যে রাজমিস্ত্রির দল, রঙের আঁচড় দিয়ে যারা ফুটিয়ে তুলতো চোখ-জুড়ানো ছবি আর নকশা—মিশরের সেই ওস্তাদ কারিগরদের আসলে কি অবস্থা ছিলো তা এ থেকেই বোঝা যায়। চাষের কাজ করে

যারা সোনা ফলাতো—খাজনার দায়ে, জবরদস্তি খাটুনির দায়ে তাদেরও যে কি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জীবন কাটাতে হতো তার অজস্র পরিচয় অসংখ্য এই সব ছবি ও লেখা থেকেই পাওয়া যায়।

অন্যদিকে রাজারাজড়া, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, পোষ্য এবং পুরোহিতদলের বিলাস আর ব্যসনের কোনো সীমা ছিলো না। কবরগুলোই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। সাধারণ লোকের কবর খুবই সাধারণ। কিন্তু সমাজের যতো উঁচু স্তরের লোকদের কবর চোখে পড়ে (এবং এদের কবরগুলোই টিঁকে আছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়), ততোই দেখা যায় যে বিলাস-ব্যসন, জাঁকজমকের আয়োজন হু হু করে বেড়ে চলেছে। তাছাড়া প্রাচীন মিশরের লোক—কথায় এবং লিখিত নথিপত্রে এদের চূড়ান্ত অত্যাচার নির্যাতনের কাহিনীও অনেক পাওয়া যায়। রাষ্ট্র থেকে এদের জন্য স্থায়ীভাবে জমিজমার বিলিবন্দোবস্ত করা হতো। বংশপরম্পরায় এরা এই জমির সমস্ত কিছু উপভোগ করতো। আর, এ ছাড়া সকলের উপরে ছিলেন রাজা—একচ্ছত্র অধিকার নিয়ে। পিরামিড-আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁর ঐশ্বর্যসম্পদের পরিচয় আগেই পেয়েছি।

অর্থাৎ প্রাচীন মিশরের এই সমাজ পরিষ্কারভাবে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। দেশের যাবতীয় ধনসম্পদ জমা হয়েছিলো ওই রাজারাজড়াদের হাতে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবন ছিলো নিদারুণ দুঃখকষ্টের।

আর, যে সমাজের এবং যে রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মৃতের সমাধিসৌধ গড়ে তোলা, ব্যবসাবাণিজ্যের অর্থই হয়ে উঠেছিলো বিলাসব্যসনের সামগ্রী যোগাড় করা—বিপুল পরিমাণ বাড়তি খাবার থাকা সত্ত্বেও সে সমাজ এবং সে রাষ্ট্রের অগ্রগতি যে রুদ্ধ হয়ে যাবেই, তাতে আর আশ্চর্য কি!



প্রাচীন মিশরে মেয়েরা তাঁত বুনছে



চামড়ার কাজে নিযুক্ত কারিগর



পাথর খোদাই কবে মূর্তি তৈবি করছে ভাস্কর



খাজনা দিতে পারেনি বলে চাষীব উপর নির্যাতন



কামারশালে পুরোদমে কাজ চলছে

একাদশ পরিচ্ছেদ

সিন্ধু-উপত্যকা

মেসোপটেমিয়ায় যেমন টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের উপত্যকায়, মিশরে যেমন নীল নদীর উপত্যকায়, তেমনি পশ্চিম এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে আরো দুটি নদীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন মানুষের আরেকটি সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিলো। মেসোপটেমিয়া বা মিশরের মতো এই সভ্যতার সুস্পষ্ট সূচনা অতো প্রচীন না হলেও, এটি যে ওই দুটি সভ্যতার সমসাময়িক-ই ছিলো সে বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই।

ঝোব্ থেকে সিন্ধু

পশ্চিমে বেলুচিস্থানের ঝোব্ নদী, পূর্বে পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদী—মোটামুটি এই দুটি নদীর মধ্যেকার যে অঞ্চল, সেই অঞ্চলেই এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায় যে এই সভ্যতার সীমারেখা ছিলো একটি বিরাট ত্রিভুজের মতো। পশ্চিমে বেলুচিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানের পাহাড়শ্রেণী যেখানে এসে ইরান সীমান্তে মিলেছে সেখান থেকে পূর্বে কাথিয়াবাড় এবং থর মরুভূমি, এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই ত্রিভুজের তিনটি পাশ যথাক্রমে ৯৫০ মাইল, ৭০০ মাইল এবং ৫৫০ মাইল দীর্ঘ। আয়তনে এই অঞ্চলটি প্রাচীন সুমের দেশের প্রায় চারগুণ।

[illegible]তি বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের মধ্যে এ পর্যন্ত ছোটোবড়ো প্রায় চল্লিশটি প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই বসতিগুলো থেকে যে সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেছে, সেগুলো থেকে বোঝা যায় যে গোটা এই অঞ্চলের প্রাচীন মানুষের জীবনযাপনের ধারা ও পদ্ধতির মধ্যে মোটামুটি একটি মিল ছিলো। প্রাচীন বসতির এই চল্লিশটি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দুটি বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে পূর্ব প্রান্তে সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। এর একটি হলো পাঞ্জাবে সিন্ধু নদীর শাখা ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত হরপ্পা—বর্তমান লাহোর থেকে একশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। আরেকটি হলো এর প্রায় চারশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত মোহেনজোদাড়ো—বর্তমান করাচী থেকে দুশো মাইল উত্তরে। হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো— এ দুটি বসতিই যে সেই প্রাচীন যুগে রীতিমতো দুটি বড়ো শহর ছিলো সে চিহ্ন খুবই সুস্পষ্ট। দুটো শহরেরই যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা আগুনে-পোড়ানো শক্ত ইটে ঠাসা। হরপ্পা যখন প্রথম নজরে পড়েছিলো তখনি এর সুস্পষ্ট পরিধি ছিলো প্রায় আড়াই মাইল; আর, মোহেনজোদারো-র পাকা ইটের ধ্বংসাবশেষের আয়তন হলো প্রায় এক বর্গমাইল। সে যুগে শহর দুটি যে আরো বড়ো ছিলো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাচীন এই সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং তার ধারাবাহিক অগ্রগতির সবচেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া যায় এই দুটি শহরেরই ধ্বংসাবশেষ থেকে। তাই গোটা এই সভ্যতাটি বিদ্বান মহলে "সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা" বলেই অভিহিত হয়ে আসছে।

প্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার এই সভ্যতার দুটি প্রধান বসতি হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো নামে অভিহিত হলেও, এই নাম দুটির কোনোটিই প্রাচীন নাম নয়। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুতে যে দুটি জায়গায়

প্রাচীন সভ্যতার এই দুটি চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে, তার আশে-পাশের প্রধান দুটি গ্রামের এখনকার নাম হলো হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো। স্থানীয় সিন্ধী ভাষায় মোহেনজোদারো নামটির মানে হলো "মৃতের স্তূপ" বা "মৃতের পুরী"। হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষের উপর প্রায় ত্রিশ ফুট যে উঁচু ঢিবি বা টেল্ গড়ে উঠেছিলো, লোকমুখে "মৃতের স্তূপ" নামটি বোধ হয় তারই স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসছে।

আবিষ্কারের কাহিনী

প্রাচীন এই শহর দুটির আবিষ্কারের কাহিনীও খুব মজার।

ঠিক একশো বছর আগে ১৮৫৬ সালের কথা। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় তখন সবেমাত্র রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছে। করাচী থেকে লাহোর পর্যন্ত রেললাইন পাতবার ভার পড়েছিলো জন এবং উইলিয়াম ব্রান্টন্ নামে দুই ভাইয়ের উপর। কিন্তু এঁরা দুজনেই বেশ একটা সমস্যায় পড়েছিলেন : রেললাইন পাতবার জন্য অপরিহার্য হলো প্রচুর পরিমাণ শক্ত ইট বা পাথরের কুঁচি : এই কুঁচি যোগাড় হবে কোথা থেকে ? তাঁদের এই সমস্যার সমাধান করে দিলো দুটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। ব্রাহ্মণাবাদ বলে মধ্যযুগের পুরনো একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে তৈরি হলো রেললাইনের দক্ষিণ অংশ ; আর উত্তর অংশে, মুলতান থেকে লাহোর প্রায় একশো মাইল রেলপথের সমস্ত মালমশলা যোগাড় হলো আরেকটি প্রাচীন শহরের অজস্র ইট দিয়ে। ব্রাহ্মণাবাদের তুলনায় এ শহরটি অনেক বেশি প্রাচীন। কাছাকাছি এখানকার গ্রামের নাম থেকেই এটি "হরপ্পা" বলে পরিচিত।

রেলপথ পাতবার মালমসলার সন্ধানেই যারা এই শহরের খোঁজ করেছিলো, তাদের কাছে এই শহরের অন্য কোনো গুরুত্ব যে ছিলো

না, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের প্রতি কোনোরকম মায়ামমতা না দেখিয়ে যেমন-তেমন ভাবে অসংখ্য ইট রেললাইন পাতবার কাজে চালানো হতে লাগলো। রেলের কর্তাদের এই বেপরোয়া সংগ্রহ আর কিছুদিন চললে, এই শহরটার সমস্ত স্মৃতিই হয়তো চিরকালের জন্য মুছে যেতো। কিন্তু ঠিক এই সময়েই আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো।

জেনারেল কানিংহাম তখন ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ঘাটনের কাজে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রপাতের দিক দিয়ে কানিংহামের অবদান অতুলনীয়। খুব প্রাচীন একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে রেলের মালমশলার যোগাড় হচ্ছে—এই খবর শুনে তিনি ১৮৫৬ সালেই হরপ্পা পরিদর্শন করেছিলেন। এখানে তিনি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে যে দুচারটি নমুনা সংগ্রহ করেন, সেগুলো পরীক্ষা করে তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে এগুলো খুবই প্রাচীন। ভারতবর্ষের প্রাচীন এই সভ্যতার যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কানিংহাম ধরতে পেরেছিলেন, সেই সভ্যতা সম্বন্ধে পুরো খবর জানতে আরো সত্তর বছর লেগেছিলো। অবশ্য কানিংহামের আগে ১৮২৬ এবং ১৮৩১ সালে বার্নেস্ এবং মেসন্ নামে দুজন ইংরেজ পর্যটকও এই ধ্বংসস্তূপ লক্ষ্য করেছিলেন। এর পর বহুদিন যাবৎ এই ধ্বংসস্তূপ সম্পর্কে আর কারো কোনো উৎসাহ চোখে পড়ে না। স্যার জন মার্শাল যখন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা, তখন তাঁর উদ্যোগেই প্রথম ১৯২১ সালে হরপ্পার প্রত্নতত্ত্বের কাজ শুরু হয়। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক দয়ারাম সাহনী এটির পরিচালনা করেন। বছরখানেক পরে অবশ্য কাজটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পুরোদমে হরপ্পার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ঘাটনের কাজ চলে। ১৯৪৬ সালে হুইলার এখানে যে কাজ

করেন তার ফলে এই সভ্যতা সম্পর্কে আরো কিছু মৌলিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

রেললাইন পাতবার জন্য ইট যোগাড়ের ফলে হরপ্পার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অনেক ক্ষতি হয়েছিলো; কিন্তু মোহেনজোদারোর ক্ষেত্রে সে রকম ক্ষতি হয় নি। কারণ, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর আগেও এর খবর কারো জানা ছিলো না। আর প্রাচীন এই শহরটি আবিষ্কার করার কৃতিত্ব হলো রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বাঙালী এক প্রত্নতাত্ত্বিকের। ১৯২২ সালে এখনকার মোহেনজো-দারো গ্রামের কাছে একটি উঁচু ঢিবি রাখালদাসের নজরে পড়ে। ঢিবিটার সবচেয়ে উপরে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর তৈরি একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ ছিলো। এই বৌদ্ধস্তূপের নিচে ঢিবি খুঁড়ে রাখালদাস আবিষ্কাব করলেন প্রাচীন একটি পুরোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ। আর, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে হরপ্পার প্রাচীন শহরের সঙ্গে এই শহবের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা গেলো। দুটি শহরই যেন একছাঁচে গড়া, দুটি শহর থেকেই যে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গেলো তা যেন একই মানুষের হাতে তৈরি। প্রায় চারশো মাইল তফাতে অবস্থিত হলেও, এই দুটি শহর যে একই যুগের একই সভ্যতার সৃষ্টি—সে কথা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা গেলো। ১৯২২ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত মোহেনজোদারোয় এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলেছিলো।

হরপ্পা-মোহেনজোদারো আবিষ্কৃত হবার ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের একটা অন্ধকার পর্দা যেন উঠে গেলো। বৈদিক আর্যদের যুগ থেকেই এ যাবৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসের সূচনা ধরা হতো; কিন্তু এ দুটি শহরের সুপ্রাচীন সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করবার ফলে একলাফে ভারতের ইতিহাসের সূচনা প্রায় দেড় হাজার বছর পিছনে চলে গেলো। ভারতের ইতিহাসের আলোচনার মধ্যেও

বিরাট একটি নতুন সমস্যা দেখা দিলো। এ বিষয়ে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আরো আবিষ্কার

শুধু হরপ্পা-মোহেনজোদারো নয়, এই সময়ে, বিশেষত ১৯২০ সালের পর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বেলুচিস্তানের গোটা এলাকা জুড়ে, আরো অনেক প্রাচীন বসতির খোঁজ পাওয়া যেতে লাগলো। পশ্চিম এশিয়ার পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা করে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন সেই অরিয়েল স্টাইন এবং আরেকজন বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার এঁরা দুজন এই এলাকার দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের আনাচে-কানাচে অনেকগুলি ঢিবি বা প্রাচীন বসতি আবিষ্কার করেন। ১৯২৬-২৭ সালে উত্তর বেলুচিস্তানে এবং ১৯২৭-২৮ সালে দক্ষিণ বেলুচিস্তানে স্টাইন, এবং ১৯২৭-৩১ সালে সিন্ধু-উপত্যকায় ননীগোপাল মজুমদার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ চালান। হরপ্পা-মোহেনজোদারোর মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই সমস্ত বসতিগুলো পরীক্ষা করবার সুবিধা এঁদের হয় নি; তবে প্রাথমিক গবেষণা করেই তাঁরা যে সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করেছেন সেগুলো থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিরাট এই এলাকাটিতে বহুকাল আগে থেকেই মানুষের বসবাস চলে আসছে। একদিকে বেলুচিস্তানের প্রাচীন বসতিগুলোর সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার অনেক যোগাযোগ যেমন খুঁজে পাওয়া যায়, অন্যদিকে হরপ্পা-মোহেনজোদারোকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে ওই একই সভ্যতার আরো কতকগুলি নিদর্শন উদ্ঘাটিত হয়। মাটির তৈরি নানারকম পাত্র এবং তাদের গায়ে আঁকা নকশা ও ছবি—বসতিগুলো থেকে প্রধানত এইগুলোই সবচেয়ে বেশি সংগৃহীত হয়, এবং এগুলোই ছিলো এই বসতিগুলোর প্রাচীনতা নির্ধারণের সবচেয়ে

প্রধান উপাদান। ১৯৩৫-৩৬ সালে সিন্ধু প্রদেশে চান্হু-দারো নামে আরেকটি প্রাচীন জায়গা আবিষ্কৃত হয়। আর্নেস্ট ম্যাকের পরিচালনায় এখানে যে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ হয়, তা থেকে হরপ্পা-মোহেনজোদারো সভ্যতার আরো অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৩৮ সালে ননীগোপাল মজুমদার সিন্ধু প্রদেশের কীর্থার পাহাড় অঞ্চলে নতুন গবেষণার কাজ শুরু করেন। খুবই দুঃখের বিষয় যে কাজ শুরু করবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুর্ধর্ষ পাহাড়ী হুর দস্যুদের হাতে তিনি নিহত হন। মৃত্যুর সময় ননীগোপালের বয়স খুব বেশি হয় নি। রাখালদাসের পরে তাঁর মতো প্রতিভা-সম্পন্ন এবং সন্ধানী প্রত্নতাত্ত্বিক ভারতীয়দের মধ্যে খুবই দুর্লভ।

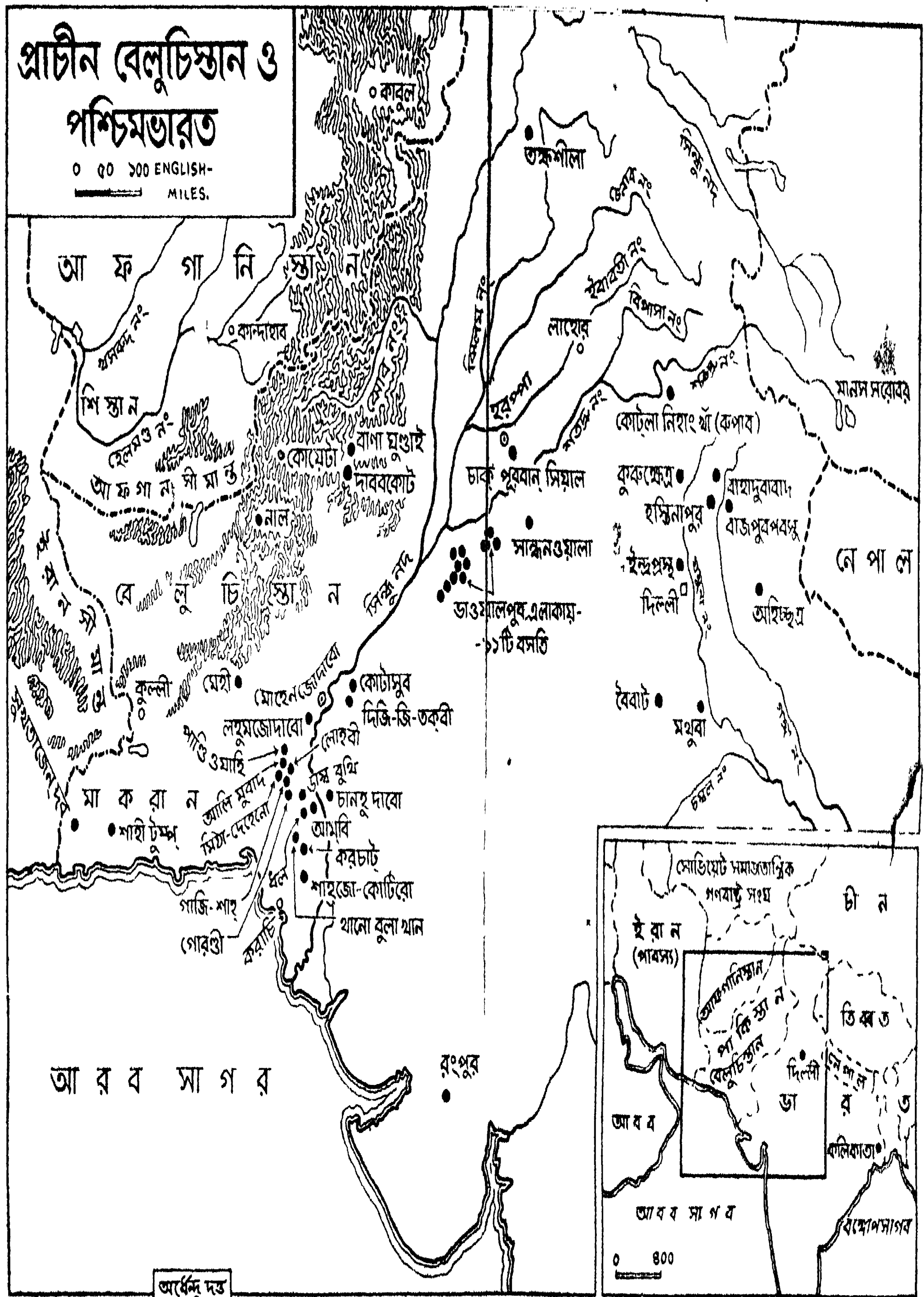
আমরা আগেই বলেছি যে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা বলে যা পরিচিত, সেই সভ্যতা শুধু সিন্ধু নদীর উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। আসলে এই সভ্যতাটি তার চেয়েও বড়ো একটি জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছিলো। সিন্ধু উপত্যকা তার পুবদিকের সীমানা বললেই ঠিক বলা হয়। এমনকি সিন্ধু-উপত্যকার পূর্বেও এই সভ্যতার কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য, এখনকার মানচিত্র অনুযায়ী এ কথাটা বুঝতে একটু মুশকিল হয়; কারণ এখন ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্তান—এ দুটি সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণ দুটি আলাদা দেশ। দশ বছর আগে নতুন আরেকটি দেশ পাকিস্তান গড়ে ওঠবার পর এই সমস্যা আরো বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু যে প্রাচীন সভ্যতার কথা আমরা এখানে আলোচনা করছি, সে সভ্যতা কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর আগের সভ্যতা। হাজার হাজার বছর আগে রুক্ষ এই বিরাট পাহাড়ী এলাকার মধ্যে মধ্যে ঝোব্, মাস্কাই, হাব্, নাল, সিন্ধু প্রভৃতি নদীগুলোর স্নিগ্ধ-শ্যামল উপত্যকায় নতুন পাথরের যুগের চাষবাস-জানা যে মানুষের দল বসবাস শুরু করেছিলো, তাদের কাছে এখনকার এই সীমানাগুলোর

কোনো মানেই ছিলো না। গোটা এই অঞ্চলটিই থিতিয়ে বসার উপযোগী বলে মনে হয়েছিলো বলেই নিশ্চয়ই তারা এখানে বসবাস শুরু করেছিলো। কাজেই এখনকার মানচিত্রের সীমানার সঙ্গে প্রাচীন এই সভ্যতার সীমানার কোনো মিল নেই। আমাদের এই আলোচনায় সে কথাটা মনে রাখা দরকার।

বেলুচিস্তানের আবহাওয়া

বর্তমানে বিরাট এই এলাকাটির আবহাওয়া খুবই রুক্ষ। বৃষ্টির পরিমাণ নগণ্য। বেলুচিস্তানের যে সব অঞ্চলে প্রাচীন বসতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, সে সব অঞ্চল এখন প্রায় জনবিরল। প্রতি বর্গমাইলে দুজন করে লোকও বাস করে না। বেশির ভাগ মানুষ প্রায় যাযাবর। অর্থাৎ, এ অঞ্চলে জলবৃষ্টির পরিমাণ এতো কম, আবহাওয়া এতো রুক্ষ যে চাষবাস করে স্থায়ীভাবে থিতিয়ে বসা যায় না। কিন্তু তাই বলে এ অঞ্চলের আবহাওয়া চিরকালই এই রকম ছিলো না; কারণ মানুষের পক্ষে কোনো কালেই যদি এখানে থিতিয়ে বসা সম্ভব না হতো, তাহলে গোটা অঞ্চলটির আনাচে-কানাচে দীর্ঘস্থায়ী বসতির ধ্বংসাবশেষের উপর প্রায় একশো ফুট উঁচু উঁচু এই ঢিবিগুলো কি ভাবে গড়ে উঠেছিলো? এ অঞ্চলের প্রাচীন বসতিগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বছরের আগেই এ সব জায়গায় চাষবাসের উপর নির্ভরশীল মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিলো। অর্থাৎ এমন এক সময় ছিলো যখন এখানকার আবহাওয়া চাষবাসের পক্ষে, এবং তারই ফল হিসাবে চাষের জমির কাছাকাছি স্থায়ীভাবে থিতিয়ে বসার পক্ষে, নিশ্চয়ই খুব অনুকূল ছিলো। আর এ অবস্থা নিশ্চয়ই যে ছিলো, তারো প্রচুর প্রমাণ অন্যদিক দিয়েও পাওয়া গিয়েছে।

গোটা বেলুচিস্তান তন্ন তন্ন করে ঘুরে স্টাইন সাহেব এই সমস্ত প্রাচীন বসতির কাছাকাছি মানুষের তৈরি অনেকগুলি পাথরের বাঁধ এবং জল নিষ্কাশনের খাল বা নালা লক্ষ্য করেছেন। স্থানীয় ভাষায় এগুলো "গবরবন্ধ" বলে পরিচিত। কতকাল আগের তৈরি সেটা সঠিকভাবে বলা না গেলেও, এগুলো যে একমাত্র চাষবাসের জলসেচের ব্যবস্থার জন্যই তৈরি হয়েছিলো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। দক্ষিণ বেলুচিস্তানের মাসকাই নদীর উপত্যকায় যোলো গজ চওড়া প্রাচীন একটি বিরাট পাথরের বাঁধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরের পাহাড় থেকে বন্যার জল যখন তোড়ে নেমে আসে, তখন সেই জলকে ধরে রাখা এবং নিজেদের ইচ্ছামতো দিকে তাকে পরিচালনা করবার জন্যই যে এটি তৈরি হয়েছিলো সেটা খুবই সুস্পষ্ট। আরেকটু উত্তরে বারো ফুট উঁচু এবং ৩৪৮ গজ লম্বা আরেকটি প্রাচীন বাঁধের ভগ্নাবশেষও টিকে রয়েছে। আর, বিরাট এই পাথরের বাঁধগুলো তৈরি করতে অনেক লোকের একযোগে খাটুনিরও নিশ্চয়ই খুব দরকার হয়েছিলো। অর্থাৎ এখনকার তুলনায় জনবসতির সংখ্যাও নিশ্চয়ই অনেক বেশি ছিলো। এগুলো থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এককালে বেলুচিস্তানে জলবৃষ্টির পরিমাণ বেশ ভালোই ছিলো। এবং প্রচুর জলবৃষ্টি হতো বলেই এখানে মানুষের পক্ষে চাষবাস করা এবং থিতিয়ে বসা সম্ভবপর হয়েছিলো। অনেককাল পরে বেলুচিস্তানের এই আবহাওয়ার মধ্যে একটা বড়ো পরিবর্তন এসেছিলো—আবহাওয়া ক্রমশ শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে উঠেছিলো ; যার ফলে গোটা এই অঞ্চলটিতে চাষবাসের কাজ চালানো আর সম্ভব হয় নি, এবং আস্তে আস্তে চাষবাসের উপর নির্ভরশীল প্রাচীন মানুষের এই সভ্যতাও শুকিয়ে উঠেছিলো। কখন কোন সময় আবহাওয়ার এই পরিবর্তনটি ঘটেছিলো, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে পণ্ডিতদের অভিমত


প্রাচীন বেলুচিস্তান ও পশ্চিমভারত
0 ৫0 ১00 ENGLISH-MILES.
আফগানিস্তান
কাবুল
তক্ষশীলা
কান্দাহার
শিস্তান
কোয়েটা
রাণা ঘুণ্ডাই
দাববকোট
নাল
বেলুচিস্তান
কুল্লী
মেহী
মোহেন্‌জোদারো
কোটাসুব
দিজি-জি-তকবী
লহুমজোদাবো
লোহবী
আলি মুবাদ
চানহু দাবো
আমবি
করচাট
শাহজো-কোটিরো
থানো বুলা খান
গাজি-শাহ
গোরণ্ডী
করাচী
মাকরান
শাহি টুম্প
আরব সাগর
রংপুর
লাহোর
হরপ্পা
চাক পুরবান সিয়াল
সান্ধনওয়ালা
ডাওয়ালপুর এলাকায় ১১টি বসতি
কোটলা নিহাং খাঁ (রূপার)
কুরুক্ষেত্র
হস্তিনাপুর
বাহাদুরাবাদ
বাজপুরপরশু
ইন্দ্রপ্রস্থ
দিল্লী
অহিচ্ছত্র
বৈরাট
মথুরা
নেপাল
মানস সরোবর
সিন্ধু নদ
ঝিলাম নদ
শতদ্রু নদ
বিপাশা নদ
ইরাবতী নদ
চম্বল নদ
সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক গণরাষ্ট্র সংঘ
চীন
ইরান (পারস্য)
আফগানিস্তান
পাকিস্তান
বেলুচিস্তান
দিল্লী
তিব্বত
নেপাল
ভারত
আরব
কলিকাতা
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
0 ৪00
অর্ধেন্দু দত্ত

হলো যে মৌসুমী বায়ুর আকস্মিক গতিপরিবর্তনই ছিলো এর প্রধান কারণ।

সিন্ধু উপত্যকার আবহাওয়া:

সিন্ধু নদীর উপত্যকাতেও ব্যাপারটা প্রায় একই ধরনের। অবশ্য উত্তরে পাঁচনদীর দেশ পাঞ্জাব এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে একটি উর্বরতম অঞ্চল ; কিন্তু দক্ষিণে এখন যা সিন্ধু এবং কাথিয়াবাড় বলে পরিচিত, সে অঞ্চলটি মোটামুটি শুষ্ক এবং রুক্ষ—চাষবাসের পক্ষে তেমন অনুকূল নয়। এখানে সারা বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৬ ইঞ্চি। গরমের সময় প্রায় ১২০ ডিগ্রি গরম। গোটা এলাকাটি প্রায় মরুভূমির মতো; এখানে-সেখানে বাঁধ বেঁধে খানিকটা খানিকটা চাষবাসের কাজ চলে। কিন্তু এই সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো স্বাক্ষর বিশাল শহর মোহেনজোদারো এই অঞ্চলেই অবস্থিত। তাছাড়া, এখনো পর্যন্ত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্পর্কে যেটুকু জানা গেছে, তাতে মনে হয় যে এই সভ্যতার আসল ঝোঁক এবং পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র ছিলো দক্ষিণেরই এই অংশটি। অর্থাৎ এখানকার আবহাওয়াও যে এক সময় চাষবাসের পক্ষে নিদারুণ অনুকূল ছিলো, সেটা প্রায় সুনিশ্চিত। এ বিষয়েও কতকগুলো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমত, আমরা আগেই দেখেছি যে বিপুলভাবে চাষবাস না করলে, এবং প্রচুর পরিমাণে বাড়তি ফসল না হলে প্রাচীন যুগে কোনো শহর গড়ে উঠতে পারতো না। আর সে যুগে মোহেনজোদারো মোটেই ছোটোখাটো একটি শহর ছিলো না। দ্বিতীয়ত, মোহেনজোদারোর যে এক বর্গমাইল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি আগুনে-পোড়ানো শক্ত ইটে ভর্তি। প্রাচীন সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্রে যে সমস্ত সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে, সে সব জায়গার

ইট প্রধানত রোদে শুকানো হতো। কিন্তু হরপ্পা এবং মোহেনজো-দারোয় যে লক্ষ লক্ষ অসংখ্য ইট ব্যবহৃত হতো, তার সবই আগুনে বেশ ভালোমতো পোড়ানো। এতো ইট পোড়াবার জন্য নিশ্চয়ই অজস্র কাঠ পোড়ানো হতো ; অর্থাৎ সে যুগে এই অঞ্চলে আজকের মতো গাছগাছালির কোনো অভাব ছিলো না। গোটা অঞ্চলটি জুড়ে নিশ্চয়ই অনেক বনজঙ্গল তখন ছিলো। আর, প্রচুর জলবৃষ্টি না হলে এতো বন-জঙ্গল কোথা থেকে আসবে? বন-জঙ্গল যে ছিলোই তারও অন্য প্রমাণ আছে। মোহেনজোদারো থেকে যে সমস্ত অজস্র মাটির পাত্র এবং শীলমোহর পাওয়া গেছে সেগুলোর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে তাতে অজস্র গাছগাছালি এবং পশু-পাখির ছবি আঁকা রয়েছে। এই সমস্ত গাছগাছালি এবং গণ্ডার, বাঘ, হাতি, মোষ প্রভৃতি পশু শুকনো রুক্ষ আবহাওয়ায় মোটেই বেঁচে থাকতে পারে না। কাজেই এখনকার তুলনায় এখানকার আবহাওয়া অনেক বেশি আর্দ্র এবং স্যাঁতসেতে ছিলো। অর্থাৎ এখানে যে এক সময় প্রচুর জলবৃষ্টি হতো, সেটা বোঝা যায়। তৃতীয়ত, মোহেনজোদারো শহরের যে বিস্তৃত আলোচনা আমরা এর পরে করবো সেখানে দেখবো যে এই শহরের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো জলনিকাশের জন্য বড়ো বড়ো নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা। প্রচুর পরিমাণে জলবৃষ্টি না হলে এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের কাছে নর্দমা প্রভৃতির ব্যবস্থা এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে নিশ্চয়ই উঠতো না। চতুর্থত, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের যে সমস্ত বিবরণী পাওয়া যায় তাতেও দেখা যায় যে বর্তমান সিন্ধু প্রদেশ এই সময়েও বেশ উর্বর এলাকা ছিলো।

কাজেই, দুহাজার বছর আগে পর্যন্তও সিন্ধু প্রদেশের এই রুক্ষ অঞ্চলটি যে শস্যশ্যামল উর্বর একটি অঞ্চলই ছিলো, সে সম্বন্ধে

কোনো সন্দেহই নেই। পণ্ডিতদের মতে এখানেও মৌসুমী বায়ুর আকস্মিক দিক পরিবর্তনের ফলেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তন ঘটেছিলো। আর, বেলুচিস্তানের ঝোব্ নদী থেকে পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট এই এলাকাটি জল-বৃষ্টির প্রাচুর্যে নিদারুণ শস্যশ্যামল উর্বর ছিলো বলেই এখানে সেই প্রাচীন কালে বিরাট একটি সভ্যতা গড়ে উঠতে পেরেছিলো। এই সভ্যতার বিস্তৃতি এবং প্রচণ্ড উন্নতির স্বাক্ষর শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি চোখধাঁধানো ব্যাপার। হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো এই সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের দুটি উজ্জ্বল আলো। এ দুটি শহর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার আগে এ সভ্যতার আরো খুঁটিনাটি পরিচয় জানবার জন্য বেলুচিস্তানের খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

রানা ঘুণ্ডাই

উত্তর বেলুচিস্তানে ঝোব্ নদীর উপত্যকায় অনেকগুলি প্রাচীন বসতির ঢিবি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রানা ঘুণ্ডাই সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু এই ঢিবিটি খুঁড়ে এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের আদিম বসতি থেকে শুরু করে শেষ পরিণতি পর্যন্ত সব কটি স্তরের ধারাবাহিক ইতিহাস বের করে আনা সম্ভব হয়েছে। গোটা বেলুচিস্তানে প্রাচীন মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস জানবার পক্ষে এখনো পর্যন্ত রানা ঘুণ্ডাই হলো একমাত্র নিদর্শন। এখানে মানুষের বসবাসের ধারাবাহিক ইতিহাসকে মোট পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে নিচের স্তরে, অর্থাৎ সবচেয়ে আদিম বসতির স্তরে, স্থায়ী বসবাসের কোনো চিহ্নই নজরে পড়ে না। প্রায় চোদ্দ ফুট পরিমাণ এই স্তরটির বেশির ভাগ শুধু ছাই-গাদায় ভর্তি। এই স্তরে মাটির তৈরি পাত্রের

যে টুকরো-টাকরা পাওয়া গেছে সেগুলো পরীক্ষা করে বোঝা যায় যে এই পাত্রগুলো যে মানুষরা ব্যবহার করতো তাদের মধ্যে তখনো পর্যন্ত কুমোরের চাক প্রচলিত হয় নি। হাতে হাতেই এগুলো তৈরি হতো। পাথরের যে সমস্ত হাতিয়ার পাওয়া গেছে, সেগুলো থেকেও চাষবাসের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এ সব থেকে মনে হয় যে রানা ঘুণ্ডাইতে যে মানুষরা প্রথম বসবাস শুরু করেছিলো, তারা মোটামুটি শিকার এবং সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল যাযাবর মানুষেরই দল ছিলো। সে যুগে আশেপাশের অঞ্চলে শিকারের পরিমাণ বেশ ভালোমতো মিলতো বলেই হয়তো এই জায়গাটিতে তারা নিয়মিতভাবে বছরের খানিকটা সময় ডেরা বাঁধতো। এর পরের স্তরে রানা ঘুণ্ডাইতে স্থায়ী বাড়িঘর করবার চিহ্ন বেশ সুস্পষ্ট। মাটির পাত্রগুলিও কুমোরের চাকে তৈরি। পণ্ডিতদের মতে রানা ঘুণ্ডাইয়ের এই স্তরটির বসতি খ্রীঃ পূঃ চার হাজার বছরেরও আগের। এর পর স্তরে স্তরে অন্য যে বসতিগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো থেকে চাষবাস-শেখা মানুষের ক্রমোন্নতির ধারাটি বেশ বেরিয়ে আসে। উপরের স্তরের বসতিগুলোর আমলে হরপ্পা-মোহেনজোদারোর সঙ্গে যোগাযোগটা ভালো ভাবেই স্থাপিত হয়েছিলো।

কোয়েটা

উত্তর বেলুচিস্তানের বোলান গিরিবর্ত্মের কাছে এখন যেটা কোয়েটা শহর, তার কাছাকাছি আরো প্রায় পাঁচটি ছোটোবড়ো প্রাচীন বসতির ঢিবির খোঁজ পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ঢিবিটির পরিধি হলো প্রায় ৬০০ ফুট। এটি প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ ফুট উঁচু। মাটির পাত্রের টুকরো-টাকরা ছাড়া এখানে প্রাচীন বসতির অন্য আর কিছু নিদর্শন তেমন না মিললেও, এখানে

যে খ্রীঃ পূঃ ২৯০০ বছর নাগাদ মানুষের ঘন বসতি ছিলো তার নানান প্রমাণ পাওয়া গেছে। যতোদূর মনে হয়, এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের বাড়িঘর সমস্তই কাদামাটি দিয়ে তৈরি হতো। পণ্ডিতদের অভিমত হলো এই যে, এই জায়গাটি কোনো সময়েই একটা শহরে পরিণত হয়ে ওঠে নি; এটা মোটামুটি কৃষি-নির্ভর একটি গ্রামই বরাবর ছিলো।

আমরি-নাল-নান্দারা

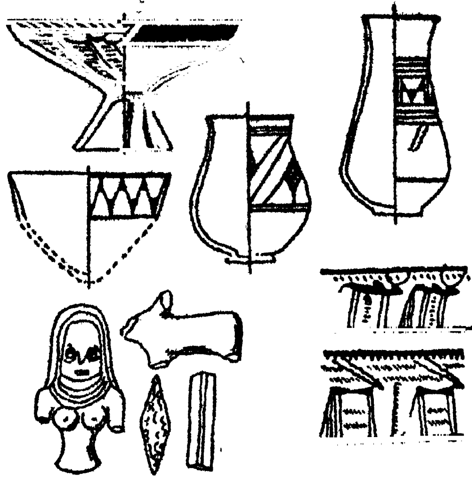
ঠিক এই যুগেরই আরো তিনটি প্রাচীন বসতির পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষিণ বেলুচিস্তানের নান্দারা ও নাল এবং সিন্ধু প্রদেশের আম্‌রি নামে এখনকার জায়গাগুলোতে। এই তিনটি বসতির মোটামুটি যুগ হলো খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ পর্যন্ত। এই ঢিবিগুলো ১০ ফুট থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। এসব জায়গায় যে বসতিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর এক-একটির আয়তন গড়ে দুই একরের মতো। মেসোপটেমিয়ার টেপ্‌গাওরার সবচেয়ে নিচের স্তরের বসতির যে আয়তন, এগুলো প্রায় তার সমান। এ বসতিগুলোর বাড়িঘর মোটামুটি কাদামাটির শুকানো ইট দিয়ে তৈরি হলেও, পাথরের বড়ো বড়ো টুকরোও একাজে ব্যবহার করা হতো। বসবাসের দিক দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ যে বেশ উন্নতি-সাধন করেছিলো, সেটা বাড়িঘর এবং বসতির গোটা পরিকল্পনা থেকেই বোঝা যায়। নান্দারায় বাড়ির ভিতরের দিকের দেয়ালে তো রীতিমতো চুনকামও করা হতো। নান্দারাতে দু-লাইন বাড়ির মধ্যেকার যাতায়াতের রাস্তাগুলো ৬ থেকে ৮ ফুট চওড়া। নাল্‌-এ প্রাচীন অধিবাসীদের একটি প্রকাণ্ড কবরখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কবরখানাটি যে বহুকাল ধরে অধিবাসীদের কবর দেবার জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ

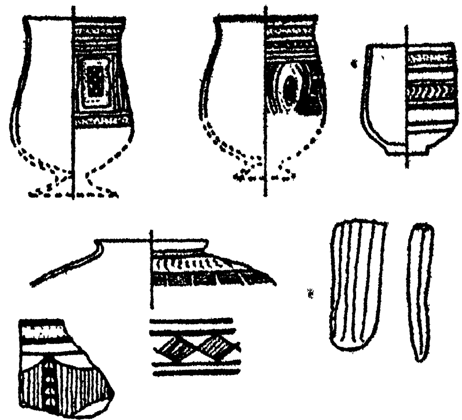
পাওয়া যায়। আর এ থেকেই বোঝা যায় যে এই অঞ্চলে বহুকাল ধরেই মানুষ বসবাস করে এসেছিলো। নাল্-এর এই কবরখানা থেকে এবং নান্দারা থেকে তামার তৈরি অনেক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, এখানকার মানুষ যে তামার ব্যবহারও জানতো যে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

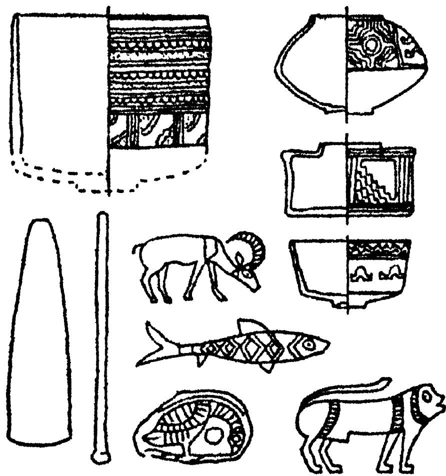
কুল্লী-শাহীটুম্প

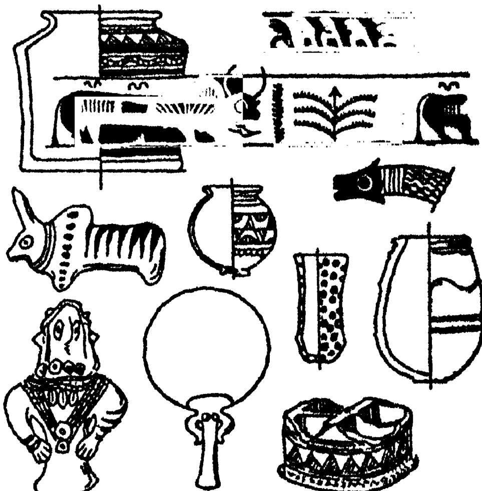
দক্ষিণ বেলুচিস্তানেই কুল্লী বলে একটি জায়গায় খ্রীঃ পূঃ ২৪০০ বছরের আগের আরেকটি প্রাচীন সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। আম্‌রি-নাল-নান্দারার মতো কুল্লীর আদিম বসতিগুলোর আয়তন ছিলো প্রায় দুই একরের মতো। এখানেও বাড়িঘর তৈরির কাজে পাথরের ব্যবহার চালু ছিলো, এবং ভিতরের দিকে দেয়ালে চুনকাম করা হতো। মেঝেতে কাঠের পাটাতন ব্যবহারের চিহ্নও দুই একটি জায়গায় বেশ সুস্পষ্ট। অনেকগুলি বাড়ি খুব সম্ভব দোতলা ছিলো। কুল্লীতে শস্য পেষাই করবার যাঁতা এবং মাটির তৈরি খেলনা গাড়ির চাকা দেখে বেশ বোঝা যায় যে চাষবাসের কাজ এ অঞ্চলে রীতিমতো চালু ছিলো। একদিকে সুমের ও অন্যদিকে মোহেনজোদারোর সঙ্গে কুল্লীর নানাদিক দিয়ে, বিশেষত সওদাগরি বাণিজ্যের বিশেষ যোগাযোগ ছিলো। সুমের-এর বহু জিনিস-পত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ বেলুচিস্তানের সওদাগরি বাণিজ্যের সঙ্গে সুমের-এর যোগাযোগটা বেশ নিবিড় ছিলো। এমনকি সুমের-এর ইতিহাসের শুরুর দিকেই খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ সালে বেলুচিস্তানের বণিকদের সুমেরে যে একটা ঘাঁটি ছিলো তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

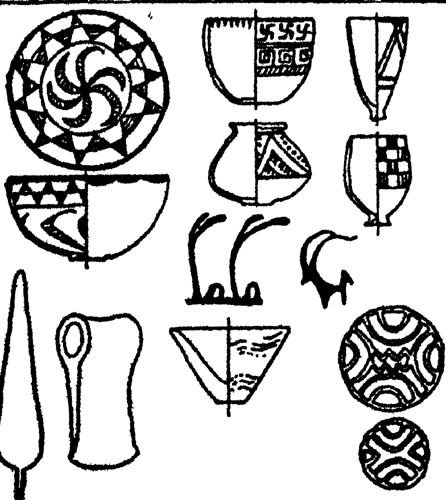
কুল্লীর প্রায় একশো মাইল পশ্চিমে শাহীটুম্প বলে আরেকটি জায়গাতেও খ্রীঃ পূঃ ২০০০ বছর আগের একটি সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটিও মোটামুটি কুল্লীর অনুরূপ।

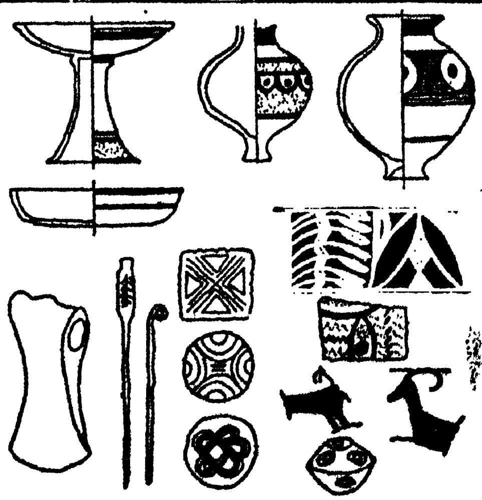

ঝোব


আম্রি


মাল


কুল্লী


শাহীটুম্প


সুকর

বেলুচিস্তান ও সিন্ধু-উপত্যকার বিভিন্ন প্রাচীন বসতিতে পাওয়া মাটির পাত্র এবং নক্সা

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম

বেলুচিস্তানের প্রাচীন সভ্যতার আলোচনাপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। এখানে প্রাচীন সভ্যতার যে কটি বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো পরীক্ষা করে মনে হয় যে এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরা চাষবাস শিখে খাবারের সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই করতে পেরেছিলো; কিন্তু নতুন পাথরের যুগের এই প্রথম বিপ্লব সাধন করতে পারলেও তারা যেন এর চেয়ে বেশি আব এগোতে পারে নি। তামার তৈরি জিনিসপত্র এসব জায়গায় কিছু কিছু পাওয়া গেলেও, সেটা মোটামুটি দুই একটা জায়গাতেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, তামার তৈরি জিনিসপত্রের সংখ্যাও তেমন প্রচুর নয়। একমাত্র নাল-এর করবখানাতেই তামার জিনিসপত্র একটু বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে। এ সব তথ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় যে প্রচুর পরিমাণ বাড়তি খাবার সমাজের হাতে জমা হলে নগর-সভ্যতা বিকাশের যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা সেই পরিমাণ বাড়তি খাবার তখনো পর্যন্ত তৈরি করতে পারে নি। কারণ, এ অঞ্চলের যতোগুলো বসতি এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোনোটাই পুরোপুরি শহর নয়। মনে হয় নতুন পাথরের যুগের কৃষি-ভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামই এগুলো ছিলো। এটা মনে করবার আরো কারণ আছে। এখানকার বিভিন্ন বসতি থেকে মাটির পাত্রের যে সমস্ত অসংখ্য নমুনা পাওয়া গেছে, সেগুলোর ধরন-ধারন এবং ছবি ও নকশার মধ্যে মোটামুটি একটা সাধারণ মিল থাকলেও, এক-একটা বসতির সংস্কৃতির মধ্যে বেশ একটা সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মিলের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যের ঝোঁকটাই যেন বেশি। অর্থাৎ, গোটা বেলুচিস্তান জুড়ে ছড়ানো নতুন পাথরের যুগের এবং খানিকটা তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগেরও বটে, ছোটো-বড়ো এই অসংখ্য বসতিগুলোর মধ্যে নানা

বিষয়ে যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চয়ই ছিলো, কিন্তু একটা দুটো বড়ো শহরকে কেন্দ্র করে এই এলাকার সভ্যতা হয়তো দানা বাঁধতে পারে নি। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা খুবই দরকার যে পুরাতত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা যতো ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে হলে একটা এলাকার পুরো ইতিহাস জানা সম্ভব হয়, এ অঞ্চলে তেমন গবেষণা এখনো পর্যন্ত হয় নি। আগেই বলেছি যে অরিয়েল স্টাইন এবং ননীগোপাল মজুমদার যেটুকু গবেষণা করেছেন, তা মোটামুটি প্রাথমিক গবেষণা। গোটা এলাকার সমস্ত বসতিগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁড়ে খুটিনাটি সমস্ত খবর বের করবার সুযোগ এবং সুবিধা এঁদের হয় নি। কাজেই সে রকম ব্যাপক এবং বিস্তৃত গবেষণা এই অঞ্চলে চালালে এই সভ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আরো অনেক খবর পাওয়া যাবে; এবং এই সভ্যতাটি কতোদূর বিকাশলাভ করেছিলো তখন সেটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।



চূড়ান্ত নগর-সভ্যতা

প্রাচীন এই সভ্যতারই পুব দিকের যে অংশ, অর্থাৎ ভারতবর্ষের এখনকার সীমানার মধ্যে সিন্ধু নদীর উপত্যকা জুড়ে যে অঞ্চলটি সেখানে কিন্তু শুরুতেই একেবারে বিপরীত ছবি চোখে পড়ে। সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতার খুটিনাটি খোঁজ-খবর জানবার আগেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে যা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটা হলো নগর-সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ। হরপ্পা এবং মোহেনজোদারোতে আকাশ-ছোঁয়া পিরামিড বা জিগগুরাট নেই বটে, কিন্তু নগরজীবনের যে

চূড়ান্ত সুখ-সুবিধা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় এ দুটি শহরে পাওয়া যায়, সেদিক থেকে বলা যায় যে মানুষের তৈরি এমন উন্নত নগর-ব্যবস্থা সেই প্রাচীন যুগে আর কোথাও ছিলো না—না সুমের-আক্কাদে, না মিশরে। আধুনিক কালে আমাদের কাছেও এ শহর দুটি একটি প্রকাণ্ড বিস্ময়। জনৈক ইংরেজ পর্যটক মোহেন-জো-দারোর ভগ্নাবশেষ দেখে এমন কথাও বলেছেন যে তিনি যেন ল্যাঙ্কাশায়ার-এর মতো আধুনিক কালের কোনো শিল্পপ্রধান নগরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন। আর, সিন্ধু উপত্যকার যেটা প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটা হলো এই সভ্যতার আগাগোড়া সমস্ত জিনিসপত্র যেন একছাঁচে এক মাপের তৈরি। এমনকি চারশো মাইল তফাতে হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো—এ দুটি শহরও যেন একছাঁচে তৈরি। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্টুয়ার্ট পিগট বলেছেন, এ যেন বিরাট একটি কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য, যার দুই প্রান্তে দুটি



মাটি খোঁড়বার পর এরোপ্লেন থেকে তোলা মোহেনজোদারোর ছবি।

রাজধানী—হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো। এই দুটি শহরকেই পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত করে এখানকার সভ্যতা যে বিকাশলাভ করে-ছিলো—এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীরা যে খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছরের কাছাকাছি ব্যাপকভাবে চাষবাস করে প্রচুর পরিমাণে বাড়তি ফসল ফলিয়ে নতুন পাথরের যুগের দ্বিতীয় বিপ্লবের স্তরও পার হয়ে এসেছিলো, তাও সুনিশ্চিত।

হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো এই সভ্যতার সবকিছুকে ছাপিয়ে থাকলেও, এ অঞ্চলে আরো অনেকগুলি প্রাচীন বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। উত্তরে হবপ্পার কাছাকাছি আরো প্রায় চোদ্দটি এবং দক্ষিণে মোহেনজোদারোর কাছাকাছি আমরি, চানহু-দারো, লহুমজোদারো প্রভৃতি আরো প্রায় সতেরটি ছোটো-বড়ো প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যাপকভাবে প্রত্নতত্ত্বের কাজ চালালে এই ধরনের আরো অনেক বসতির সন্ধান পাওয়া যাবে বলে পণ্ডিতবা মনে কবেন।

হরপ্পা এবং মোহেনজোদারোর আরেকটি বিশেষত্ব হলো এই যে, দুটি শহরের কোনোটিতেই আদিম বসতি থেকে নগরসভ্যতার পূর্ণ বিকাশ—এই ধারাবাহিক ছবি পাওয়া যায় না। হরপ্পার "ঢিবি" খুঁড়ে পরপর ছটি বসতির সন্ধান মেলে; আর মোহেনজো-দারোয় মেলে নটি। অবশ্য এখনো পর্যন্ত মোহেনজোদারোর সব চেয়ে নিচু যে স্তরটিতে পৌঁছানো গেছে, তার নিচেও আরো বসতির অস্তিত্ব হয়তো আছে; তবে সে বসতি এখনো পর্যন্ত খুঁড়ে বের করা সম্ভব হয় নি। কারণ এখনকার সবচেয়ে নিচের স্তরে খুঁড়তে খুঁড়তে যে পরিমাণ জল বেরিয়েছে তা ছেঁচে তুলে ফেলতে না পারলে এখানে আর খোঁড়াখুঁড়ি সম্ভব নয়; আর সে ব্যাপারটা একটা বিরাট কাজ। সে যাই হোক, এ দুটো শহরে এখনো পর্যন্ত



সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া বিচিত্র নকশার নানারকম মাটির পাত্র।

সবচেয়ে নিচের যে স্তর, সেই স্তরেই নগরসভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সমস্ত লক্ষণই সুস্পষ্ট। হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো, এ দুটি শহরের যেন আগা নেই, গোড়া নেই। শুরু থেকেই এ দুটি জায়গায় পরিপূর্ণ নগরসভ্যতার পূর্ণ বিকাশ চোখে পড়ে। কখন কি ভাবে এখানে মানুষের প্রথম বসতি স্থাপিত হয়েছিলো, এবং আদিম সেই বসতি কি ভাবেই বা ধাপে ধাপে নগরসভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছিলো—এ সব খবর আমরা এখনো পর্যন্ত জানি না।

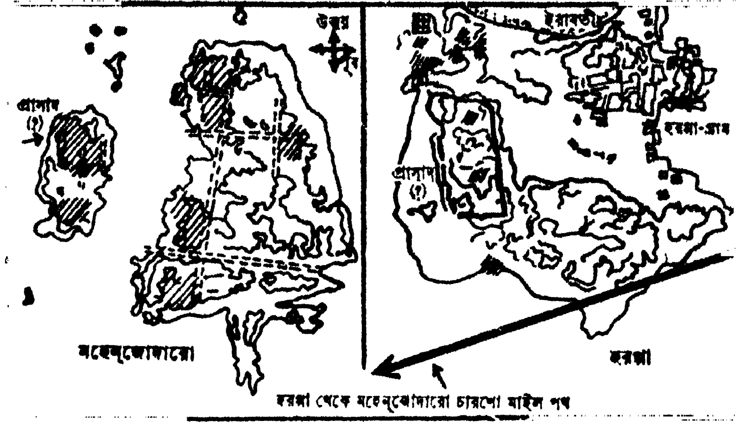
মানুষ

এ দুটি শহরের আদিম বাসিন্দা কারা ছিলো, এবং কারাই বা সে যুগের এই বিস্ময়কর সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো—সে সম্বন্ধেও এখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় নি। পণ্ডিতমহলে এ নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। মোহেনজোদারো, হরপ্পা এবং চানহু-দারো থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি নরকঙ্কাল বা তার টুকরোটাকরা

পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মাটির পাত্রে বা শীলমোহরের গায়ে আঁকা ছবিতে এবং অনেকগুলি ব্রোঞ্জমূর্তিতে মানুষের অনেক আকৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলো সব পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা দেখেছেন যে এখানে কোনো একটি বিশেষ জাতির একচেটিয়া প্রাধান্য চোখে পড়ে না। প্রাচীন অনেকগুলি জাতির মেলামেশার চিহ্নই বেশি। তবে এখানে যে জাতিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে অনেকগুলি জাতির বর্তমান বংশধর এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে বেশ প্রচুর সংখ্যাতেই আছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে এখন যে দ্রাবিড়ভাষাভাষী জাতির বসবাস আছে, অনেক পণ্ডিতের মতে এদেরই পূর্বপুরুষরা সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো। আবার অন্যেরা বলেন যে বৈদিক আর্যদের আগে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীরই আরেকটা দল ভারতবর্ষে এসেছিলো; এ সভ্যতা সেই প্রথম ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির গড়ে তোলা সভ্যতা। আমরা আগেই দেখেছি যে এখনো পর্যন্ত এখানকার লেখার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি; কাজেই এ সভ্যতার অন্য অনেক বিষয়ের মতো, প্রাচীন অধিবাসীদের ব্যাপারটিও লেখার পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। নৃতত্ত্বে জাতিগোষ্ঠীর যে ভাগবিভাগ করা হয়, সে দিক দিয়ে এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে "মেডিটারেনিয়ান্" (সংখ্যায় এরাই সবচেয়ে বেশি), "প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড্", "মঙ্গোলীয়ান" (মাত্র একটি) এবং "আলপাইন"—এ কটি জাতি-গোষ্ঠীর নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে।

দুর্গপ্রাকার

আমরা আগেই বলেছি যে সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতার সবগুলো বসতি এবং প্রায় সমস্ত জিনিসপত্রই যেন একছাঁচে গড়া। এই



হবপ্পা এবং মোহেনজোদারোব ভগ্নাবশেষের চিহ্ন। দুটি শহরেবই পশ্চিম দিকে চৌকোনো দুটি উঁচু ঢিবি (প্রাসাদ ?) দেখা যাচ্ছে।

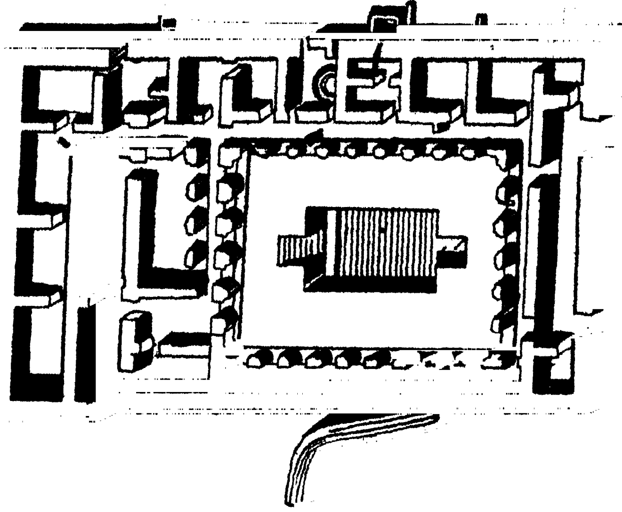
সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের নিদর্শন হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো—প্রায় চারশো মাইল তফাত হলেও, এই দুটি শহরও যেন এক ছাঁচে এক পরিকল্পনায় তৈরি। দুটি শহরই নদীর গা ঘেঁষে গড়ে উঠেছিলো; ইরাবতী নদীর দুটি উপশাখার সঙ্গমে হরপ্পা আর সিন্ধু নদীর গা ঘেঁষে মোহেনজোদারো। দুটি শহরেই রাস্তাঘাট বাড়ি-ঘরের পরিকল্পনা হুবহু একরকম। দুটি শহরেই পশ্চিমদিকের এলাকায় প্রায় একই মাপের দুটি উঁচু উঁচু ঢিবি। উত্তর-দক্ষিণে চারশো গজ লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে দুশো গজ চওড়া। শহরের সাধারণ স্তরের চেয়ে উঁচু এই ঢিবি দুটোর আশেপাশেই শহরের সমস্ত প্রধান এবং বড়ো বড়ো বাড়িঘর অবস্থিত।

এই ঢিবিদুটো সম্পর্কে, বিশেষত ১৯৪৬ সালে হুইলার-এর গবেষণার ফলে হরপ্পার ঢিবি সম্পর্কে এখন প্রায় পুরো খবর জানা গেছে। শুরুর দিকে বন্যার সময় নদীর জল যাতে শহর ভাসিয়ে দিতে না পারে তার জন্য শহরের যে দিকটা নদীর মুখোমুখি সে দিকটাতে বাঁধ দেওয়া হয়েছিলো। এই বাঁধটির উপরেই কালক্রমে

আত্মরক্ষার একটি সুদৃঢ় দুর্গ গড়ে উঠেছিলো। খুব সম্ভব শহরের কর্তাব্যক্তিদের বসবাসের জায়গায়ও ছিলো এখানেই। হরপ্পার বিশেষভাবে উঁচু পশ্চিমদিকের এই ঢিবিটা খুঁড়ে হুইলার আত্মরক্ষার সুদৃঢ় প্রাচীর এবং অন্যান্য ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন। হরপ্পার এই আত্মরক্ষার প্রাচীরটির ভিত প্রায় ৪০ ফুট চওড়া, আর এটি উঁচু ছিলো প্রায় ৩৫ ফুট। মোহেনজোদারোর পশ্চিমদিকের ওই ঢিবিটা অবশ্য এখনো পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে ওঠে নি; তার কারণ ঠিক ওইখানটাতেই খ্রীষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতকে তৈরি একটি বৌদ্ধ স্তূপের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। ঢিবিটা খুঁড়তে হলে বৌদ্ধ স্তূপটির সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হুইলার এবং অন্যান্য পণ্ডিতদেব বিশ্বাস যে মোহেনজোদাবোর ওই ঢিবিটা খুঁড়লে ওখানেও হরপ্পার মতো একটা দুর্গপ্রাকার নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হবে।

স্নানঘর না মন্দির

মোহেনজোদাবোর ওই উঁচু ঢিবিটির লাগালাগি একটি প্রকাণ্ড বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এটিকে আধুনিক পণ্ডিতরা "স্নানঘর" নামে অভিহিত করেছেন। বাড়িটাব মাঝখানে প্রায় ৪০ ফুট লম্বা, ২৪ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীব একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। পুরো চৌবাচ্চাটি সেই আমলের মোহেনজোদারোর সবচেয়ে ভালো ইট দিয়ে তৈরি। বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে চৌবাচ্চায় নামার ব্যবস্থা—দুপাশে দুটি সিঁড়ি। চৌবাচ্চার উপরে একটি চাতাল, তার চারদিক ঘিরে বারান্দা, এবং বারান্দার পিছনে তিনদিকে সারি সারি ঘর এবং বসবার গ্যালারি। বাড়িটার মধ্যেই কতকগুলো কুয়োর সুস্পষ্ট চিহ্ন চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে নোংরা জল বের করে দেবার জন্য ইটবাঁধানো পাইপের ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে বাড়িটা একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়। এটা যদি সত্যিসত্যিই আধুনিক কালের



মোহেনজোদারেব স্নানঘব (ধ্বংসাবশেষ থেকে কল্পিত চেহাবা)।

সাধারণের স্নানঘরের মতো একটি ব্যাপার হয়, তাহলে সেই অতি প্রাচীনকালে মোহেনজোদাবোব মানুষ নিজেদেব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যে কোনো ত্রুটি রাখে নি, সে কথা মানতেই হয়। অবশ্য কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে এ জায়গাটি নগব-দেবতার প্রধান মন্দিরও হতে পাবে। সুমেবের নগবদেবতাদের বিরাট মন্দিরের কথা আমরা এর আগেই বলেছি—এটাও ধর্মের সঙ্গে জড়িত সেই ধরনের একটা ব্যাপার হওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়।

শস্যাগার

স্নানঘর বা মন্দিরের পাশেই রয়েছে আরেকটি প্রকাণ্ড বাড়ি। এটি লম্বায় ২৩০ ফুট, চওড়ায় ৭৮ ফুট। ছোটোবড়ো অনেকগুলি ঘর নিয়ে বিরাট এই বাড়িটি ঠিক কী ছিলো তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে শহরের অন্যান্য বাড়িঘরের সাধারণ পরিকল্পনা থেকে এটি যে সম্পূর্ণ পৃথক সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ

নেই। আর এই বাড়িটির ঠিক দক্ষিণেই রয়েছে আরেকটি বিরাট চতুষ্কোণ বাড়ি। এর প্রত্যেকটি পাশ প্রায় ৮০ ফুট লম্বা—সবটা মিলিয়ে পুরো একটি হল। বিরাট এই হলটির মধ্যে যে বিশটা থাম ছিলো তারও ভগ্নাবশেষ নজরে পড়ে। অনেক পণ্ডিতের মতে এটি শহরের কেন্দ্রীয় শস্যাগার হিসাবেই ব্যবহৃত হতো।

সাধারণ বাড়িঘর

পণ্ডিতরা যাকে দুর্গপ্রাকার বলেই মনে করেন, মোহেনজোদারোর সেই উঁচু ঢিবি এবং তার লাগালাগি বড়ো বড়ো ঐ বাড়িগুলোর পরেই পুবদিকে শুরু হয়েছে শহরের সাধারণ অংশ। প্রায় এক বর্গমাইল আয়তনের এই শহরটির মোটামুটি কাঠামো এখনও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। উত্তর-দক্ষিণ এবং পুব-পশ্চিমে সমান্তরালভাবে টানা কয়েকটি বড়ো রাস্তা—রাস্তাগুলো ন ফুট থেকে তিরিশ ফুট পর্যন্ত চওড়া। আর, সমান্তরাল এই রাস্তা-গুলোর সংযোগে গোটা শহরটি প্রায় বারোটি বড়ো বড়ো অংশে বা পাড়ায় বিভক্ত। এই পাড়াগুলার মধ্যে ছিলো সাধারণ নাগরিকদের বাড়িঘর, দোকানপাট। ভিতরে ভিতরে যাতায়াতের জন্য রয়েছে অসংখ্য অলিগলি। নাগরিকদের অবস্থা অনুযায়ী বাড়িঘরের রকমফের ছিলো। তবে সব বাড়িরই কাঠামোটা প্রায় একই। চারদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা, তারপর বাঁধানো একটা চত্বর পেরিয়ে কতকগুলি ঘর। অনেকগুলো বাড়ি যে দোতলাও ছিলো তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাড়িগুলোর একটা প্রধান বিশেষত্ব ছিলো স্নানঘর এবং জলনিকাশের নালা-নর্দমার ব্যবস্থা। তবে একটি ব্যাপার বড়ো আশ্চর্যের। এ পর্যন্ত প্রায় কোনো বাড়ির ভগ্নাবশেষের মধ্যেই পায়খানার কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ে না। এখনকার তুলনায় আরেকটি আশ্চর্যের বিষয় ছিলো এই

যে কোনো বাড়িরই ঢোকবার দরজা সদর রাস্তার উপরে ছিলো না ; পাশের গলি দিয়েই সব বাড়িতে ঢুকতে হতো।

ক্রীতদাস কারিগরদের বাড়ি

এই বাড়িগুলোর সঙ্গে সঙ্গে শহরের একটি নির্দিষ্ট অংশে একজোটে আর এক ধরনের প্রায় ষোলোটি বাড়ি চোখে পড়ে। আগের বাড়িগুলোর তুলনায় এ বাড়িগুলোর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা অনেক কম। প্রত্যেকটি বাড়ি মাত্র ২০ ফুট লম্বা এবং ১২ ফুট চওড়া—প্রত্যেকটি বাড়ি ছোটো ছোটো দুটি খুপরিতে বিভক্ত। সমান দুটি লাইনে পাশাপাশি সমান মাপের এই ষোলটি বাড়ি যেন আধুনিককালের শহরের গবিব লোকেব বস্তি বা ব্যারাকের মতোই ছিলো। হরপ্পাতেও দুর্গপ্রাকাবের কাছাকাছি এই ধরনেব চোদ্দটি বাড়ি নজরে পড়েছে। এগুলো যদিও মোহেনজোদারোর ওই বাড়িগুলোর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বড়ো, কিন্তু এ বাড়িগুলোও ঠিক একভাবেই তৈরি এবং ওই সমান দুটো লাইনে পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। এ বাড়িগুলোতে যে অবস্থাপন্ন লোকেরা থাকতো না, সেটা সুনিশ্চিত। আজকের দিনের গরিব কারিগর মজুরদের বস্তির মতো এগুলো খুব সম্ভব ক্রীতদাস বা কারিগরদের বসবাসের জন্যই ব্যবহৃত হতো বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। হরপ্পাতে এই বাড়িগুলোর লাগালাগি প্রায় ১০ ফুট ব্যাসের শক্ত ইটের তৈরি কতকগুলি চাতালও চোখে পড়ে। চাতালগুলোর ঠিক মাঝখানটিতে একটি বড়ো গর্ত। ঢেঁকি দিয়ে এখানে শস্য পেষাই করা হতো বলেই মনে হয়, কারণ এগুলোর খাঁজ-খোঁজে গম এবং বার্লির গুড়ো এখনো পর্যন্ত আটকে রয়েছে। এগুলোর পিছনেই ছিলো মোহেনজোদারোর মতোই প্রায় দুশো ফুট লম্বা এবং দেড়শো ফুট চওড়া বিরাট আরেকটি বাড়ি। এটি হরপ্পা শহরের শস্যাগার ছিলো

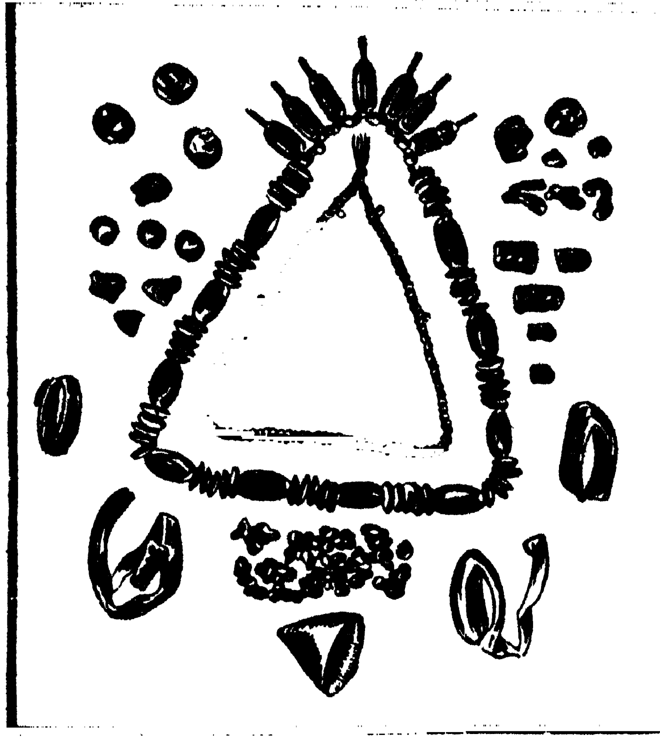
বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। এগুলোর কাছাকাছি আবার কামার-শালের কাজে ব্যবহৃত কতকগুলো বড়ো বড়ো চুল্লীরও সন্ধান পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে শহর দুটির এই অংশটি গরিব ক্রীতদাস এবং কারিগরদের থাকবার এবং কাজ করবারই জায়গা ছিলো। এ যেন আধুনিক কোনো শিল্পোন্নত শহরের কারখানা-অঞ্চল।

নালা-নর্দমা

মোহেনজোদারো শহরের যে বিষয়টি সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং যা আধুনিককালের মানুষের মনেও বিস্ময়েব সঞ্চার করে, সেটা হলো এই শহরের জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থা। শহরের এই এক বর্গমাইল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্বত্র ময়লা জল নিকাশের নালা বা নর্দমার সুব্যবস্থা ছিলো। বড়ো বড়ো রাস্তার নিচে এক ফুট, দু ফুট ব্যাসের কয়েকটি প্রধান নর্দমার সঙ্গে বাড়িঘরের ওই ছোটো ছোটো নালাগুলি সংযুক্ত। মাটির নিচের নর্দমাগুলির অবস্থা যাতে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তার জন্য কিছুদূর অন্তর আজকের যে কোনো উন্নত শহরের মতোই ম্যান-হোলের ব্যবস্থা ছিলো। শহরের সমস্ত ময়লা জল নর্দমা দিয়ে শহরের একেবারে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলা হতো। আবর্জনা জঞ্জাল পরিষ্কার করবারও সুবন্দোবস্ত ছিলো। রাস্তার মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে আবর্জনা ফেলবার পাত্র বসানো থাকতো; আর সমস্ত আবর্জনা শহরের বাইরে একটি গভীর খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হতো। শহরের সমস্ত রাস্তাঘাট আজকের যে কোনো ভালো শহরের মতোই নিয়মিতভাবে আলোকিত করার ব্যবস্থা ছিলো বলেও পণ্ডিতরা মনে করেন।

এক সাম্রাজ্য, এক সংস্কৃতি

হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো—সিন্ধু উপত্যকার এই দুটি প্রাচীন শহরের খুঁটিনাটি যে তথ্য-প্রমাণ মিলেছে, তা থেকে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত হলো যে বিশাল এই এলাকাটি একটি সুসংগঠিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সাম্রাজ্যের দুই প্রান্তে দুটি রাজধানী। প্রচুর সংখ্যায় সমান মাপের ইট এবং মাটির পাত্র, বড়ো শস্যাগার, জন-স্বাস্থ্যের সমান ব্যবস্থা, শস্য পেষাই করবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, গরিব ক্রীতদাস ও কারিগরের বসবাসের ব্যবস্থা—এ সমস্ত তথ্য-প্রমাণ থেকে স্বভাবতই যা বেরিয়ে আসে সেটা হলো গোটা এই সাম্রাজ্যের উপর সুদক্ষ এবং কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনেরই জ্বলন্ত উদাহরণ। আগেই বলেছি সে শহর দুটির যে পরিচয় এখনো পর্যন্ত জানা গেছে তার প্রায় সবটাই হলো পুরোপুরি নগর-সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের পরিচয়। হরপ্পার ছটি বসতির স্তর এবং মোহেনজোদারোর নটি বসতির স্তর—পণ্ডিতদের হিসাবে এগুলির মিলিত সময়কাল প্রায় এক হাজার বছর। কিন্তু এই হাজার বছর ধরে পুরোনো ধ্বংসস্তূপের উপর বারবার নতুন যে বসতি গড়ে উঠেছিলো, সেগুলো ঠিক এক জায়গায়, এক মাপে, পুরোনো বসতির এক ছাঁচেই গড়ে উঠেছিলো। শুধু তাই নয়, এমনকি রাস্তাঘাট বাড়িঘরের কাঠামোটাও এই হাজার বছর ধরে হুবহু এক ছিলো। মোহেনজোদারোর সবচেয়ে নিচের স্তরের আদিম বসতির নালা-নর্দমা এবং রাস্তাঘাটের সঙ্গে সবচেয়ে উপরের স্তরে এই সভ্যতার শেষ বসতির নালা-নর্দমা ও রাস্তাঘাটের পরিকল্পনার মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। হরপ্পাতেও তাই। আর, এই হাজার বছর ধরেই দুটি শহরের মাটির পাত্র, ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, শীলমোহর, গয়নাগাঁটি, ছবি, লেখার হরফ সব কিছুর মধ্যেই একটানা একটা মিল চোখে পড়ে। সুদৃঢ় দীর্ঘস্থায়ী একটি শাসনব্যবস্থা ছাড়া সুদীর্ঘকালব্যাপী



সিন্ধু-উপত্যকায় অধিবাসীদের ব্যবহৃত গয়নাগাটি।

এই ধরনের আশ্চর্য মিলের অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

রাষ্ট্রব্যবস্থা

অবশ্য, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার রাষ্ট্র সংগঠন ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যেটুকু ধারণা করা যায় তা ওই শহর দুটির চেহারা এবং সেখান থেকে পাওয়া জিনিসপত্র থেকেই পণ্ডিতরা অনুমান করেন। সুমের-আক্কাদ বা মিশরের প্রাচীন রাষ্ট্রসংগঠন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যতোখানি সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতা সম্পর্কে ততোখানি সুনিশ্চিতভাবে এখনো পর্যন্ত কিছু

বলা যায় না। কারণ এ বিষয়ে যা সবচেয়ে খাঁটি খবর দিতে পারে, সেটা হলো প্রাচীন লেখাগুলো। সুমের এবং মিশরের প্রাচীন লেখাগুলো আন্তোপান্ত পড়া সম্ভব হয়েছে বলেই এ দুটি সভ্যতার সমস্ত খুঁটিনাটি খবর আমরা আজ নিশ্চিতভাবে জানি। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে সব কিছু জানবার প্রধান বাধাই হলো এই ব্যাপারে। হরপ্পা এবং মোহেনজোদারোর মাটি খুঁড়ে এই সভ্যতার মানুষের লেখাযুক্ত অজস্র শীলমোহর পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে এখনো পর্যন্ত এই লেখাগুলোর সঠিক এবং সর্ববাদিসম্মত পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। কাজেই এই সভ্যতার প্রাচীন অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণা কী ছিলো, তাদের রাষ্ট্রসংগঠন এবং সমাজ-ও-শাসন-ব্যবস্থা কেমন ছিলো— এ সব বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার সময় এখনো আসে নি। এর জন্য শীলমোহরের গায়ের ওই লেখাগুলোর পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

শ্রেণীবিভাগ

তবে এ সব বিষয়ে কতকগুলি কথা আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি। প্রথমত নগর-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ যে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো সেটা সুমের মিশর এবং অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস থেকে সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়। কাজেই এ সভ্যতার মানুষের সমাজেও নিশ্চয়ই ওই শ্রেণী-বিভাগ দেখা দিয়েছিলো। আর, হরপ্পা-মোহেনজোদারোর ছোটো ছোটো খুপরিওয়ালা ব্যারাকের মতো এক মাপের বাড়িগুলো, কেন্দ্রীয় শস্যাগার এবং কেন্দ্রীয়ভাবে শস্য পেষাইয়ের ব্যবস্থা, এগুলো সম্বন্ধে পণ্ডিতদের অনুমান যদি অভ্রান্ত হয়, তাহলে সমাজের এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। ধনসম্পদের বেশির

ভাগ মালিকানা যে উঁচু শ্রেণীর হাতেই ছিলো, তারও প্রমাণ হলো যে এখানকার মাটি খুঁড়ে দামী, সুদৃশ্য এবং সূক্ষ্ম কারিগরির যে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, তার সবই প্রায় পণ্ডিতরা যাকে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িঘর বলেছেন সেগুলোর আনাচ-কানাচ থেকেই পাওয়া গেছে। অবশ্য, হরপ্পার ওই ব্যারাক বাড়িগুলো থেকেও এ ধরনের কিছু কিছু জিনিস বেরিয়েছে। মোহেনজোদারোর দুর্গপ্রাকারের গায়ে-লাগা ওই বিস্ময়কর বাড়িটি যদি সত্যিসত্যিই স্নানঘর হয়, তাহলে এই সমাজের অবস্থাপন্ন লোকের জীবনে যে কি পরিমাণ বিলাস-ব্যসনের আয়োজন ছিলো—তারও খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

ধনসম্পদের মালিকানা যাদের বেশি ছিলো রাষ্ট্র সংগঠনের কর্তাব্যক্তিও নিশ্চয়ই তারাই ছিলো। প্রাচীন সুমের-এর মতো এরা সংগঠিত পুরোহিত শ্রেণী ছিলো, না মিশরের মতো রাজা-কেন্দ্রীক সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ছিলো, সেটা সঠিকভাবে বলা যায় না। সুমের-এর নগরগুলিতে মন্দিরের যে প্রাধান্য নজরে পড়ে, এখানে সেটা তেমন নজরে পড়ে না। অবশ্য, মোহেনজোদারোর ওই বিরাট স্নানঘরটি আসলে নগর দেবতারই বিরাট মন্দির ছিলো কিনা সেটা মনে করবারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তা ছাড়া, আগেই বলেছি, পণ্ডিতরা যাকে দুর্গপ্রাকার বলে মনে করেছেন, মোহেনজোদারোর সেই উঁচু বৌদ্ধ স্তূপওয়ালা ঢিবিটা ভালো করে খুঁড়লে এ সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

সওদাগরি ব্যবসা

অন্যদিক দিয়ে আবার এই সভ্যতার, বিশেষত এই দুটি শহরের আরেকটা ব্যাপার, খুব বেশি করে নজরে পড়ে। শহর পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এই সভ্যতার সমস্ত কিছুর মধ্যে সওদাগরি ব্যবসার

প্রাধান্যের ছাপটা খুবই সুস্পষ্ট। রাস্তাঘাটে দোকান-পাটের ছড়াছড়ি। নিজেদের ব্যবহারের চেয়ে সাধারণ বাজারে বিক্রি করবার জন্যই যেন সমস্ত জিনিসপত্র প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতো। মোহেনজোদারোর রাস্তায় দোকানপাট অঞ্চলে সাধাসিধে মাটির পাত্রের অজস্র টুকরো পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। জল বা অন্য কোনো পানীয় খাবার জন্যই লোকে এগুলো ব্যবহার করতো, এবং আজকের মতোই জল খাওয়া হয়ে গেলে পাত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দিতো। এ ধরনের পাত্র নিশ্চয়ই এতো প্রচুর সংখ্যায় তৈরি হতো যে এগুলোকে সযত্নে রেখে দেবার কথা কারো মনেই উঠতো না। কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতি প্রভৃতি বিশিষ্ট কারিগরশ্রেণী নিজের নিজের কাজ করে যেতো। তাদের তৈরি জিনিসপত্র সওদাগররা শুধু দেশের বাজারেই বিক্রি করতো না, দূরদূরান্তে বিদেশেও চালান দিতো। বিদেশ থেকে বহু দরকারী জিনিসপত্র তারা আমদানিও করতো। বেলুচিস্তান আফগানিস্তান এবং ইরান থেকে আনা হতো সোনা, রুপো, সীসে, টিন প্রভৃতি নিতান্ত দরকারী ধাতু। রাজপুতনা থেকে আসতো প্রধানত তামা। সুদৃশ্য কাজের জন্য কাথিয়াবাড় থেকে আনা হতো শাঁখ। দক্ষিণ ভারতের আরো নানা জায়গা থেকে আসতো হরেক রকম দামী পাথর এবং সৌখীন জিনিসপত্র।

এ সভ্যতায় ব্যবসাবাণিজ্যের যে খুবই প্রসার ছিলো, দূরদূরান্তে এই সভ্যতারই কয়েকটি ঘাঁটি থেকে সেটা আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমে ইরান সীমান্তে মাকরান উপকূলে সুত্কাজেন-দর, বেলুচিস্তানের মেহী এবং ডাবর-কোট, এবং দক্ষিণে কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণ সীমান্তে রংপুর—এগুলো সবই হরপ্পা-মোহেনজোদারোর সওদাগরি-বাণিজ্যের ঘাঁটি হিসাবেই গড়ে উঠেছিলো বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এই সমস্ত ঘাঁটি-মারফত সে যুগে সুমের-এর সঙ্গেও

যে এই সভ্যতার নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিলো, তা আমরা আগেই দেখেছি। হরপ্পা-মোহেনজোদারোর পাথরের জিনিস, নকশা-কাটা মাটির পাত্র এবং শীলমোহর সুমেরে পাওয়া গেছে। সুমের-এরও কিছু কিছু জিনিসপত্র এখানে পাওয়া গেছে। রপ্তানি-জিনিসপত্রের মধ্যে যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটা হলো এখানকার তৈরি তুলোর কাপড়-চোপড়। সমসাময়িককালে পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় তুলো দিয়ে কাপড়-চোপড় তৈরি করবার নজির চোখে পড়ে না। সুমের এবং মিশরে এর অনেকদিন পরে তুলোর ব্যবহার চালু হয়েছিলো। বস্তুত সুমের-এর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই যোগাযোগ থেকেই সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সময়কালের একটা নির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায়। হরপ্পা-মোহেনজো-দারোর যে সমস্ত জিনিসপত্র সুমেরে পাওয়া গেছে, তার সবই পাওয়া গেছে সারগন-প্রতিষ্ঠিত আক্কাদ-রাজবংশের আমলে বা তার পরে। খ্রীষ্ট পূর্ব ২৩০০ সালে সারগন-এর অভ্যুত্থান হয়। সুতরাং এই সময় নাগাদ সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা যে পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করেছিলো, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। গোটা সভ্যতার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই প্রচণ্ড প্রভাব থেকে এমন সিদ্ধান্তও করা যায় যে এখানকার রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী ছিলো প্রধানত ওই সওদাগর বণিকরাই।

শিল্পকলার উন্নতি

হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো থেকে মাটির যে সমস্ত পাত্রের টুকরোটাকরা আবিষ্কৃত হয়েছে তার গায়ে আঁকা নকশা ও ছবি থেকে শিল্পকলার উন্নত বিকাশ ধরা পড়ে। পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহার একেবারে উঠে না গেলেও এ সভ্যতার মানুষের সমাজে ব্রোঞ্জের ব্যবহার পুরোপুরি চালু ছিলো। ব্রোঞ্জের তৈরি ছুরি,

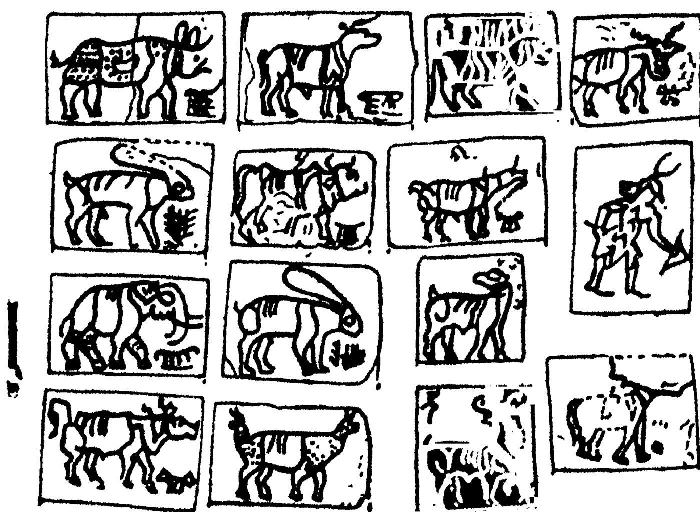


সিন্ধু-উপত্যকায় পাওয়া তামার তৈরি হাতিয়ারের দু-একটি নমুনা।

করাত, কাস্তে, ক্ষুর, পিন, এমনকি মাছ ধরার বঁড়শি যেমন একদিকে গেরস্থালির কাজে ব্যবহৃত হতো, তেমনি অন্যদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যবহৃত বর্শা, কুঠার, ছোটো তলোয়ার, এবং তীরের সূচ্যগ্রমুখও অনেক পাওয়া গেছে। এই সমস্ত জিনিসপত্র, এবং বিশেষভাবে পাথর এবং ব্রোঞ্জের তৈরি অনেকগুলি মূর্তি শিল্পকলার আশ্চর্য উন্নতির পরিচায়ক। মোহেনজোদারো থেকে পাওয়া দাড়িওয়ালা মানুষের মূর্তি, কিংবা ব্রোঞ্জের তৈরি নর্তকীর মূর্তি, এবং হরপ্পার বেলে-পাথরে তৈরি মুণ্ডহীন মানুষের নগ্ন মূর্তি শিল্প ও ভাস্কর্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আর অসংখ্য শীলমোহরের উপর যে সমস্ত জীবজন্তু, গাছগাছালি ও মানুষের ছবি আঁকা আছে সেগুলোর উৎকর্ষ তো প্রায় অতুলনীয়।



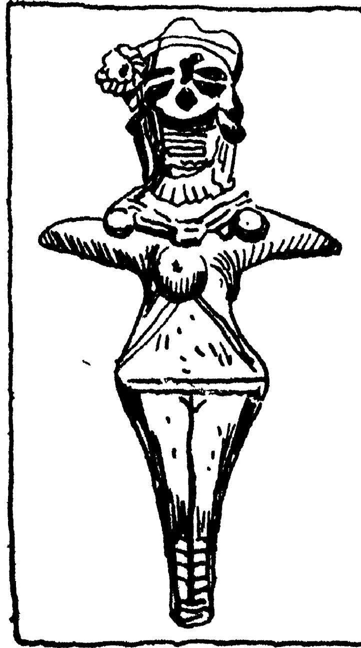
ছোটো ছেলেমেয়েদের খেলার পুতুল।



শীলমোহরের গায়ে আঁকা নানারকম জীবজন্তু।

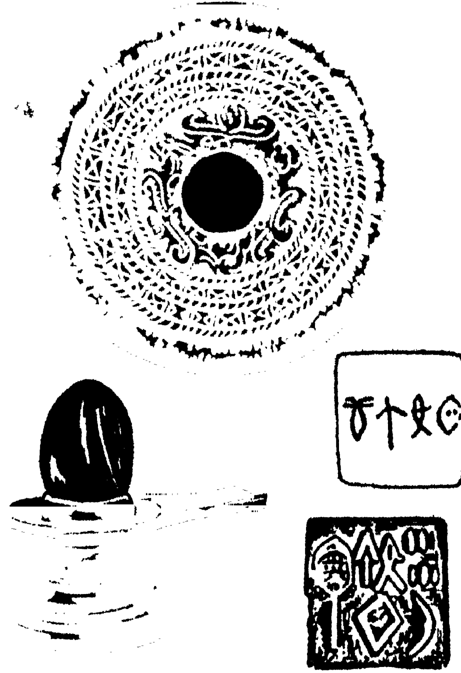
ধর্ম

হরপ্পা-মোহেনজোদারো আবিষ্কৃত হবার পর ভারতের ধর্মবিকাশের ইতিহাসও অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে এসেছে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে এখানে ব্যাপকভাবে দেবী মাতৃকার আরাধনা প্রচলিত ছিলো; কারণ এখানে মাটি এবং পাথরের তৈরি অসংখ্য নারী মূর্তির এমন ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়, এবং সেগুলির ধরন-ধারন এমন যে, পূজা-উপাসনা ছাড়া এগুলির অন্য কোনো ব্যবহার ছিলো বলে মনে হয় না। শিবলিঙ্গের মতো অনেকগুলি পাথরের লিঙ্গও এখানে পাওয়া গেছে। তাছাড়া আঁকা ছবিতে জীবজন্তুপরিবৃত অবস্থায় শিং-যুক্ত এমন একটি মূর্তি চোখে পড়ে যাকে মার্শাল সাহেব পশুপতি শিব বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য আদিম মানুষের মতো গাছপালা, পশুপাখি এবং নদীনালার উপাসনাও এখানে





এই ধরনের অজস্র নারীমূর্তি এখানে পাওয়া গেছে।

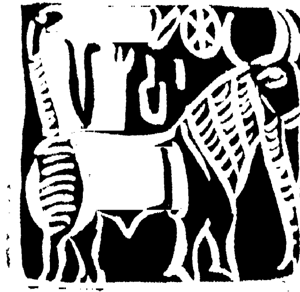


হরপ্পায় পাওয়া শিবলিঙ্গ। ডানদিকে দুটি শীলমোহর, উপরে একটি নকশা।



পশুপতি শিব ?

প্রচলিত ছিলো। এখানকার মানুষ মৃত্যুর পরে জীবনেও যে বিশ্বাস করতো, তারও পরিচয় পাওয়া যায় মৃতদেহ কবরের পদ্ধতি থেকে। মৃতদেহের সঙ্গে এখানেও নানারকম জিনিসপত্র, খাবার-দাবার কবরের মধ্যে রেখে দেওয়া হতো।











সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরের কয়েকটি নমুনা।

বিলুপ্তি

হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো—সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন নগর-সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের এই দুটি শহর যে খ্রীষ্ট পূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০ পর্যন্ত মহা আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের সঙ্গেই টিঁকে ছিলো, সে বিষয়ে পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু এই সভ্যতার সুস্পষ্ট সূচনাও যেমন চোখে পড়ে না, তেমনি বিরাট উন্নত এই সভ্যতা কখন কিভাবে ভেঙে পড়লো, সেটাও এখনো পর্যন্ত ভালোভাবে জানা যায় নি। অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে পণ্ডিতরা নানান জায়গার মাটি খুঁড়ে এ প্রশ্নের উত্তর বের করবার চেষ্টা করেছেন, এবং এখনো করছেন। এখনো পর্যন্ত যা জানা গেছে, তা থেকে একদল পণ্ডিতের মত হলো যে বন্যা এবং প্রাকৃতিক কোনো নিদারুণ বিপর্যয়ের ফলেই এ সভ্যতার বিলুপ্তি হয়েছিলো। বন্যায় যে মোহেনজোদারো শহরটি অন্তত বারবার বিধ্বস্ত হয়েছিলো, তার খুবই সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। আবার মৌসুমী বায়ুর আকস্মিক দিক পরিবর্তনের কথাও আমরা আগে আলোচনা করেছি। অন্যদিকে, বিশেষত ১৯৪৬ সালে হরপ্পার দুর্গপ্রাকার আবিষ্কার করার পরে হুইলার এবং পিগট্-এর মত হলো যে বাইরের দুর্ধর্ষ কোনো অভিযানকারী জাতির আক্রমণের ফলেই হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো শহর দুটি বিধ্বস্ত হয়েছিলো। এঁদের মতে ভারতের বুকে নতুন এই অভিযানকারীদের দলই ছিলো বৈদিক আর্যদের দল। হরপ্পা এবং মোহেনজোদারোর ওই দুর্গ-প্রাকারের অস্তিত্ব, বিশেষত এই সভ্যতার শেষাশেষি সময়ে হরপ্পার দুর্গপ্রাকারের পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক চেহারা, এবং গোটা বেলুচিস্তান এবং পশ্চিম ভারত জুড়ে পুরোনো সভ্যতার অনেকগুলি ঘাঁটি, যেমন রানা ঘুণ্ডাই, নাল, ডাবর-কোট, প্রভৃতি বিধ্বস্ত হবার সুস্পষ্ট চিহ্ন, এই সমস্ত তথ্য এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অনুকূল। তাছাড়া

ঠিক এই সময় নাগাদ শাহীটুম্প-এর একটি কবরখানা এবং রানা ঘুণ্ডাই ও চান্হু-দারোর সমসাময়িক বসতির স্তরগুলি থেকে, এবং অন্য অনেকগুলি কবরখানা থেকে যে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গেছে সেগুলোর সঙ্গে হরপ্পা-মোহেনজোদারোর সংস্কৃতির মিল খুবই কম। এ বিষয়ে আরেকটি সাক্ষ্য পাওয়া যায় বৈদিক আর্যদের রচিত সাহিত্য—ঋগ্বেদ-এ। ঋগ্বেদ-এ বিজাতীয়দের দুর্গআক্রমণকারী ও বিধ্বংসকারী পুরন্দরের যেভাবে বারবার উল্লেখ আছে, তা থেকে মনে হয় যে অভিযানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক আর্যরা অনেকগুলি সুরক্ষিত নগর ধ্বংস করেছিলো। আর এই সুরক্ষিত নগরগুলি বেলুচিস্তান এবং সিন্ধু উপত্যকার এই প্রাচীন নগরগুলি ছাড়া অন্য কি হতে পারে? সিন্ধু উপত্যকার এই সুপ্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। সেটা হলো এই যে খ্রীষ্টপূর্ব দুহাজার বছরের পর থেকেই গোটা পশ্চিম এশিয়ার বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাচীন সভ্যতার এই কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন বর্বর জাতির অভিযান বারবার চলেছিলো। এই সময়েই হিট্টাইট্, ক্যাস্সাইট্, মিতানী, প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বর্বর ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অভিযান ঘটেছিলো। ভারতের বৈদিক আর্য জাতিও এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর সমজাতিক। বস্তুত, এশিয়া মাইনরের বোগাজ্-কুই শহরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ সালে মিতানীদের একটি শিলালিপিতে ভারতের বৈদিক আর্যদের প্রধান প্রধান দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতির সুস্পষ্ট উল্লেখও পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই সময় নাগাদ বৈদিক আর্যদের পূর্বাভিমুখী অভিযান যে বেশ অগ্রসর হয়েছিলো, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

অন্ধকার যুগের আলো

বৈদিক আর্যদের অভিযানেই সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা বিধ্বংস হয়েছিলো—এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা

থেকে সেইটাই খুব বেশি বলে মনে হয়। অবশ্য প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়ে আরো বিস্তৃত, ব্যাপক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা না হলে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এখনো করা যায় না। প্রত্নতত্ত্বের দিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার বিকাশ এবং বৌদ্ধ যুগ—এর মধ্যে প্রায় হাজার বছরের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি মেলে নি। অথচ, এই সময়টাতেই ভারতে বৈদিক আর্যদের সভ্যতার সূচনা এবং বিকাশলাভ ঘটেছিলো সেটা সুনিশ্চিত। কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এখনো পর্যন্ত গোটা এই যুগটি "অন্ধকারের যুগ"-ই হয়ে আছে। এখনো পর্যন্ত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক আর্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং বৈদিক আর্যদের আগমন ও বৈদিক সভ্যতার বিকাশের প্রকৃত ইতিহাসের তেমন তথ্য-প্রমাণ উদ্ঘাটিত হয় নি। বৈদিক আর্যদের রচিত সাহিত্য "ঋগ্বেদ"-ই এখনো পর্যন্ত বৈদিক আর্যদের সম্পর্কে জানবার একমাত্র উপাদান। প্রত্নতত্ত্বের অভ্রান্ত নির্দেশ এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো আলোকপাত করতে পারে নি। অবশ্য কয়েক বছর হলো এই যুগের প্রত্নতত্ত্বের কাজের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে ইতিমধ্যেই রূপার, কোটলা নিহাঙ, চান্হুদারো, বাহাদুরাবাদ, হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র প্রভৃতি জায়গায় অনেকগুলি প্রাচীন বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষে যে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গেছে সেগুলো থেকে হরপ্পা-মোহেনজোদারো সভ্যতার পরের যুগের ভারতবর্ষের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্বের আরো ব্যাপক কাজ ছাড়া প্রাচীন ভারতের পুরো ইতিহাস জানা যাবে না। আমরা আশা করি ভারতের মাটি খুঁড়ে আর কিছু-দিনের মধ্যেই এই ইতিহাস আমরা পুরোপুরি জানতে পারবো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এশিয়া মাইনর ও ক্রীট

টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস্, নীল এবং ঝোব্-সিন্ধু, এই নদীগুলির উপত্যকায় যে সভ্যতাগুলি বিকাশলাভ করেছিলো মানুষের ইতিহাসে সেইগুলোই হলো প্রথম এবং প্রাচীনতম সভ্যতা। নীল নদী থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে প্রধানত পশ্চিম এশিয়ার বুক জুড়ে, নতুন পাথরের যুগের বিভিন্ন মানুষের দল কিভাবে চাষবাস শিখে, বাড়তি ফসল ফলিয়ে ধাপে ধাপে নগর-সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছিলো, তা আমরা এতোক্ষণ আলোচনা করলাম। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের কিছু আগে-পরে এই সভ্যতাগুলো বিকাশলাভ করেছিলো।

ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা

বাড়তি ফসল ছাড়া প্রাচীন এই সভ্যতাগুলোর বিকাশের একটি প্রধান ভিত্তি ছিলো তামা এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহার। তাই প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়ে এই সভ্যতাগুলোকে ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য, আমরা আগেই দেখেছি যে তামা এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহার সমাজে চালু হলেও মানুষ পাথরের ব্যবহার পুরোপুরি ছাড়তে পারে নি। সেই কারণে মানুষের অগ্রগতির এই ধাপটিকে পণ্ডিতরা পাথর এবং তামা-ব্রোঞ্জ (chalcolithic) যুগের সভ্যতা বলেও অভিহিত করেছেন। মানুষের সমাজে এর

পরের যে অগ্রগতি সেটা সম্ভব হয়েছিলো লোহার ব্যবহার-আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে। খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার থেকে দেড় হাজার বছরের মধ্যে খুব সম্ভব এশিয়া মাইনর অঞ্চলেই মানুষের সমাজে প্রথম লোহার ব্যবহার চালু হয়েছিলো; এবং খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছরের কাছাকাছি এইটাই হয়ে উঠেছিলো মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে লেখার ইতিহাসে ধ্বনি-ভিত্তিক বর্ণমালার আবিষ্কারও ব্রোঞ্জযুগের এই সভ্যতার স্তর থেকে মানুষকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলো।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের আবির্ভাব

লোহার ব্যবহার পুরোপুরি চালু হবার আগে, অর্থাৎ লোহার যুগ শুরু হবার আগে, ব্রোঞ্জ-যুগে মানুষের যে প্রাচীন সভ্যতাগুলো বিকাশ লাভ করেছিলো, তার প্রধান তিনটি ঘাঁটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই তিনটি ঘাঁটি ছাড়াও ব্রোঞ্জ-যুগের আরেকটি প্রাচীন সভ্যতার ঘাঁটি ছিলো পশ্চিম এশিয়ার পশ্চিমতম প্রান্তে, এখন যে অঞ্চলটি তুরস্ক বলে পরিচিত। আগে এর নাম ছিলো এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়া। অবশ্য এখানকার এই সভ্যতা সুমের-আক্কাদ, মিশর বা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার মতো সুপ্রাচীন নয়; কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছরের কাছাকাছি যে এই সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিলো, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম এই সভ্যতাগুলো জাতিগত দিক দিয়ে কোন কোন জাতির অবদান ছিলো, সে সম্বন্ধে দুই-একটি ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলেও, এগুলো যে প্রধানত সেমিটিক জাতি-গোষ্ঠীরই কীর্তি ছিলো সে সম্বন্ধে পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই একমত। এর পরের যুগে, অর্থাৎ লোহার যুগে, ইউরোপ এবং এশিয়ায়

সভ্যতার অগ্রগতির পথে যে জাতিগোষ্ঠীর প্রবল প্রাধান্য চোখে পড়ে, পণ্ডিতরা তাকে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছেন। পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতার ইতিহাসে ইন্দো-ইউরোপীয় এই জাতিগোষ্ঠীর আদৌ কোনো অবদান ছিলো কিনা এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে কিছুকাল আগে পর্যন্তও প্রচুর সন্দেহ ছিলো। কিন্তু চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর হলো এশিয়া মাইনরের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা হবার ফলে এই সন্দেহের নিরসন ঘটেছে; কারণ দেখা যাচ্ছে যে খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছরের কাছাকাছি এশিয়া মাইনরে মিতানীয়ান, হিট্টাইট্, ক্যাস্সাইট্, প্রভৃতি কয়েকটি জাতির প্রবল প্রতাপ ছিলো; আর নানারকম সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে পণ্ডিতরা এখন প্রায় সকলেই একমত যে এই জাতিগুলো সবাই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠী

ইন্দো-ইউরোপীয় এই জাতিগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান কোথায় ছিলো, তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে; তবে কৃষ্ণসাগর, ককেশাস্, কাস্পিয়ান সাগর এবং তুর্কীস্থানের উত্তরে যে অঞ্চল, সেই অঞ্চলেই এদের প্রথম বাসস্থান ছিলো বলে এখনো পর্যন্ত বেশির ভাগ পণ্ডিতের মত। অবশ্য, বিখ্যাত ভারতীয় বিদ্বান বাল গঙ্গাধর তিলক নানারকম তথ্য-প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এদের আদি বাসস্থান ছিলো ইউরোপের উত্তরে আর্কটিক সাগর অঞ্চলে। আদি বাসস্থান যেখানেই হোক, কালক্রমে ইন্দো-ইউরোপীয় এই জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো। পরবর্তী কালের ইউরোপে গ্রীক, রোমান, কেল্ট, জার্মান, স্লাভ প্রভৃতি জাতি এবং এশিয়ার

হিট্‌টাইট্‌, মিতানীয়ান, ক্যাস্‌সাইট্‌, মীড, পারসী, তোখারীয়ান এবং ভারতের বৈদিক আর্য—এরা সবাই মূল ওই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর ছড়িয়ে পড়ার পথে আলাদা আলাদা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। এরা সবাই যে মূল একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো তার অব্যর্থ প্রমাণ এই সমস্ত জাতির ভাষাগত মিল থেকেই সবচেয়ে বেশি সুস্পষ্ট। ভাষাগত মিল থেকে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত হলো এই যে মূল ওই জাতিটির একটি মূল ভাষা ছিলো। অবশ্য সে ভাষাটি ঠিক কী ছিলো এবং তার নামই বা কী ছিলো, তা আজ আর জানবার উপায় নেই। পণ্ডিতরা এর নাম দিয়েছেন ইন্দো-ইউরোপীয়। নৃতাত্ত্বিক অর্থে, অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর গায়ের রঙ, চুল, চোখ, নাক, কপাল এবং মাথায় খুলি প্রভৃতির যে স্বাতন্ত্র্য বোঝায়, ইন্দো-ইউরোপীয় বলতে ঠিক সেই রকম কোনো বিশিষ্ট জাতি বোঝায় না। ঠিক তেমনি মূল এই জাতির বিভিন্ন শাখা-উপশাখারও যে নামকরণ পণ্ডিতরা করেছেন, তা তাঁরা জাতিগত দিক দিয়ে করেন নি। আলাদা আলাদা এক-একটা ভাষা অনুযায়ী সেই ভাষাভাষী মানুষের দলকে তাঁরা আলাদা আলাদা নাম দিয়েছেন। গ্রীক, রোমান, বা আর্য—এগুলো নৃতাত্ত্বিক অর্থে জাতিগত নাম নয়; গ্রীক, রোমান বা আর্য ভাষা বলতো বলেই এদের ওইরকম নামকরণ করা হয়েছে। এই সম্পর্কে এই অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্টে আমরা খানিকটা আলোচনা করেছি।

এশিয়া মাইনরের সভ্যতা

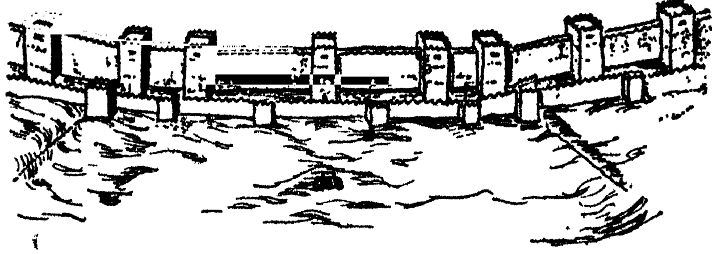
আগেই বলেছি যে খ্রীষ্টপূর্ব দুহাজার বছর থেকে এক হাজার বছরের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অসংখ্য অভিযানে পশ্চিম এশিয়ার বুকে এক বিরাট ঝড় বয়ে চলেছিলো। বারবার তাদের

এই দুর্ধর্ষ অভিযানে সেমিটিক জাতিগোষ্ঠীর গড়ে তোলা সুপ্রাচীন ওই সভ্যতাগুলো শেষ পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে নি। তাই এক হাজার বছরের এই চঞ্চল ঘটনামুখর যুগের মাঝামাঝি এবং শেষাশেষি ইউরোপ এবং এশিয়ার সর্বত্র ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অভ্যুত্থান চোখে পড়ে। ব্রোঞ্জ-যুগের প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে বিধ্বস্ত করলেও এরা সেই সভ্যতার প্রধান প্রধান অবদানগুলো গ্রহণ করে তার উপরেই উন্নততর এক সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলো। প্রত্নতত্ত্বের যে ব্যাপক এবং বিস্তৃত গবেষণা হলে হাজার বছরের এই যুগে বিভিন্ন জাতির চলাফেরা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির খুঁটিনাটি সুনিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়, এখনো পর্যন্ত তেমন গবেষণা হয় নি। কাজেই এ ইতিহাসের মোটামুটি কতকগুলি খবর জেনেই আপাতত আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

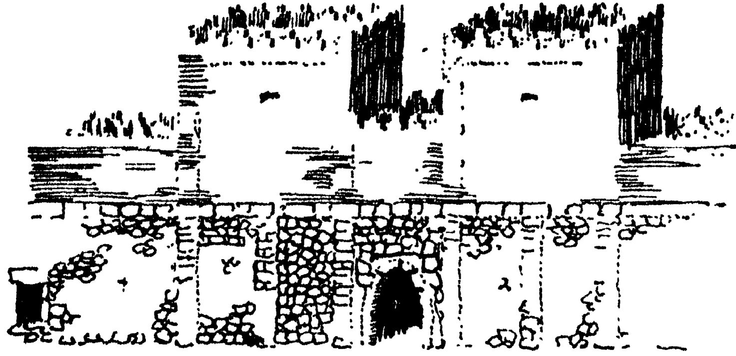
বোগাজ-কুই

প্রাচীন ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতার ইতিহাসে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীর অবদান প্রসঙ্গে যাদের নাম সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে, তারা হলো হিট্টাইট্। এশিয়া মাইনরের বুকে প্রায় ছশো বছর ধরে প্রবল প্রতাপে যে জাতিটি তার প্রাধান্য বজায় রেখে গেছে, কিছুকাল আগে পর্যন্তও সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা ছিলো না বলা চলে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের আমলে লিখিত নথিপত্রে এবং আরো পরের আসীরিয়দেয় বিবরণীতে হিট্টাইট্দের উল্লেখ থাকলেও, প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে এদের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণাই কারো ছিলো না। অথচ, অন্যান্য নানা ইঙ্গিত থেকে ক্রমশই বোঝা যাচ্ছিলো যে এশিয়া মাইনরের বুকে এই ধরনের কোনো

একটি জাতি খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছরের কিছু পরে দীর্ঘদিনব্যাপী একটা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলো। ১৯০৬ সালে জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক উইংক্লার বর্তমান তুরস্কের রাজধানী আংকারার দেড়শো মাইল পূর্বে বোগাজ্-কুই বলে জায়গাটি খুঁড়তে শুরু করেন। এর আগে অবশ্য ১৮৯৩ সালে শাঁত্র্ নামে ফরাসী এক পণ্ডিত এখান থেকে অজ্ঞাত একটি প্রাচীন ভাষায় লেখা কতকগুলি পোড়ামাটির চাকতি সংগ্রহ করেছিলেন। যাই হোক, খোঁড়াখুঁড়ির কাজ কিছুদিন চলবার পরেই বোগজ্-কুই-তে সুপ্রাচীন একটি শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। আর, প্রাচীন এই রাজধানী শহরের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে সযত্নে রক্ষিত প্রায় ১৩০০০ হাজার আগুনে পোড়ানো মাটির ছোটো ছোটো চাকতি আবিষ্কৃত হয়। চাকতিগুলোর বেশির ভাগের উপরেই ওই অজ্ঞাত ভাষায় লেখার ছাপ—অবশ্য সুমেরীয়দের কিউনিফর্ম লিপিতেই এই ভাষা লেখা হয়েছিলো। আর কতকগুলো চাকতি ছিলো প্রাচীন যুগের সুপরিচিত আক্কাদ বা ব্যাবিলোনীয় ভাষায় লিখিত। শেষের এই চাকতিগুলোর লেখা পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে তাতে "হাট্টি-দের দেশ" বলে একটি দেশের উল্লেখ রয়েছে, এবং এই দেশের রাজধানীর নাম ছিলো হাট্টু বা হাট্টুশাস্। আর, হাট্টু বা হাট্টি—এই নাম থেকেই এখানকার সেই প্রাচীন অধিবাসীদের ইংরেজিতে "হিট্টাইট্" বলে নামকরণ করা হয়েছে। বোগাজ্-কুইয়ের এই ধ্বংসাবশেষই যে সেই রাজধানীটির ধ্বংসস্তূপ এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই আর থাকলো না। কারণ, তুরস্কের আরেকজন প্রত্নতাত্ত্বিক মাক্রিদি বে-র সহযোগিতায় উইংক্লার ১৯১২ সাল পর্যন্ত এখানে যে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চালান, তা থেকে দুর্গপ্রাকার, মন্দির, প্রাসাদ, সিংদরজা প্রভৃতি-যুক্ত বিরাট একটি রাজধানী-শহরেরই সুস্পষ্ট চিহ্ন বেরিয়ে এলো। তাছাড়া, হাজার



বোগাজ্-কুই-এর দুর্গপ্রাকারের কল্পিত চেহারা।
দেয়ালের নিচে মাঝখানে সুরঙ্গপথের মুখ দেখা যাচ্ছে



ভগ্নাবশেষ থেকে কল্পিত একটি সিং-দরজার ভিতরের দিক

হাজার মাটির ওই চাকতিগুলো প্রাসাদেরই একটা ঘরে এমন সযত্নে সাজানো-গোছানো অবস্থায় রাখা হয়েছিলো যে মনে হয়, এটি যেন প্রাচীন সেই রাষ্ট্রের নথিপত্র রাখবারই ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। যাই হোক, এই সমস্ত থেকে মোটামুটি যে ব্যাপারটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সকলকে বিস্মিত করে দিলো সেটা হলো বিরাট একটি প্রাচীন সাম্রাজ্যের নিঃসন্দিগ্ধ অস্তিত্ব। বহুকালবিস্মৃত ইতিহাসের অন্ধকার পটভূমিকায় হঠাৎ একটি আলো যেন সুতীব্র দীপ্তিতে সকলকে ধাঁধিয়ে দিলো। বোগাজকুই-এ প্রত্নতত্ত্বের এই গবেষণার কাজ, এবং প্রাচীন হিট্টাইটদের অস্তিত্বের আবিষ্কার আধুনিক কালের গবেষণাক্ষেত্রে একটা চমক-লাগানো ঘটনা।

প্রত্নতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্ব

স্বভাবতই এর পরে হিট্টাইটদের সম্বন্ধে আরো খবর জানবার জন্য পণ্ডিতমহলে একটা দারুণ সাড়া পড়ে গেলো। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও আমেরিকা থেকে এবং তুরস্ক দেশের ভিতর থেকে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস-বিশারদরা এসে এশিয়া মাইনরের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ঘাটনের কাজে লেগে গেলেন। কারচেমিশ্, কুলটেপ্, আলিশর্, আলাজা হুয়ুক্, মারসিন্, কারটেপ্—প্রভৃতি অনেকগুলি জায়গায় যেখানেই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ হয়েছে, সেখানেই প্রাচীন এই হিট্টাইটদের অস্তিত্বের নানারকম নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক এই সমস্ত গবেষণার কাজে হোগার্থ, উলী, রোজনি, অস্টেন ও স্মিড্ট, গারস্ট্যাং এবং তুরস্কের কোশে, আরিক, কান্সু ও ওজ্গুচ্ দম্পতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এঁরা যে শুধু হিট্টাইটদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ উদ্ঘাটন করেছেন, তাই নয়, পশ্চিম এশিয়ার পশ্চিমতম প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটিতে সুদূর অতীত থেকে মানুষের অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাসটিও এঁরা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

এশিয়া মাইনরের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ঘাটনের কাজে একদিকে যেমন ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ চলেছে, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন হিট্টাইট্দের মাটির চাকতিগুলোর উপরে কিউনিফর্ম লিপিতে লিখিত অজ্ঞাত এই ভাষাটির পাঠোদ্ধারেরও চেষ্টা চলেছিলো। বোগাজ্কুই খোঁড়বার কিছু আগে ঠিক এইরকম লেখাযুক্ত দুটি চাকতি অন্য একটি জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছিলো। এইগুলো পরীক্ষা করে ১৯০২ সালে নরওয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ন্যুড্ট্সন্ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে অজ্ঞাত ওই

ভাষাটির সাদৃশ্যের কথা ঘোষণা করেন। এর পর বোগাজকুইতে পাওয়া চাকতিগুলো পরীক্ষা করে চেক পণ্ডিত রোজনি এই ভাষাটির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন, এবং তিনি খুব দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করেন যে এটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। শুরুতে এই চমকপ্রদ ঘোষণায় দেশবিদেশের পণ্ডিতমহলে একটা দারুণ প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিলো ; কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ এই প্রতিবাদের ঝড় শান্ত হয়ে এলো, কারণ রোজনি ছাড়াও বোসার্ট, ফরের, গেল্‌ব্‌, মেরিগ্‌গী প্রভৃতি বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা নানাদিক দিয়ে পরীক্ষা করে এখন সবাই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। এশিয়া মাইনরের প্রাচীন এই জাতিটির ভাষা যে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীরই ভাষা ছিলো, এবং স্বভাবতই এই জাতিটিও যে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি ছিলো, এখন সে সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই নেই। হিট্‌টাইট্‌দের এই প্রাচীন ইতিহাস-চর্চা প্রসঙ্গে ১৯১০ সালে প্রকাশিত গারস্ট্যাং-এর "ল্যাণ্ড অফ্ দি হিট্‌টাইট্‌স্" গ্রন্থটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুলটেপ্

বোগাজকুই-তে হিট্‌টাইটদের লিখিত যে মাটির চাকতিগুলো পাওয়া গেছে তা থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছর থেকে এক হাজার বছরের মাঝামাঝি সময়ের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস মোটামুটি জানা যায় ; কিন্তু যে জায়গাটি আবিষ্কারের ফলে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দু হাজার বছরের কাছাকাছি হিট্‌টাইট্‌দের উল্লেখ এবং পরিচয় জানা গেলো সেটা হলো আংকারার দক্ষিণ-পূর্বে বর্তমান কায়সেরীর কাছে কুলটেপ-এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার। ১৯২৫ সালে চেক্ পণ্ডিত রোজনি এটি আবিষ্কার করেন। এখান থেকে তিনি প্রায় এক হাজার লেখাযুক্ত মাটির চাকতি উদ্ধার করেন। এই চাকতি-

গুলো কিন্তু হিট্টাইট্‌দের লেখা চাকতি ছিলো না—এগুলো ছিলো প্রাচীন আসীরিয়ার বণিক-ব্যবসায়ীদের লিখিত নথিপত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য আসীরিয়ার এই বণিক-ব্যবসায়ীদল এশিয়া মাইনরের এই জায়গাটিতে তাদের একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছিলো। এর প্রাচীন নাম ছিলো কানেশ। আলিশর-এও তাদের আরেকটি ঘাঁটি ছিলো। মূল শহরের বাইরে আলাদা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আসীরিয়ার এই বণিক-ব্যবসায়ীরা বসবাস করতো, এবং এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার বিভিন্ন শহরের সঙ্গে আসীরিয়া-থেকে-আনীত জিনিসপত্রের ব্যবসাবাণিজ্য চালাতো। বণিকসংঘ মারফত সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো; আসীরিয় ভাষায় এই বণিক সংঘের নাম ছিলো "কারুম্‌"—নথিপত্র থেকে মনে হয় যে এই 'কারুম"-গুলো আধুনিককালের বণিক সংঘের মতোই ছিলো। কানেশের এই বিদেশী বণিকরা তাদের নিজেদের দেশ আসীরিয়ার রাজধানী অস্‌সুর-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো, এবং আসীরিয়দের অস্‌সুর, ইস্‌তার, আদাদ্‌, শামাশ্‌ প্রভৃতি দেবদেবীর নাম নিয়েই তারা তাদের ব্যবসায়ের দলিলপত্র তৈরি করতো। কানেশের এই ঘাঁটিটি থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ বছর নাগাদ আসীরিয়ার বণিকরা যে পুরোদমে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই; আর তাদের ব্যবসাবাণিজ্যের ওই সমস্ত দলিলপত্রের মধ্যেই হিট্টাইটদের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য এ সময়ে এশিয়া মাইনরে হিট্টাইটদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমন প্রবল হয়ে না উঠলেও, আসীরিয়দের দলিলপত্র থেকেই তাদের দুজন রাজা—পিঠানস্‌ এবং তাঁর পুত্র অনিট্টাস্‌-এর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আগেই দেখেছি যে আক্কাদ-রাজ-বংশের আমলে সারগন এবং নারমসিন্‌ (খ্রীঃ পূঃ ২৪০০) এশিয়া মাইনর সুদ্ধ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য

বিস্তৃত করেছিলেন। এঁদের বিবরণীতে হিট্টাইট্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও মনে হয় যে ওই সময় নাগাদই এশিয়া মাইনরে প্রথম হিট্টাইটদের আগমন শুরু হয়েছিলো।

হিট্টাইট্দের আগে

হিট্টাইট্রা এশিয়া মাইনরের আদি বাসিন্দা ছিলো না, এবং খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের মধ্যে এশিয়া মাইনরের দিকে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর যে চলাচল শুরু হয়েছিলো, তাদেরই একটি শাখা পরে হিট্টাইট নামে পরিচিত হয়েছিলো। কারণ, হিট্টাইটদের বিভিন্ন লিপি থেকে জানা যায় যে তারা যে অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিলো সেই অঞ্চলে, অর্থাৎ প্রাচীন হ্যালিস্ নদীর উপত্যকা জুড়ে আদিম অধিবাসীদের বসবাস ছিলো। হাট্টি বা হাট্টুসাস্ এদেরই প্রধান নগরের নাম ছিলো। নিজেদের ধর্মকর্মে পরবর্তীকালের ওই ইন্দো-ইউরোপীয় হিট্টাইট্রা প্রাচীন এই অধিবাসীদের অনেকগুলি প্রার্থনা, স্তোত্র, ইত্যাদি গ্রহণ করে-ছিলো। আদিম অধিবাসীদের ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় বা সেমিটিক্ ভাষাগোষ্ঠীর কোনো মিল ছিলো না। এসব থেকে মনে হয় যে সুমের-এর প্রাচীন অধিবাসীদের মতো এশিয়া মাইনরের এই অধিবাসীরাও এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বাসিন্দা ছিলো ; এবং "হাট্টিলি" বা "হাট্টাইট্" বলে পরিচিত সেই "হাট্টি নগরের ভাষা" ছিলো এদেরই ভাষা। পরবর্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় যে জাতিটি এসে এখানে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলো বিস্মৃত অতীতের অস্পষ্টতায় তারাই কালক্রমে হিট্টাইট্ বলে পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। এশিয়া মাইনরের এই আদিমতম অধিবাসীদের পরিচয় বোধ হয় সেই বিস্মৃতির অতলেই বিলুপ্ত হয়ে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সেটা হলো হিট্টাইট্দের লিপিগুলোতেই লুয়াইট্, মিতান্নু, হুরিয়ান্ প্রভৃতি আরো কয়েকটি জাতির নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে লুয়াইট এবং মিতান্নুরা যে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। লুয়াইটরা হিট্টাইট্দেরও আগে এসেছিলো, এবং এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিলো। হুরিয়ান বলে পরিচিত জাতিটি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। হিট্টাইট্-লিপির পাঠোদ্ধারক রোজনির মতে এরা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো না, উত্তর মেসোপটেমিয়া এবং উত্তর সিরিয়ার অংশ জুড়ে প্রাচীনতম যে অধিবাসীরা ছিলো তারাই হুরিয়ান বলে পরিচিত ছিলো; এদের আরেকটি দল, বা খুব সম্ভব এদেরই প্রাচীনতম নাম ছিলো সুবারিয়ান।

মিতান্নু

মিতান্নুরা যে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো, সেটা সুনিশ্চিত; কারণ এর কিছু পরে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীর আর্য-ভাষাভাষী যে শাখাটি ভারতবর্ষে এসেছিলো তাদের সঙ্গে মিতান্নুদের ভাষার আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ শতকের মাঝামাঝি হিট্টাইট্ সম্রাটের সঙ্গে মিতান্নুদের একটি সন্ধি-চুক্তির লিপি বোগাজ-কুই-তে পাওয়া গেছে। এই চুক্তি-পত্রে মিতান্নুদের যে দেবতাদের নাম পাওয়া যায় তার সঙ্গে বৈদিক আর্যদের ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এবং



মিতানীদের একটি শীলমোহর

নসাত্য-র নামের সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। তাছাড়া হিটুটাইটদের ওই সংরক্ষিত দলিলপত্র থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ শতকে মিতান্নুরাজ্যের কিকৃকুলিশ-নামে এক ব্যক্তির রচিত অশ্বচালনার শিক্ষা বিষয়ে একটি বইও পাওয়া গেছে। এই বইতে ভালোভাবে ঘোড়া এবং রথচালানো শেখাবার জন্য বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া আছে; আর সেই প্রসঙ্গে যে সমস্ত শব্দ এবং সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে বৈদিক আর্যদের সংস্কৃত ভাষার প্রচণ্ড মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন "ঐকবর্তন্ন" শব্দটি আসলে সংস্কৃত "এক বর্তনম্" অর্থাৎ এক চক্কর শব্দটি থেকেই উদ্ভূত। সেই রকম "তেরা-বর্তন্ন" (সংস্কৃত—ত্রি বর্তনম্), "পঞ্চ-বর্তন্ন" (সংস্কৃত—পঞ্চ বর্তনম্), "সত্ত-বর্তন্ন" (সংস্কৃত—সপ্ত বর্তনম্), এবং "ন-বর্তন্ন" (সংস্কৃত—নব বর্তনম্) প্রভৃতি সংখ্যা ও শব্দও এই বইতে পাওয়া যায়। এ থেকে খুবই মনে হয় যে বৈদিক আর্যদের যে শাখাটি ভারতবর্ষে এসেছিলো, পুবদিকে অগ্রসর হবার পথে তাদের কোনো একটি অগ্রগামী দল মেসোপটেমিয়ার উত্তর অঞ্চলে হুরাইট আদিম অধিবাসীদের উপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। এদের প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রটিই মিতান্নু নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলো।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে এশিয়া মাইনরে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর এই সমস্ত শাখার সুস্পষ্ট অস্তিত্ব দেখা গেলেও, এরা যে কখন কোনসময় কোনদিক দিয়ে প্রথম এই অঞ্চলে এসেছিলো, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে এখনো কিছু বলা যায় না। প্রত্নতত্ত্বের আরো ব্যাপক গবেষণা হলে হয়তো এই ব্যাপারটিও পরিষ্কারভাবে আমরা জানতে পারবো।

হিট্টাইট্ প্রাধান্য

এশিয়া মাইনরে-আগত এই সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে হিট্টাইটরাই কালক্রমে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে গোটা এশিয়া মাইনরের উপর এরা নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলো। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার ফলে হিট্টাইট প্রতিপত্তির এই ছশো বছরের পুরো ইতিহাস আজ আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছে। এদের এই প্রাধান্যের দুটি যুগ লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিতরা যাকে "পুরনো রাজত্বের যুগ" বলে অভিহিত করেছেন সেই প্রথম যুগটি প্রায় তিনশো বছর ধঁরে টিকে ছিলো; দ্বিতীয় যুগ অর্থাৎ "সাম্রাজ্যের যুগের" সময়কাল হলো তার পরের তিনশো বছর।

কানেশে আসীরিয়ার বণিকদের দলিলপত্রে পিঠানস্ এবং অনিট্টাস্ নামে যে দুজন হিট্টাইট রাজার নাম পাওয়া যায়, তাঁদের অস্তিত্ব এবং সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৪০ থেকে ১৭৩০-এর মধ্যে তুধালিয়শ্ নামে রাজার আমল থেকে হিট্টাইটদের পুরনো রাজত্বের যুগ যে পুরোপুরি শুরু হয়েছিলো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এর আগে এই অঞ্চলে কুশ্শর, নেশাশ, হাট্টুস্াস্, জল্পা প্রভৃতি প্রায় দশটি ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিলো। এই নগররাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে চলতে ক্রমশ কুশ্শর-এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তুধালিয়শ, এবং তাঁর আগে পিঠানস্ ও অনিটটাস শুরুতে শুধু কুশ্শর-এর রাজা ছিলেন।

লবরনাশ্

তুধালিয়শ-এর কিছুপরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৬৭০ সালে প্রথম লবরনাশ্ গোটা হিট্টাইট্ অঞ্চলকে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

লবরনাশ্-এর নামটি পরবর্তীকালের সমস্ত হিট্টাইট্ রাজারা তাঁদের রাজা উপাধি হিসাবে ব্যবহার করতেন। প্রথম লবরনাশের পুত্র দ্বিতীয় লবরনাশই প্রথম কুশ্শর থেকে হাট্টুসাস্-এ রাজধানী স্থানান্তরিত কবেন এবং খুব সম্ভব এই কারণে তিনি প্রথম হাট্টু-শিলিশ্ নামে অভিহিত হয়েছেন। দ্বিতীয় লবরনাশ দক্ষিণ-পূর্বে সিরিয়ার হালাফ্ এবং আলেপ্পো নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে-ছিলেন। কিন্তু হিট্টাইট্-ইতিহাসে দ্বিতীয় লবরনাশ যে কারণে বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন সেটা হলো সিংহাসনেব উত্তরাধিকার বিষয়ে তাঁর মৃত্যুকালীন নির্দেশ। পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র কেউই যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার পাবার যোগ্য নয় হিট্টাইট্দের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত "পানকুশ্"-এর সামনে তার বিস্তৃত আলোচনা কবে তিনি তাঁর নাতি প্রথম মুব্শিলিশ্-কেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত কবেন। প্রথম মুরশিলিশ্ ব্যাবিলোনিয়া পর্যন্ত বিজয় অভিযান করে ব্যাবিলন শহর বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার শ্যালকের হাতে নিহত হন।

মিতান্নির অভ্যুত্থান

প্রথম মুবশিলিশ্-এর পরে হিট্টাইট্ রাজ্যে একটি প্রচণ্ড অরাজকতার সৃষ্টি হয়। রাজ্যেব ভিতরে একদিকে যেমন সিংহাসন নিয়ে গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি চলতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি এই সময়ে বাইরে থেকে হুরাইট্ ও ক্যাসসাইট্দের বারবার অভিযানে হিট্টাইট্রা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। অরাজক এই অবস্থার মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫২০ সাল নাগাদ টেলিপিনুশ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে আর কখনো কোনো অরাজকতার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য টেলিপিনুশ খুঁটিনাটিভাবে কতকগুলি নিয়মকানুন প্রবর্তিত করেন।

টেলিপিনুশ-রচিত এই বিখ্যাত লিপি থেকে আম
যুগের হিট্টাইট্ রাজাদের সম্পর্কে অনেক খুঁ
জানতে পারি। কিন্তু টেলিপিনুশ-এর এই প্রচেষ্টা স
দের প্রাধান্য আর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। কার
মিতান্নি রাজ্যের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে উঠেছিলো।
সৌশ্শতর্-এর নেতৃত্বে এই সময় মিতান্নি একটি দারুণ
সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিলো। হিট্টাইট্-দের প্রভা
খর্ব করে ইনি প্রায় গোটা এশিয়া মাইনর জুড়ে নিজে
বিস্তৃত করেন। এই সময় মিতান্নি-সাম্রাজ্যের প্রভাব যে ও
বৃদ্ধি পেয়েছিলো, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ,
অষ্টাদশ বংশের সম্রাট চতুর্থ থুট্মোস্ (খ্রীঃ পূঃ ১৪১০)
সম্রাট সৌশ্শতর্-এর পরবর্তী সম্রাট প্রথম অর্ততম-র
পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সাম্রাজ্যের যুগ

যাই হোক প্রায় একশো বছর ধরে মিতান্নি সাম্রাজ্যের আধিপত্য বজায় থাকবার পর খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬০ সালে তৃতীয় তুধালিয়শ্-এর আমলে হিট্টাইট্ সাম্রাজ্য আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলো। এই সময় থেকেই হিট্টাইট্দের "সাম্রাজ্যের যুগের" শুরু। অবশ্য তখনো পর্যন্ত নানাদিক দিয়ে হিট্টাইট্দের বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং অভিযান চলছিলো; এই সমস্ত আক্রমণ এবং অভিযান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে যিনি হিট্টাইট্ সাম্রাজ্যকে আবার সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি হলেন শুপ্পিলুলিউমাশ্। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৭৫ থেকে ১৩৩৫ পর্যন্ত ইনি রাজত্ব করেছিলেন।

াম্রাজ্যের ইতিহাসে শুপ্‌পিলুলিউমাশ-ই ছিলেন
শালী এবং বিখ্যাত সম্রাট। সিরিয়ার উপর নিজের
.র করে এবং চিরতরে দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী মিতান্নুদের
চরে ইনি হিট্টাইট্ সাম্রাজ্যকে আবার নতুন করে
রন। শুপ্‌পিলুলিউমাশ্-এর আক্রমণে মিতান্নুদের
সুক্কন্নী বিধ্বস্ত হয়, এবং মিতান্নু-রাজ তুশ্‌রট্ট পরাজিত
সময় গৃহযুদ্ধের ফলে মিতান্নু দুটি রাজ্যে বিভক্ত
হ়ছিলো। শুপ্‌পিলুলিউমাশ তার একটিকে স্বপক্ষে এনে
মতান্নু-রাজ্যের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন।
ট্দের আক্রমণও তিনি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন।
ন-কুই-এর দক্ষিণ অংশে আত্মরক্ষার সুদৃঢ় যে প্রাচীরের
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, শুপ্‌পিলুলিউমাশ্-ই সেটা তৈরী
করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মিশর এবং পশ্চিম এশিয়ার সমগ্র
ইতিহাসে এই সময় শুপ্‌পিলুলিউমাশ-ই ছিলেন সবচেয়ে পরাক্রান্ত
সম্রাট। তাঁর খ্যাতি চারদিকে এমনই ছড়িয়ে পড়েছিলো যে
এই সময় মিশরের ফ্যারাও-র মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা পত্নী
শুপ্‌পিলুলিউমাশ্-কে একটি চিঠি লিখে তাঁর কোনো একটি
পুত্রকে মিশরে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। মিশরের বিধবা
সম্রাজ্ঞী সেই পুত্রকে স্বামীরূপে গ্রহণ করবেন বলেই তিনি এই
অনুরোধ করেন। অবশ্য শুপ্‌পিলুলিউমাশ-এর এই পুত্রের
পরিণাম খুবই শোচনীয় হয়েছিলো; কারণ মিশরে পৌঁছানোর
পর ইনি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।

আসীরিয়া-হিট্টাইট্-মিশর

শুপ্‌পিলুলিউমাশ্-এর মৃত্যুর পর হিট্টাইট্ সাম্রাজ্যের পতন শুরু
হয়। এই সময় গোটা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে আসীরিয়া, হিট্টাইট

এবং মিশর—এই তিনটি প্রধান সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার সংগ্রাম শুরু হয়। সম্রাট মুট্‌টাল্লিস্‌-এর (খ্রীঃ পূঃ ১৩২০ সালে) আমলে সিরিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে মিশরের উনবিংশ রাজ-বংশের ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেশিস্‌-এর সঙ্গে একটি প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নি বটে, তবে সিরিয়ার উপর হিট্‌টাইট্‌দের প্রাধান্য মোটামুটি অক্ষুণ্ণই ছিলো। এর পর তৃতীয় হাট্টুশিলিস্‌ (খ্রীঃ পূঃ ১২৭৫—১২৫০) মিশরের দ্বিতীয় রামেশিস্‌-এর সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি করে হিট্‌টাইট্‌ সাম্রাজ্যের একটা দিক আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত করেন। সন্ধিচুক্তি হবার কিছুদিন পর হাট্টুশিলিসের মেয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় রামেশিস্‌-এর বিবাহ হয়। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আসীরিয়দের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ক্রমশই বেড়ে উঠছিলো। হিট্‌টাইটদের সঙ্গে এই সময় একটি যুদ্ধে আসীরিয়-সম্রাট প্রথম টুকুল্‌টি-নিনর্তু হিট্‌টাইট্‌দের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। তাছাড়া, এই সময় ভূমধ্যসাগরের ইজিয়ান অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দুর্ধর্ষ জাতি একটার পর একটা অভিযান চালিয়ে হিট্‌টাইট্‌ সাম্রাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো। একদিকে আসীরিয়ার শক্তিবৃদ্ধি, অন্যদিকে এই সমস্ত জাতিদের অভিযান, এই দুই বিপদের সামনে হিট্‌টাইট্‌ সাম্রাজ্য আস্তে আস্তে ভেঙে পড়লো। পশ্চিম্‌ এশিয়ার একটি প্রবল পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের পতন হলো।

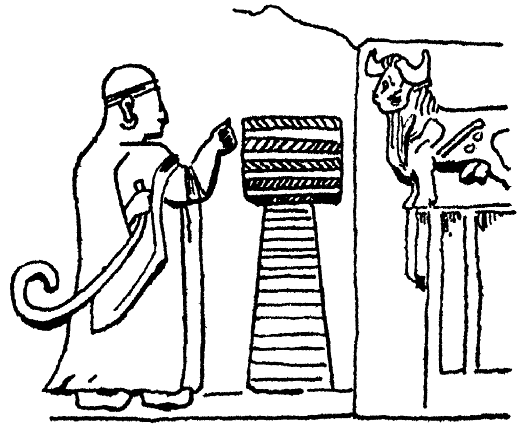
হিট্‌টাইট্‌-রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংগঠনে রাজা বা সম্রাট ছিলেন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বা প্রদেশে সম্রাট তাঁর পুত্র বা আত্মীয়-স্বজনকে শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করতেন। সমস্ত সামন্তপ্রভুদের নিয়ে গঠিত হতো “পান্‌কুশ”—বা সম্রাটের পরামর্শদাতা সমিতি। হিট্‌টাইট্‌ ধর্মকর্মের ব্যাপারেও সম্রাটই ছিলেন প্রধান পুরোহিত। শাসন-কাজের সুপরিচালনার জন্য



বোগাজ্-কুই থেকে প্রায় দুমাইল দূরে ইয়াজিলিকায়া-র পাহাড়ের গায়ে হিট্টাইট্রা তাদের দেবদেবীর অনেক ছবি খোদিত করে রেখেছিলো। উপরের দুটি ছবিতে হিট্টাইট্দের দেবদেবীদের দেখা যাচ্ছে।



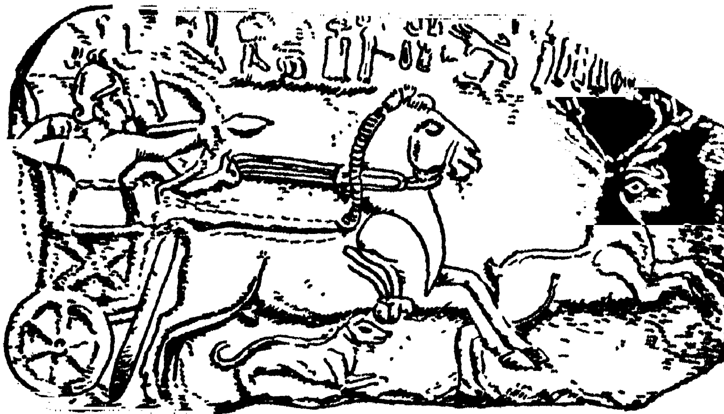
হিট্টাইট্দের একজন প্রধান দেবতা ছিলো জলবৃষ্টিবাতাসের দেবতা। বাহন হরিণের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের সেই দেবতা।



জলবৃষ্টিবাতাসের দেবতার প্রতিভূস্বরূপ ষাঁড়কে উপাসনা করছেন হিট্টাইট্ রাজা। এটি আলাজা হুয়ুক জায়গাটি থেকে পাওয়া গেছে।




হিট্‌টাইট্‌দের দুটি শীলমোহর। প্রথমটি মুট্‌টাল্লিস্‌-এর ; দ্বিতীয়টি শুপ্‌পিলুলিউমাশ্‌-এর।



হিট্‌টাইট্‌ আমলের হরিণ শিকারের একটি দৃশ্য।



হিট্‌টাইট্‌দের পৌরাণিক কাহিনীর একটি দৃশ্য



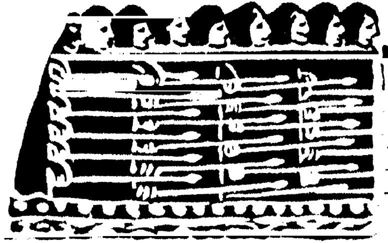
হিট্টাইট্দের আরেকটি শীলমোহর

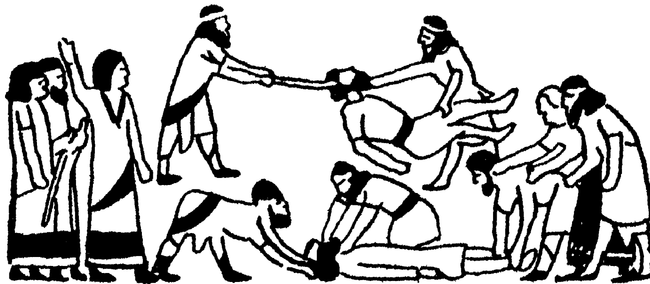
খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নিয়ে একটি আইন-সংহিতাও রচিত হয়েছিলো। পরবর্তীকালে ইউরোপ এবং এশিয়ায় ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে হিট্টাইট্ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

আসীরিয়ার অভ্যুত্থান

পশ্চিম এশিয়ার হিট্টাইট্ শক্তির পতনের পর আসীরিয়ার প্রবল প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিস্তীর্ণ হিট্টাইট্ সাম্রাজ্যের আদর্শ সামনে রেখে, আসীরিয়ার সম্রাটরা ক্রমশ ক্রমশ একটি বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। হিট্টাইট্দের পরে পশ্চিম এশিয়ার পাঁচ-ছশো বছরের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাই হলো আসীরিয়া সাম্রাজ্যের ইতিহাস। নেবুক্যাদ্নেজার, টিগল্যাথ-পিলেজার, শাম্সী-আদাদ্, অসুরনসিরপাল, অসুরবনিপাল প্রভৃতি বিখ্যাত







উপরে আসীরিয়ার একজন রাজা। মাঝখানে আসীরিয়ার সৈ[illegible] যুদ্ধ করবার পদ্ধতি। নীচে পরাজিত যুদ্ধবন্দীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার।

সম্রাটদের নেতৃত্বে সেমিটিক এই সাম্রাজ্যটি বহুদিন পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে টিকে ছিলো।

রাজধানী নিনেভ্ শহরকে কেন্দ্র করে আসীরিয়ার এই নতুন অভ্যুত্থানের একটি বিশেষত্ব ছিলো। আমরা আগেই দেখেছি যে এই সময়ে বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর ক্রমাগত অভিযানে পশ্চিম এশিয়ার সুপ্রাচীন সেমিটিক সভ্যতাগুলিকে একটা নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিদের অভিযানে প্রায় বিপর্যস্ত হতে বসেছিলো। তখন খুব সম্ভব প্রতিরোধের ঘাঁটি হিসাবেই মেসোপটেমিয়ার উত্তর অঞ্চলে আসীরিয়দের শহরগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো। ইন্দো-ইউরোপীয়দের অভিযানের প্রথম ধাক্কা বরাবর এই শহরগুলোকেই সহ্য করতে হয়েছে; তাই আসীরিয়ার এই নতুন সাম্রাজ্য শুরু থেকেই পুরোপুরি একটি সামরিক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছিলো। যুদ্ধপ্রিয়তা এবং দুর্ধর্ষতা ছিলো এই সাম্রাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধ-বিগ্রহে এদের নিষ্ঠুরতার কথাও সে যুগে সকলের বিশেষভাবে জানা ছিলো। পশ্চিম এশিয়ার বুকে হিট্টাইট্দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং সেমিটিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিলো, তার প্রায় দেড় হাজার বছর পরে ইন্দো-ইউরোপীয় মীড্দের কাছে আসীরিয়ার পরাজয়ে এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। এর পর পশ্চিম এশিয়ায় ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রাধান্য চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

ফিনিশীয় বণিক

পশ্চিম এশিয়ায় হিট্টাইট্ প্রাধান্যের আমল থেকে সিরিয়ার পশ্চিম উপকূল জুড়ে আরেকটি সেমিটিক জাতির বিশেষ কর্মচাঞ্চল্য চোখে পড়ে। ভূমধ্যসাগরের পূর্বকূল ঘেঁষে লম্বা এক টুকরো এই

দেশটির নাম ছিলো ফিনিশীয়া। এই থেকে এখানকার সেই প্রাচীন অধিবাসীরা ফিনিশীয় বলে পরিচিত হয়ে আছে। এদের উৎপত্তি এবং সভ্যতাবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা না থাকলেও খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর নাগাদ পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চোখে পড়ে। অবশ্য মিশর, হিট্‌টাইট, বা আসীরিয়দের মতো বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য ফিনিশীয়রা গড়ে তোলে নি ; কিন্তু অন্য নানাদিক দিয়ে মানুষের বর্তমান সভ্যতা ফিনিশীয়দের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এদের বসবাসের অঞ্চলটিই ছিলো এমন যেখানে মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, হিট্‌টাইট্‌-দেশ বা আসীরিয়ার মতো ব্যাপকভাবে চাষবাস করা সম্ভব ছিলো না। চাষবাসের চেয়ে এ অঞ্চলে নানা রকম ফলের গাছ এবং জলপাইয়ের চাষ অনেক বেশি সহজ এবং লাভের ছিলো। তা ছাড়া গোটা দেশটির একটা পুরো দিক জুড়ে ছিলো সমুদ্রের উপকূল। তাই শুরু থেকেই ফিনিশীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষত সামুদ্রিক বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষ হয়ে উঠেছিলো। ভূমধ্যসাগরের ধার ঘেঁষে টায়ার, সিডন, বিব্‌লস্‌, প্রভৃতি ফিনিশীয়দের শহরগুলি সে যুগের পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং দক্ষিণ ইউরোপে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। এই সমস্ত বন্দর থেকে ফিনিশীয়রা নানারকম দামী জিনিসপত্র নিয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতো। মিশরের "নতুন রাজত্বের" আমলের সমাধির গায়ে আঁকা ছবিগুলোতে দেখা যায় যে, নীল নদীর দুধারে মিশরী চাষীদের কাছে ফিনিশীয় বণিক ব্যবসায়ীরা নানারকম জিনিসপত্রের লেনদেন করছে। অন্যদিকে ব্যাবিলোনিয়া, আসীরিয়া এবং হিট্‌টাইট্‌ অঞ্চলেও যে এরা ব্যাপকভাবে ব্যবসাবাণিজ্য চালাতো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্যই এরা নিজেদের দেশের বাইরেও অনেকগুলি ঘাঁটি

তৈরি করেছিলো। পরে আমরা দেখবো যে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে স্থাপিত এদেরই এই রকম একটি ঘাঁটি কার্থেজ ধনসম্পদে এবং শক্তিক্ষমতায় এমন প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে এক সময় এটি রোম সাম্রাজ্যেরও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মাথা তুলে দাড়িয়েছিলো।

চাষবাসের ব্যাপারটা প্রাচীন সভ্যতাগুলির মতো অতো ব্যাপক এবং বিস্তৃতভাবে হতো না বলে এবং যেহেতু দূরদূরান্তে ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিলো এদের ধনসম্পদ বৃদ্ধির প্রধান ভিত্তি, খুব সম্ভব সেই কারণেই বাড়তি ধনসম্পদের পরিমাণ একজন দুজনের হাতে খুব বেশি জমা হতে পারে নি; আর সেটা হয় নি বলেই মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, আসীরিয়া বা হিট্টাইট্দের সমাজের মতো এখানে গোটা সমাজের উপর একজন-দুজনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ফিনিশীয়দের মধ্যে কোনো রাজা বা সম্রাটের পরিচয় আমরা পাই না। পুরোহিত ইত্যাদিরও তেমন প্রাধান্য চোখে পড়ে না। খুব সম্ভব ব্যবসা-বাণিজ্যের যারা প্রধান পরিচালক ছিলো, সেই রকম প্রধান প্রধান বণিক-সওদাগরদের নেতৃত্বেই ফিনিশীয়দের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালিত হতো।

ফিনিশীয়া ছিলো সেকালের সবচেয়ে সুদক্ষ বণিকদের দেশ। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুপরিচালনাই ছিলো এদের জীবনযাত্রার প্রধান ভিত্তি। আর বহু দেশের বহু লোকজনের সঙ্গে অসংখ্য জিনিস-পত্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের ফলে খুঁটিনাটি হিসাব সঠিকভাবে রাখার প্রয়োজন এখানকার বণিকদের কাছে ভীষণভাবে দেখা দিয়েছিলো। প্রাচীন সুমের-এ যেমন নগর-দেবতার ধনসম্পত্তির সঠিক হিসাব রাখবার জন্য লেখার আবিষ্কার হয়েছিলো, তার প্রায় দেড় হাজার বছর পরে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের সঠিক হিসাবপত্র ঠিক রাখার তাগিদ থেকেই ফিনিশীয়রা ধ্বনি-গত বর্ণমালার আবিষ্কার করেছিলো।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ নাগাদ সুমেরীয়দের প্রাচীন কিউনিফর্ম লিপি থেকে ২৯টি লিপি গ্রহণ করে ফিনিশীয়রা তার প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা একটি ধ্বনিচিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলো। লেখার ইতিহাসে খাঁটি বর্ণমালার আবিষ্কার হলো। আমরা আগেই বলেছি যে ফিনিশীয়দের আবিষ্কৃত এই বর্ণমালা থেকেই আধুনিক কালের প্রায় সমস্ত ভাষার বর্ণমালা উদ্ভূত। সভ্যতার ইতিহাসে তাই ফিনিশীয়দের অবদান কখনোই ভুলবার নয়।

মিনোয়ান ক্রীট

মিশর, ব্যাবিলোনিয়া এবং সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার যখন চূড়ান্ত বিকাশের যুগ, সেই সময় ভূমধ্যসাগরের ছোট্ট একটি দ্বীপে আরেকটি সভ্যতা গড়ে উঠতে শুরু করেছিলো। এই দ্বীপটি হলো ক্রীট। এখানকার এক পৌরাণিক রাজা "মিনস্"-এর নাম অনুযায়ী এই সভ্যতা "মিনোয়ান সভ্যতা" বলে পরিচিত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছরের কাছাকাছি এই সভ্যতার বিকাশ চোখে পড়ে। পরবর্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর গ্রীকরা যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো, মিনোয়ান সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মধ্যেই তাদের সেই সভ্যতার প্রাচীনতম সূচনা শুরু হয়েছিলো। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ আর্থার ইভান্স ক্রীটের মাটি খুঁড়ে এই সভ্যতার উদ্‌ঘাটন করেন।

ক্রীটের প্রাচীন এই মিনোয়ান সভ্যতা যারা গড়ে তুলেছিলো, তারা কোন জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিলো, তা নিয়ে পণ্ডিতমহল এখনো একমত হতে পারে নি। খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছর নাগাদ এদের মধ্যে লেখার প্রচলন হয়েছিলো; কিন্তু সিন্ধু উপত্যকার লেখার মতো এদের লেখার পাঠোদ্ধারও এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। অবশ্য চেক পণ্ডিত রোজনি এই লেখার একটি প্রাথমিক

পাঠোদ্ধার করেছেন, তবে সেটা এখনো পর্যন্ত সকলের সমর্থন লাভ করতে পারে নি।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ফিনিশীয়ার মতো ক্রীটেও ব্যাপকভাবে চাষবাস করবার তেমন অনুকূল অবস্থা ছিলো না। অন্যদিকে ছিলো সারা দ্বীপ জুড়ে ভালো ভালো কাঠের নানারকম গাছ-গাছড়া এবং জলপাইয়ের ঘন বন, এবং গোটা দ্বীপের পরিধি জুড়ে সমুদ্রের কূলে কূলে ভালো ভালো বন্দর তৈরি করবার মতো উপযুক্ত জায়গা। আর, সেকালের সভ্য জগতের প্রায় কেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত ছিলো এই দ্বীপটি। কাজেই, এখানকার অধিবাসীদেব পক্ষে ফিনিশীয়দের মতোই ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া গতি ছিলো না। গোটা সভ্য জগতের আনাচে-কানাচে বড়ো বড়ো নৌকোভর্তি জলপাই-তেল এবং ভালো কাঠের চালান দিয়ে ক্রীটের মানুষ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ধনসম্পদে ফেঁপে উঠেছিলো। দেখতে দেখতে গড়ে উঠলো নোসস্, মাল্লিয়া, টিলিসস্, ফেইস্টস্ প্রভৃতি বন্দর এবং শহর। এই সমস্ত শহরের ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি ছিলো অতুলনীয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ সালে গ্রীসে, ইজিয়ান সাগবেব দ্বীপগুলোতে, সাইপ্রাসে, সিরিয়ার উপকূলে, মিশরে এবং এমনকি সুদূব মেসোপটেমিয়ায় পর্যন্ত ক্রীটের বণিকরা যে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। জলপাইতেল, কাঠ, মাটির তৈরি সূক্ষ্ম কাজের নানারকম পাত্র এবং অন্যান্য বিলাস-ব্যসনের জিনিসপত্রই প্রধানত ক্রীট থেকে এই সমস্ত দেশে যেতো।

ক্রীটের সেই প্রাচীন লেখার পাঠোদ্ধার হয় নি বলে এখানকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পুরো পরিচয় জানা সম্ভব হয় নি ; তবে নানারকম তথ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয় যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যারা প্রধান

ছিলো, রাষ্ট্র-ক্ষমতা মোটামুটি তাদেরই হাতে ছিলো; এবং এদের মধ্যে থেকেই কালক্রমে রাজার উৎপত্তি হয়েছিলো। আর ওই রাজাই ছিলো একাধারে বণিক এবং পুরোহিত। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে ধনসম্পদ এবং ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধিতে সবচেয়ে শক্তিশালী নোসস্-এর রাজাই বোধ হয় সারা ক্রীটের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। নোসস্-এর এই রাজার নাম ছিলো মিনস্।

নোসস্-এ রাজার প্রাসাদটির যে ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে ক্রীটের অতুলনীয় ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিরাট এই প্রাসাদটিতে একদিকে যেমন রয়েছে ঐশ্বর্যবিলাস, এবং শিল্পসৌন্দর্য ও চারুকলার চরম উৎকর্ষের ছাপ, অন্যদিকে তেমনি বাণিজ্য-সওদাগরিই যে রাজার ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধির প্রধান ভিত্তি ছিলো তারও সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। মাটির নিচে প্রাসাদের একটি বিশেষ অংশ তৈরি করা হয়েছিলো, এবং এটি যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মালগুদাম হিসাবেই পুরোপুরি ব্যবহৃত হতো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো মাটির জালা এখানে সার দিয়ে রাখা হতো; এগুলোতে নিশ্চয়ই রপ্তানির জন্য থাকতো জলপাইতেল। তাছাড়া অন্য আরো অনেক জিনিসপত্র রাখবার ব্যবস্থাও এখানে ছিলো। প্রাসাদের এলাকার মধ্যেই ছিলো রপ্তানি-বাণিজ্যের জন্য জিনিসপত্র তৈরির কারখানা। অনেকটা প্রাচীন সুমের-এর নগর-দেবতার মন্দিরের মতো, কিন্তু সেগুলোর চেয়ে নোসস্-এর রাজপ্রাসাদ আকারে-আয়তনে অনেক বড়ো ছিলো। অর্থাৎ প্রাসাদের মালিকই যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাথা ছিলো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

সওদাগরি বাণিজ্যে শিল্পী-কারিগরদের তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা খুব ছিলো; আর বোধ হয় এই জন্যই মিশর, মেসোপটেমিয়া





নোসস্‌-এর প্রাসাদেব দেয়ালে আঁকা ফ্রেস্কো ছবির নমুনা



ক্রীটের মাটির তৈরি পাত্রের গায়ে নকশা

বা সিন্ধু উপত্যকার শিল্পী-কারিগরদের তুলনায় এখানকার শিল্পী-কারিগরদের অবস্থাও অনেক ভালো ছিলো। ফলে তাদের হাতের তৈরি জিনিসপত্র শিল্প এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে নিদারুণ উৎকর্ষ লাভ করেছিলো। বস্তুত ক্রীটের রাজপ্রাসাদের দেয়ালে আঁকা ফ্রেস্কো ছবি এবং মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা নকশা শিল্প-বিকাশের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করে আছে।

মিসেনীয় সভ্যতা

খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ নাগাদ মিনৌয়ান এই সভ্যতার অবসান ঘটতে শুরু করে। সমগ্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চল জুড়ে ক্রীট যে প্রায় ছশো বছর ধরে তার প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলো, এখন সেটা গ্রীসের মধ্যে অবস্থিত মিসেনী শহরের দখলে চলে যেতে শুরু করলো। এই সময় দক্ষিণ ইউরোপের এই সব অঞ্চলে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির প্রচণ্ড অভিযান শুরু হয়েছিলো। মিনোয়ানদের তুলনায় এরা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মোটেই তেমন উন্নত ছিলো না; কিন্তু বর্বর এই জাতিগুলো ব্রোঞ্জের তৈরি বড়ো বড়ো ঢাল-তলোয়ার এবং ঘোড়াচালিত রথ ব্যবহার করে যুদ্ধবিগ্রহে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলো। বস্তুত এদের সভ্যতার ভিত্তিই ছিলো যুদ্ধবিগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিসেনী-সভ্যতার শহরগুলিই ছিলো তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। এক-একটা শহর ছিলো পাথরের উঁচু দেয়ালঘেরা দুর্গের মতো। মাঝখানে যুদ্ধ-নেতার প্রাসাদ। শহরগুলির আয়তন তেমন কিছু বড়ো নয়। শিল্পসৌন্দর্য বা কারিগরির সূক্ষ্ম কাজের তেমন পরিচয়ও পাওয়া যায় না। হোমারের রচিত গ্রীক মহাকাব্য "ইলিয়াড" এবং "ওডিসী"র বিষয়বস্তুই হলো মিসেনী সভ্যতার বিকাশের এই যুগটি। হোমার যে "বীর"-দের গাথা গেয়ে গেছেন, তারা হলো মিসেনী সভ্যতার যুদ্ধবিগ্রহব্যস্ত এই বীররা।

"ট্রয়ের যুদ্ধ" হলো এদেরই ছুটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ।

মিনোয়ান সভ্যতার যুগে দেশবিদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের যে ব্যাপক প্রসার হয়েছিলো, প্রধানত তাকে ভিত্তি করেই মিসেনীয়-রাও মোটামুটি ব্যবসাবাণিজ্য চালাতো। এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর এবং পশ্চিমে সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালি পর্যন্ত এদের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিলো। বাণিজ্যেব সঙ্গে সঙ্গে এরা বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের উপনিবেশও গড়ে তুলেছিলো। খ্রীষ্টপূর্ব এক-হাজার বছর নাগাদ এদের প্রাধান্যের অবসান চোখে পড়ে। গ্রীসে তখন অন্য একটি সভ্যতা ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। লোহার যুগের এই গ্রীক সভ্যতা ব্রোঞ্জ-যুগের মিসেনীয় সভ্যতাবই প্রত্যক্ষ বংশধর—এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায়।

লোহার যুগ

ব্রোঞ্জযুগের প্রাচীন সভ্যতাগুলিব আলোচনা মোটামুটি শেষ হলো। পৃথিবীর ইতিহাসে এর পরের যে যুগ সেটা হলো লোহার যুগ। লোহার ব্যবহাব শেখা মানুষের ইতিহাসে আরেকটা যুগান্তকারী ঘটনা। এখনো পর্যন্ত মানুষেব অগ্রগতি এবং উন্নতি প্রধানত লোহা ব্যবহারের উপবেই নির্ভরশীল। অবশ্য, অল্প কিছুদিন হলো, মানুষেব বিভিন্ন কাজে আণবিক শক্তি ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনার যে পথ আবিষ্কৃত হয়েছে সেটা মানুষের নতুন একটা তীব্র অগ্রগতিরই সূচনা করছে। অতীতের ইতিহাসে যেমন পাথর, তামা ও ব্রোঞ্জ এবং লোহার ব্যবহার সমাজেব অগ্রগতির পক্ষে এক একটা বড়ো বড়ো ধাপ, তেমনি আণবিক শক্তির ব্যবহার মানুষের ভবিষ্যতের ইতিহাসে নিশ্চয়ই একটা সুদূরপ্রসারী ঘটনা হয়ে উঠবে।

পাথরের হাতিয়ারের বদলে তামা এবং ব্রোঞ্জ ব্যবহারের ফলে অসংখ্য দিক দিয়ে মানুষের যে প্রচণ্ড সুবিধা হয়েছিলো, লোহার ব্যবহার সেই সমস্ত সুবিধাকে হাজারগুণ বাড়িয়ে দিলো। কারণ, প্রথমত, তামা ও ব্রোঞ্জের চেয়ে লোহা অনেক বেশি শক্ত এবং কঠিন, অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী; দ্বিতীয়ত, তামা বা টিনের মতো লোহা তেমন দুষ্প্রাপ্য নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে খনিজ লোহার পরিমাণ বেশ পর্যাপ্ত। তামা-ব্রোঞ্জের ব্যবহার সমাজে চালু হলেও, এর দুষ্প্রাপ্যতা এবং স্বভাবতই তার ফলে দুর্মূল্যতার জন্য এটা ব্যাপকভাবে সমাজে প্রচলিত হতে পারে নি। যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে বা সমাজের উঁচুশ্রেণীর লোকজনের বিলাসব্যসন ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা শিল্পভাস্কর্যের ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার ছিলো সীমাবদ্ধ। কিন্তু লোহার ব্যবহার আবিষ্কৃত হবার ফলে সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একটা ওলটপালট এসে গেলো। হাজারগুণ বেশি কাজের একটি ধাতু এই প্রথম সমাজের সাধারণ লোকের হাতে এলো। ব্রোঞ্জ-যুগের সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজে যে পরিমাণ ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করতো, লোহার যুগের সাধারণ মানুষ তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি ধাতুর জিনিসপত্র ব্যবহার করতো। লক্ষ লক্ষ বছর পরে এই প্রথম বোধ হয় মানুষের কোনো কোনো সমাজ পাথরের হাতিয়ারের ব্যবহারের প্রয়োজন একেবারে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলো।

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার

লোহার ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় চাষবাস এবং শিল্প কারিগরির কাজে প্রচণ্ড সুবিধা হয়েছিলো। ব্রোঞ্জ-যুগে যে কোনো চাষীর পক্ষেই ব্রোঞ্জের কুড়ুল কিংবা লাঙল ব্যবহার করা

সম্ভব ছিলো না; কিন্তু সেই চাষী এখন সচ্ছন্দে লোহার কুড়ুল কিংবা লাঙল ব্যবহার করতে সক্ষম হলো। নিজের নিজের কাজে যে সমস্ত যন্ত্রপাতির দরকার হয়, সস্তা লোহার তৈরি সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে বিভিন্ন কারিগরশ্রেণী এখন প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠলো। আগের যুগে তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরি এই সমস্ত যন্ত্রপাতির জন্য রাজারাজড়া বা উঁচুশ্রেণীর লোকদের উপরেই তাদের নির্ভর করতে হতো। যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রেও লোহার ব্যবহার একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিলো; কারণ আগের যুগের যুদ্ধে দুচারজন বিশিষ্ট লোকই শুধুমাত্র ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো, সকলের পক্ষেই এর ব্যবহার সম্ভব ছিলো না। সাধারণত অন্য সবাই পাথরের অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করতো। কিন্তু লোহার ব্যবহার আবিষ্কৃত হবার পর সাধারণ সকলের পক্ষেই লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়ে উঠলো। পরে আমরা দেখবো যে ঠিক এই কারণেই তামা-ব্রোঞ্জের ব্যবহারেব উপর নির্ভরশীল প্রাচীন সভ্যতার এই ঘাঁটিগুলো লোহার-ব্যবহার-জানা বর্বর জাতিদের আক্রমণে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছিলো।

পশ্চিম এশিয়ার আর্মেনিয়ান পর্বতমালা অঞ্চলের বর্বর জাতিদের মধ্যেই প্রথম খনিজ লোহা থেকে প্রচুর পরিমাণ লোহা তৈরি করবার সহজ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এশিয়া মাইনর নামে পরিচিত এই অঞ্চলটিতে খনিজ লোহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। লোহার কাজে এখানকার অধিবাসীরা, বিশেষত মিতানী এবং হিট্টাইট্রা বিশেষ পারদর্শী ছিলো। হিট্টাইট্দের প্রাচীন লোহা-শিল্পের ধ্বংসাবশেষও এই অঞ্চলে বিস্তর পাওয়া গেছে। সে যুগে লোহার ব্যবহার যেহেতু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিলো, খুব সম্ভব সেই হেতুই প্রচুর পরিমাণ লোহা তৈরির সহজ পদ্ধতি যারা জানতো, তারা সেই পদ্ধতিটিকে নিজেদের মধ্যেই গোপনীয় করে রাখার

চেষ্টা করতো। প্রাচীন মিতানীদের মধ্যে এ ব্যাপারটি বেশ্ সুস্পষ্ট ভাবেই চোখে পড়ে। হিট্টাইট্রাও যে এ বিষয়ে একই নীতি অনুসরণ করতো তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাই হোক খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর থেকে এক হাজার বছর নাগাদ ইউরোপ এবং এশিয়ায় প্রধানত লোহা-ব্যবহারকারী ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর প্রবল অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

পরিশিষ্ট

দেহগত আকৃতি-প্রকৃতির তারতম্য অনুযায়ী, অর্থাৎ চুল, চোখ, নাক, মাথার খুলি, গায়ের রং প্রভৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের যে ভাগ-বিভাগ করা হয়—নৃতত্ত্ববিজ্ঞানে সেটা একটা দীর্ঘদিনের প্রচণ্ড বিতর্কমূলক বিষয়। এ বিষয়ে মূল সমস্যা প্রধানত দুটি। এক: প্রাণি-জগতের বিবর্তনের ক্রম-বিকাশে একটি জায়গায় এবং একটি মূল উৎস থেকেই মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো, না, এই ক্রমবিকাশের ধারায় এক সঙ্গে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন মানুষের গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিলো। এ প্রশ্নের জবাবে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। দুই: উপরের ওই প্রশ্ন থেকেই আরেকটি প্রশ্ন ওঠে। সেটা হলো এই যে, জীব হিসাবে গোটা মানুষের সমাজ একই শ্রেণীভুক্ত হলেও, দৈহিক আকৃতি এবং বর্ণের দিক দিয়ে বিভিন্ন মানুষের গোষ্ঠীতে যে পার্থক্য রয়েছে, সে পার্থক্যের উৎস কি? পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময় থেকেই কি এই পার্থক্য ছিলো? এ বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে নানারকম বিপরীত মত আছে। এক দলের মত হলো যে কিছু কিছু পার্থক্য নিয়েই এই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো, ফলে গোটা মানুষের সমাজে দেহগত আকৃতি ইত্যাদির দিক দিয়ে মূল কয়েকটি বিশিষ্ট আলাদা আলাদা গোষ্ঠী এখনো পর্যন্ত তাদের পৃথক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে আছে। তাঁদের মতে গোটা মানুষের সমাজে এগুলোই হলো আদি এবং "খাঁটি" জাতি। আরেকদল পণ্ডিত ওই "আদি ও খাঁটি" জাতিতে বিশ্বাসী নন। তাঁরা বলেন যে শুরু থেকেই মানুষের মধ্যে ক্রমাগত এমন একটি মিশ্রণ ও সংমিশ্রণের ধারা চলে আসছে যে এই ধরনের কোনো "খাঁটি" জাতির কথা ভাবাই যায় না।

যাই হোক, সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো মানুষের মধ্যে মোটামুটি কয়েকটি মূল পার্থক্য এখনো নজরে পড়ে। আগেই বলেছি, এ পার্থক্যগুলি কিন্তু শুধুই শরীরের গঠন, রং ইত্যাদির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা এই পার্থক্যগুলি অনুযায়ী মানুষকে মোটামুটি চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন

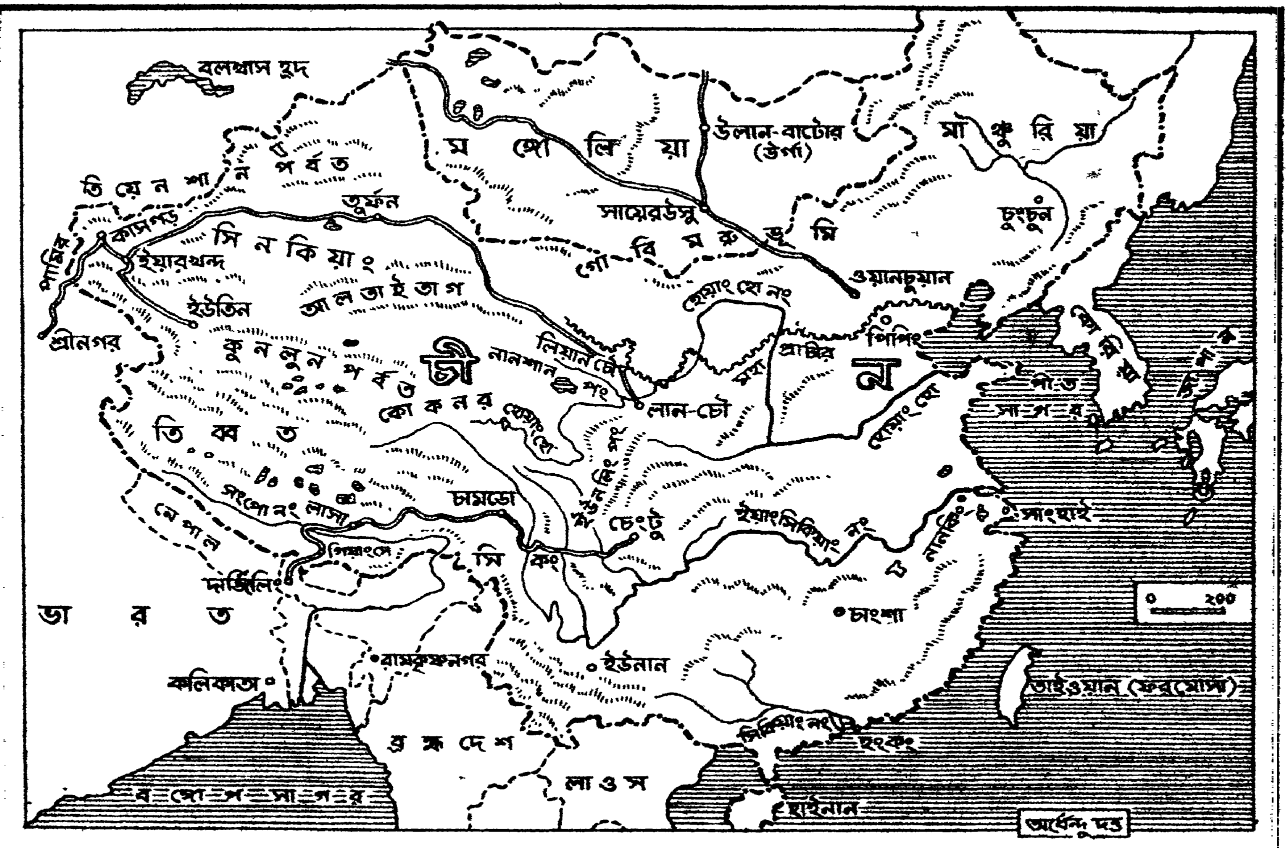
(১) ইউরোপ, ভূমধ্যসাগর অঞ্চল এবং পশ্চিম এশিয়া জুড়ে শ্বেতকায় যে মানুষের দল চোখে পড়ে, পণ্ডিতরা তাকে **ককেশয়েড** বলে অভিহিত করেছেন। ককেশিয়ানদের মধ্যে আবার কয়েকটি প্রধান উপশাখা আছে। একেবারে উত্তর অঞ্চলের শ্বেতকায় মানুষ বা নর্ডিক; মাঝামাঝি আরেকটি দল অর্থাৎ আলপাইন্; এবং দক্ষিণ অঞ্চলের ঈষৎ ঘন বর্ণের মানুষ অর্থাৎ মেডিটারেনিয়ান বা আইবেরিয়ান। (২) পূর্ব এশিয়া এবং আমেরিকা মহাদেশ জুড়ে পীতকায় যে মানুষের দল চোখে পড়ে তারা হলো **মঙ্গোলয়েড**। (৩) আফ্রিকার ঘন কৃষ্ণকায় মানুষের দল হলো **নিগ্রয়েড**, এবং (৪) অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীরা—পণ্ডিতরা যাকে **অষ্ট্রেলয়েড্** বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য কালক্রমে এই চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের জাতির পরস্পাবের মধ্যে প্রচুর মিশ্রণ এবং সংমিশ্রণ হবার ফলে নানারকম মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন জাতিগত বৈষম্যের দিক দিয়ে, তেমনি ভাষাগত বৈষম্যের দিক দিয়েও পণ্ডিতমহলে নানারকম মতভেদ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে আমরা অসংখ্য ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। এগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতরা মানুষের ভাষা-গোষ্ঠীকেও কয়েকটি মূল বিভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) **ইন্দো-ইউরোপীয়ঃ** এর অন্তর্ভুক্ত হলো কেল্ট্, গ্রীক, ল্যাতিন, টিউটনিক, স্লাভ, আর্য, হিট্টাইট্ ইত্যাদি। (২) **সেমিটিকঃ** এর অন্তর্ভুক্ত হলো প্রাচীন ব্যাবিলন ও আসীরিয়ার ভাষা, ফিনিশীয়দের ভাষা, হিব্রু, সিরিয়ান, আরব, আবিসিনিয়ান্, ইত্যাদি। (৩) **হামিটিকঃ** প্রাচীন মিশরবাসীদের ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাছাড়া উত্তর আফ্রিকার বার্বার এবং পূর্ব আফ্রিকার সোমালী ইত্যাদি ভাষাও এর অন্তর্ভুক্ত। (৪) **তুরানিয়ান** বা ফিনো উগ্রীয়ঃ ল্যাপল্যাণ্ড, সাইবেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ম্যাজার, তুর্কী, মাঞ্চু, মোঙ্গল, ইত্যাদি ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত। (৫) **ভোট চীনঃ** চীন, বর্মী, শ্যাম এবং তিব্বতী ভাষাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। (৬) **আমেরিণ্ডিয়ানঃ** অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলি। (৭) **অষ্ট্রিকঃ** মালয় এবং পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষাসমূহ। আফ্রিকার

বান্টু-দের মধ্যে প্রচলিত ভাষাটিও একটি আলাদা বিশিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কেও নানারকম মতামত আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটা হলো এই যে, এখনো পর্যন্ত মানুষের ব্যবহৃত কয়েকটি প্রাচীন ভাষার পাঠোদ্ধার হয় নি বলে সেই ভাষাগুলির গোষ্ঠীবিভাগ সম্পর্কে সঠিকভাবে এখনো কিছু বলা যায় না। এগুলো হলো (১) প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার ভাষা, (২) প্রাচীন ক্রীটের ভাষা, (৩) সুমের-এর প্রাচীনতম অধিবাসীদের ভাষা।

চীন


বলখাস হ্রদ
মঙ্গোলিয়া
উলান-বাটোর
(উর্গা)
মাঞ্চুরিয়া
তিয়েন শান পর্বত
তুর্ফন
সায়েরউসু
গোবি মরুভূমি
চুংচুন
কাসগড়
সিনকিয়াং
ইয়ারখন্দ
ওয়ানচুয়ান
ইউতিন
আলতাই তাগ
শ্রীনগর
লিয়ান চৌ
কুনলুন পর্বত
চীন
নানশান
লান-চৌ
কোকনর
পীত সাগর
তিব্বত
চামডো
ইয়াংসিকিয়াং নং
সাংহাই
নেপাল
চেংটু
দার্জিলিং
সিকং
চাংশা
ভারত
০ ২০০
রামকৃষ্ণনগর
ইউনান
কলিকাতা
তাইওয়ান (ফরমোসা)
ব্রহ্মদেশ
হংকং
লাওস
বঙ্গোপসাগর
হাইনান
অর্দ্ধেন্দু দত্ত

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

চীন

নীল নদী থেকে সিন্ধুনদী পর্যন্ত বিস্তৃত এই 'অঞ্চলেই মানুষের ইতিহাসে প্রথম সভ্যতার সূচনা হয়েছিলো। কিন্তু এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত চীন দেশে হোয়াং-হো নদীর উপত্যকায় মানুষের আরেকটি সুপ্রাচীন সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিলো। এখনো পর্যন্ত এখানকার প্রাচীন ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের কাজে যে পবিমাণ প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে মেসোপটেমিয়া, মিশর বা সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার মতো এখানকার সভ্যতার সূচনা অতো সুপ্রাচীন না হলেও, খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছবের কিছু পরেই এখানেও ব্রোঞ্জ যুগের একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা নিঃসন্দিগ্ধভাবেই গড়ে উঠেছিলো। অবশ্য, চীনের পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী চীনদেশে এই সভ্যতার সূচনা আরো অনেক সুপ্রাচীন, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এখনো পর্যন্ত সুদূর সেই অতীতের ইতিহাস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। প্রত্নতত্ত্বের আরো ব্যাপক গবেষণার ফলে হয়তো ভবিষ্যতে এই ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে আসবে।

বিশাল দেশ

এ পর্যন্ত আমরা প্রাচীন সভ্যতার যে কটি কেন্দ্রের বিষয়ে আলোচনা করেছি, সে কেন্দ্রগুলোর তুলনায় এশিয়ার এই পূর্ব প্রান্তের কেন্দ্রটি

আয়তনে অনেক বড়ো। চীন একটি বিরাট দেশ, প্রায় একটি মহাদেশের মতো। প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিরাট এই ভূখণ্ড নানারকম বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। একদিকে যেমন ঘন পাহাড় পর্বত, অন্যদিকে তেমনি বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, একদিকে যেমন শুষ্ক রুক্ষ মরুভূমি, অন্যদিকে তেমনি শ্যামল সবুজ সমতলভূমি—চীন দেশের বিশাল বুকে এই সবরকম বৈচিত্র্যই দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দিক দিয়ে চীনদেশকে মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এক: পশ্চিম মাঞ্চুরিয়ার খানিকটা অংশ নিয়ে এবং প্রায় গোটা মঙ্গোলিয়াসুদ্ধ যে অঞ্চলটি, সেটি হলো বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল। যুগ যুগ ধরে পশুপালক যাযাবর মানুষের বাসভূমি হলো বিরাট এই অঞ্চলটি—এখনো পর্যন্ত এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বেশির ভাগই হলো পশুপালক এই যাযাবর মানুষের দল। দুই: উত্তর চীনের প্রকাণ্ড সমতলভূমি। তিন: দক্ষিণ চীনের ঘন পাহাড়ী অঞ্চল এবং খানিকটা সমতলভূমি। হোয়াং-হো বা পীত নদী-বিধৌত উত্তর চীনের ওই সমতলভূমিতেই চীনের মানুষের প্রাচীন সভ্যতার সবচেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া গেছে। অবশ্য ইয়াং সিকিয়াং এবং সিকিয়াং নদী দুটি যে-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে, দক্ষিণ চীনের সেই সমতলভূমি অঞ্চলে এবং এর ঘন পাহাড়ী অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ এখনো তেমন বেশি হয় নি; ফলে দক্ষিণের এই অঞ্চলটির মানুষের প্রাচীন ইতিহাস এখনো পর্যন্ত আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এ পর্যন্ত চীনের প্রাচীন ইতিহাস এবং সভ্যতা সম্পর্কে যেটুকু জানা গেছে, তা প্রধানত উত্তর চীনের হোয়াং-হো উপত্যকার ওই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলেই জানা গেছে। উত্তর চীনের এই সমতলভূমিতেই প্রাচীন চীনের সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিলো।

মানুষ

চীনের পীতকায় প্রাচীনতম অধিবাসীরা এদেশের খাঁটি এবং আদি অধিবাসী ছিলো, না, পশ্চিম থেকে এরা চীনে এসে বসবাস শুরু করেছিলো, এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন এই অধিবাসীদের সম্বন্ধে সাধারণ একটা ধারণা হলো এই যে পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার টারিম্ উপত্যকা থেকে আদিম মানুষের যে দল পুবদিকে অগ্রসর হতে হতে উত্তর চীনের সমতলভূমিতে স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করেছিলো, তারাই হলো চীনের বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ। এরাই ক্রমশ ক্রমশ গোটা চীনদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। দক্ষিণ চীনে এদের এই বিস্তার সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত চলে আসছে। এটা ঠিক যে চীনদেশে ব্রোঞ্জ-যুগের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো এবং যে সভ্যতা ক্রমশ সারা চীনদেশ ছড়িয়ে পড়েছিলো, তার প্রথম উৎপত্তিকেন্দ্র ছিলো উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর চীন। তবে এই সভ্যতা বাইরে থেকে আসা অন্য কোনো আলাদা একটি জাতির সৃষ্টি কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার ফলে নরকঙ্কালের যে সমস্ত প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গেছে, এবং এগুলো সবই প্রায় ব্রোঞ্জ-যুগের উন্নত সভ্যতার বসতিগুলো থেকেই পাওয়া গেছে, সেই সমস্ত নরকঙ্কাল পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা দেখেছেন যে আধুনিককালের চীনের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য হুবহু এক। অর্থাৎ ব্রোঞ্জ সভ্যতার সেই যুগে চীনে যে মানুষরা বসবাস করতো, জাতিগত দিক দিয়ে তারাই যে আধুনিক চীনের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। আর, তারা বাইরে থেকেই আসুক কিংবা এদেশের আদিম অধিবাসীই হোক, হোয়াং-হো নদীর উপত্যকাতেই যে চীনের এই আদিম অধিবাসীদের প্রথম বসবাস শুরু হয়েছিলো এ সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য কালক্রমে

এদের সঙ্গে অন্যান্য নানা জাতির সংমিশ্রণও ঘটেছিলো। প্রাচীন এবং বর্তমান চীনের এই মূল জাতিটি ছাড়াও চীনে কয়েকটি উপজাতির সংখ্যাও বেশ প্রচুর। এদের মধ্যে মিয়াও, লোলো এবং চুং-চিয়াং উপজাতিগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা সবাই চাষবাসের উপর নির্ভরশীল।

চীনের প্রত্নতত্ত্ব

পৌরাণিক উপাখ্যান এবং প্রচলিত লোককথা ছাড়া তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে পর্যন্তও চীনের প্রাচীন ইতিহাস তেমন সুস্পষ্ট ভাবে কিছুই জানা ছিলো না। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জে. জি. অ্যাণ্ডারসন উত্তর চীনের বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু করেন। তাঁর এই খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো পাথরের, নতুন পাথরের এবং ব্রোঞ্জ-যুগের অনেকগুলি বসতি এবং জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়। আর, এর ফলে চীনের সেই প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারের অস্পষ্টতা কাটিয়ে উঠে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। চীনে, বিশেষত উত্তর চীনে যে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের বসবাস চলে আসছে, এবং এখানেও যে ব্রোঞ্জ-যুগের একটি সুউন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো, এ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই থাকলো না। চীনের এই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ঘাটনের কাজে অ্যাণ্ডারসন ছাড়া, টিং-ওয়েন্-চিয়াং, ফি-ওয়েন-চুং, ক্রীল, লিসেণ্ট, টাইল্হার্ডট্, গ্রানেট্, বিশপ—প্রভৃতি দেশবিদেশের বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের নামও বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

চীনদেশে মানুষের সবচেয়ে প্রাচীনতম অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে পিকিং-এর কাছে চৌ-কু-টিয়েন পাহাড়ের গুহা থেকে। ১৯২৭ সালে ফি-ওয়েন-চুং এখান থেকে প্রাচীন মানুষের একটি

মাথার খুলির অবশিষ্টাংশ আবিষ্কার করেন। দেশবিদেশের পণ্ডিতরা এটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে চৌ-কু-টিয়েন-এর এই মানুষটি মানুষের আদিমতম পূর্বপুরুষদের অন্যতম। "পিকিং-এর মানুষ" বা "Sinanthropus Pekinensis" বলে অভিহিত চীনের এই মানুষ ইউরোপের নিয়েণ্ডার্থাল মানুষের চেয়ে প্রাচীনতর, এবং পণ্ডিতদের মতে প্রায় চারলক্ষ বছর আগেই এই মানুষ চীনের বুকে বেঁচে ছিলো। এরা যে-গুহাগহ্বরে বসবাস করতো তার কাছাকাছি অনেকগুলি পাথরের আদিম হাতিয়ারও আবিষ্কৃত হয়েছে ; পণ্ডিতরা এই হাতিয়ারগুলোকে উষার পাথরের যুগের হাতিয়ার বলে অভিহিত করেছেন। এরা হাড় এবং শিং-এর তৈরী জিনিসপত্রও ব্যবহার করতো, আগুনের ব্যবহার জানতো।

পুরনো পাথরের যুগ

চার লক্ষ বছর আগের ওই আদিমতম অধিবাসী "পিকিং-এর মানুষের" পর দীর্ঘকাল চীনে মানুষের আর কোনো অস্তিত্বের পরিচয় এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এব পর উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত গোটা উত্তর চীন জুড়ে প্রাচীন মানুষের যে আরো অনেকগুলি বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো সবই প্রায় পঁচিশ হাজার বছর আগেকার পুরনো পাথরের যুগের বসতি। হোয়াং-হো নদীর ধারে শুই-তুং-কু নামে একটি জায়গায় পুরনো পাথরের যুগেব এই রকম প্রাচীন একটি বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রায় ৬০-ফুট-লম্বা এই বসতিটিতে যদিও মানুষের কোনো কঙ্কাল পাওয়া যায় নি, কিন্তু মানুষেরই ব্যবহৃত অজস্র হাতিয়ার এবং খাবারের পর ফেলে-দেওয়া জন্তুজানোয়ারের প্রচুর হাড়গোড় এখানে ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুরনো পাথরের যুগের একবারে গোড়ার দিকে যে ধরনের হাতিয়ার মানুষের সমাজে

প্রচলিত হয়েছিলো, এখানকার হাতিয়ারগুলো প্রায় সেই ধরনেরই। জন্তুজানোয়ারের মধ্যে বন্য গাধা এবং ঘোড়া, গণ্ডার, হরিণ, হায়েনা এবং উটপাখির হাড়গোড় পাওয়া গেছে। হোয়াং-হোর উপশাখা সারা-ওস্‌সো-গোল্ নদীর ধারে অন্য আরেকটি যে প্রাচীন বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে একদিকে যেমন একেবারে তলার দিকে পুরনো পাথরের যুগের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি একেবারে উপরের স্তরে নতুন পাথরের যুগের মানুষের বসতির চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, পুরনো পাথরের যুগ থেকে ধাপে ধাপে কীভাবে এখানকার মানুষ নতুন পাথরের যুগে অগ্রসর হয়ে এসেছিলো—তার ধারাবাহিক ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। এখানে পুরনো পাথরের যুগের যে সমস্ত হাতিয়ার পাওয়া গেছে সেগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এগুলোর আকার খুবই ছোটো; সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ারটিই লম্বায় মাত্র তিন ইঞ্চি। এ দুটি বসতি ছাড়া উত্তর চীনের কান্‌সু প্রদেশের কিংইয়ান এবং শেন্‌সি প্রদেশের য়ু-ফেং-তু, এ দুটি জায়গাতেও পুরনো পাথরের যুগের আরো দুটি প্রাচীন বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বসতিগুলোতে মানুষের যে সমস্ত হাতিয়ার এবং জন্তুজানোয়ারের হাড়গোড় পাওয়া গেছে, সেগুলো থেকে বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে প্রাচীন এই বসতিগুলোর মানুষ পুরোপুরি শিকার এবং সংগ্রহের উপরেই নির্ভরশীল ছিলো।

প্রত্নতত্ত্বের ফাঁক

চীনের প্রাচীন ইতিহাসে পুরনো পাথরের যুগের মানুষের এই সমাজ একটা স্তর পর্যন্ত এগিয়ে এসে হঠাৎ যেন থেমে গিয়েছিলো। কারণ গোটা চীনে পুরনো পাথরের যুগ থেকে নতুন পাথরের যুগ পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস কোথাও চোখে

পড়ে না। পুরনো পাথরের যুগ এবং নতুন পাথরের যুগের মাঝামাঝি যে যুগটিকে পণ্ডিতরা মাঝের পাথরের যুগ বলে অভিহিত করেছেন, সে যুগের মানুষের বসবাসের কোনো চিহ্ন বা হাতিয়ারের কোনো নিদর্শন এ পর্যন্ত চীনে পাওয়া যায় নি। অবশ্য উত্তরে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল এর ব্যতিক্রম, কারণ মাঞ্চুরিয়াতে এই ইতিহাস বেশ সুস্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে।

পুরনো পাথরের যুগের এই বসতিগুলোর সুদীর্ঘকাল পরে খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর নাগাদ চীনদেশ যেন হঠাৎ আবার জেগে উঠেছিলো। এই সময় পুরোপুরি নতুন পাথরের যুগের চাষবাস জানা মানুষের এক চঞ্চল সমাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। পশুপালন জানা থাকলেও প্রধানত চাষবাসের উপর নির্ভরশীল অসংখ্য কর্মব্যস্ত গ্রাম এই সময় চোখে পড়ে। এই সমস্ত গ্রামের মানুষ ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ এবং মাটির পাত্র তৈরি করার কাজ যে জানতো তারও সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

নতুন পাথরের যুগ

সমগ্র চীনের প্রায় সর্বত্রই নতুন পাথরের যুগের বসতির খোঁজ পাওয়া গেছে। একেবারে দক্ষিণে কোয়াংসি প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে য়ুনান প্রদেশেও নতুন পাথরের যুগের মানুষের বসবাসের সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। মধ্য চীনেও যে ব্যাপক ভাবে নতুন পাথরের যুগের মানুষের বসবাস ছিলো, সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরনো পাথরের যুগের মতো নতুন পাথরের যুগেরও সবচেয়ে বেশি এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে উত্তর চীনে। উত্তরপশ্চিমের কান্‌সু প্রদেশ থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বের শানটুং প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে

প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপক যে কাজ হয়েছে, তার ফলে নতুন পাথরের যুগের অনেকগুলো বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত বসতিগুলো থেকে নতুন পাথরের যুগের বহু হাতিয়ার, এবং মাটির পাত্র উদ্ধার করা হয়েছে। অবশ্য মাটির এই পাত্রগুলো তৈরি করার কাজে তখনো পর্যন্ত খুব সম্ভব কুমোরের চাকের ব্যবহার চালু হয় নি। এই সমস্ত বসতি থেকে আরেক ধরনের যে বিশিষ্ট পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে, সেগুলো খুব সম্ভব লাঙলের আদিমতম ফলা হিসাবেই ব্যবহৃত হতো বলে পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন।

উত্তর চীনের নতুন পাথরের যুগের বসতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ইয়াংশাও-তে আবিষ্কৃত বসতিটি। প্রায় ছশো গজ লম্বা এবং পাঁচশো গজ চওড়া এই বসতিটির অধিবাসীরা রীতিমতো চাষবাস জানতো, এবং প্রথম প্রথম জোয়ার-ই ছিলো এদের প্রধান খাদ্য; পরের দিকে অবশ্য ভাত-ই এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্য হয়ে উঠেছিলো। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছিলো কুকুর, শুয়োর, ভেড়া এবং গোরু। কুমোরের চাকের প্রচলন না হলেও ইয়াংশাও-এর নতুন পাথরের যুগের এই অধিবাসীরা মাটির নানারকম রঙীন পাত্র তৈরী করতো। প্রাচীন চীনে রঙীন মাটির পাত্রের প্রচলন এই প্রথম চোখে পড়ে। ইয়াংশাও-এর বসতিটি খ্রীষ্টের জন্মের ২৩০০ বছর আগেই যে টিকে ছিলো, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তর-পূর্বে হোনান্ এবং শান্সি প্রদেশে নতুন পাথরের যুগের এর পরের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো লুংশান্-এর বসতিটি। এ বসতিটি ইয়াংশাও-এর পরবর্তী সময়ের, এবং জীবনধারণের ব্যবস্থার দিক দিয়ে এটি ইয়াংশাও-এর চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলো। এখানকার মানুষের সমাজে কুমোরের চাকের রীতিমতো প্রচলন হয়েছিলো, এবং প্রধান প্রধান গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে

ছোটোখাটো কয়েকটি শহরও গড়ে উঠেছিলো। খুব সম্ভব চাকার ব্যবহারও এরা জানতো; কিন্তু এই বসতিতে ধাতু ব্যবহারের কোনো চিহ্ন নজরে পড়ে না। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ বছর—এই হলো চীনের নতুন পাথরের যুগের মোটামুটি সময়কাল।

ব্রোঞ্জ-যুগ

এর পর খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ বছর নাগাদ চীনে ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ চোখে পড়ে। প্রাচীন চীনের ইতিহাসে নতুন পাথরের যুগের সংস্কৃতির বিকাশ যেমন হঠাৎ চোখে পড়ে, ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতাও যেন সেইভাবে চীনের বুকে হঠাৎ বিকাশলাভ করেছিলো। কারণ খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ বছর পর্যন্তও চীনের কোনো প্রাচীন বসতিতেই ধাতুব্যবহারের প্রচলন নজরে পড়ে না; অথচ এর একশো বছরের মধ্যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর নাগাদ সমগ্র চীনে ব্যাপকভাবে ব্রোঞ্জের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

চীনে ব্রোঞ্জ-যুগের এই সভ্যতার বিকাশ চীনের ইতিহাসে শাং বা ইং রাজবংশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। কারণ এই সভ্যতার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শনগুলো পাওয়া গেছে এই শাং রাজবংশের রাজধানী হোনান প্রদেশের আনিয়াং থেকে।

"দৈববাণী"র হাড়

আনিয়াং-এর ঐ অঞ্চলটি যে প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিলো, সেটা অনেকদিন আগে থেকেই পণ্ডিতমহলে জানা ছিলো। কারণ, বহুদিন আগে থেকেই এর কাছাকাছি জমিতে চাষবাস করবার সময় চাষীদের লাঙলের ফলায় মাঝে মাঝে প্রায়ই খুব পুরনো হাড়ের টুকরোটাকরা বেরিয়ে আসতো। অশিক্ষিত চাষীরা

এগুলোকে "ড্রাগনের হাড়" মনে করে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করতো। কিন্তু এই হাড়ের টুকরোগুলোর প্রতি ক্রমশ পণ্ডিতদের নজর পড়লো; তাঁরা এগুলোকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন যে এগুলোর গায়ে কী যেন সব লেখা আছে। লেখা-গুলো সবই খুব প্রাচীন। ১৮৯৯ সালেই এটা ধরা পড়ে। এবং তারপর কয়েকবছর ধরে এই লেখাগুলো সম্বন্ধে নানারকম গবেষণা করে পণ্ডিতরা সবাই এই হাড়ের টুকরোগুলোর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একমত হলেন। এর পর অবশ্য এই লেখা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, এবং তার ফলে দেখা যায় যে চীনে সেই প্রাচীন যুগে যে লিপিতে লেখা হতো, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর কেটে গেলেও সেই লিপির ছুচারটে আজো পর্যন্ত চীনের লেখায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আনিয়াং-এর এই প্রাচীন হাড়ের টুকরোগুলো সে যুগে "দৈববাণী" হিসাবেই ব্যবহৃত হতো। স্তন্যপায়ী পশুর কাঁধের শক্ত হাড় কিংবা কাছিমের শক্ত খোলসের উপর জ্বলন্ত আগুনের টুকরো চেপে ধরা হতো। আর, তার ফলে অত্যধিক গরমে এই হাড়ের উপর নানারকম ফাটলের রেখা দেখা দিতো; সেই ফাটলের রেখাগুলোর অবস্থান বিচার করে "দৈববাণী"র নির্দেশ বোঝবার চেষ্টা হতো। সে যাই হোক, আনিয়াং-এর এই "দৈববাণী"-যুক্ত হাড়গুলো প্রাচীন চীনের ইতিহাস জানবার পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; কারণ এগুলোর আবিষ্কারের ফলে এবং এদের গায়ে যে প্রাচীন লেখাগুলো আছে সেগুলোর পাঠোদ্ধারের ফলে খ্রীষ্টপূর্ব দেড়হাজার বছর আগের চীনের ইতিহাসের সুস্পষ্ট কতকগুলি তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ সালে শাং রাজবংশের রাজা ফান্‌কেং রাজধানী হিসাবে আনিয়াং শহরটি গড়ে তুলেছিলেন।

পৌরাণিক যুগ

প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার ফলে খ্রীষ্টপূর্ব দেড়হাজার বছর নাগাদ শাং রাজ-বংশের আমল থেকেই চীনে ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতার সুস্পষ্ট ইতিহাসের সূচনা চোখে পড়ে। এই আমলের লেখা-যুক্ত "দৈববাণী"র ওই হাড়গুলোই হলো প্রাচীন চীনের লিখিত নথিপত্রের প্রথম সূত্রপাত। এর আগে প্রাচীন চীনের সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার কি রূপ ছিলো, প্রত্নতত্ত্বে সেটা এখনো পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় নি। তবে চীনের প্রাচীন পুরাণ-উপপুরাণে যে সমস্ত উপাখ্যান আছে, তাতে অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই চীনের ইতিহাসের সূচনার কথা বলা আছে। এই উপাখ্যানগুলিতে যে ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেগুলোর সত্যতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হলেও, এগুলো থেকে চীনের প্রাচীন ইতিহাসের মোটামটি একটি ছবি পাওয়া যায়। আদিম বন্য অবস্থা থেকে কীভাবে ধাপে ধাপে চীনের মানুষ ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতার স্তর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলো তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এই উপাখ্যানগুলিতে বেশ সুস্পষ্ট। পৌরাণিক এই উপাখ্যানে বলা আছে যে দৈবশক্তিবিশিষ্ট স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা পান্-কু ছিলেন প্রথম মানুষ। এর পর স্বর্গের সম্রাট, মর্ত্যের সম্রাট এবং মনুষ্যজাতির সম্রাট, এই তিনজন সম্রাট ছিলেন। সুই-জেন নামে আরেকজন সম্রাট প্রথম আগুনের আবিষ্কার করেন। এঁদের পর ফু-সি নামে একজন সম্রাটের আবির্ভাব হয়। ইনিই প্রথম চীনে শিকার ও সংগ্রহ এবং পশুপালনের প্রবর্তন করেন। ফু-সি-র পরবর্তী সম্রাট শেন্-নুং চাষবাসের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন; নানারকম গাছগাছড়া ব্যবহার করে অসুখবিসুখের চিকিৎসার প্রবর্তনও এঁরই সৃষ্টি। শেন্-নুং-এর পর সম্রাট হুয়াং-টি বা "পীত সম্রাট" নতুন নতুন অঞ্চল জয় করে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

করেছিলেন। ইনিই চীনে পঞ্জিকার প্রবর্তন করেন; এবং ঘরবাড়ি ও শহর তৈরির সূত্রপাত করেন। এঁর পত্নীই প্রথম চীনে রেশম-বোনার প্রচলন করেছিলেন বলে মনে হয়। এর পর প্রাচীন চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত তিনজন সম্রাট ইয়াও, শুন্ এবং য়ু-র পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁধ বেঁধে ও খাল কেটে সম্রাট য়ু হোয়াং-হো নদীর প্রচণ্ড বন্যার কবল থেকে দেশকে রক্ষা করেন। চাষবাসের কাজে সুপরিকল্পিত সেচব্যবস্থার সূত্রপাতও তিনিই করেছিলেন। সম্রাট য়ু-ই চীনদেশের প্রথম রাজবংশ শিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজবংশ প্রায় পাঁচশো বছর ধরে টিঁকে ছিলো। এই রাজবংশেরই অত্যাচারী শেষ রাজাকে নিহত করে টাং নামে একজন রাজা শাং রাজবংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আগেই বলেছি যে পৌরাণিক উপাখ্যানে এই সমস্ত রাজা-রাজাড়াদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া গেলেও, প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়ে এখনো পর্যন্ত এই সমস্ত ঘটনাবলীর কোনো যাচাই হয় নি। এদের সন-তারিখ সম্বন্ধেও সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এই সমস্ত ঘটনাবলীর সময়কাল যে শাং রাজবংশের আগে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০—মোটামুটি এই সময়টাকেই পৌরাণিক এই যুগের সময়কাল বলে ধরা যায়।

শাং রাজবংশ

শাং রাজবংশের আমলের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো ব্রোঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার। ধর্মকর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিলাসব্যসনের যাবতীয় উপকরণ তৈরী হতো ব্রোঞ্জ দিয়ে। অবশ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানারকম দরকারী হাতিয়ার তৈরীর বিষয়ে তেমন ব্যাপকভাবে ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হতো কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; কারণ

ব্রোঞ্জের তৈরী এই সমস্ত হাতিয়ার খুব অল্পই পাওয়া গেছে। ব্রোঞ্জের আরেকটি বিশিষ্ট ব্যবহার ছিলো চাকা তৈরির ব্যাপারে—এ সময়ে চাকাগাড়ির খুবই প্রচলন হয়েছিলো। শাং রাজবংশের আমলেই চীনে খাবার হিসাবে গমের চাষ শুরু হয়। গমের জন্মভূমি মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকেই খুব সম্ভব গম চাষের পদ্ধতি চীনে ছড়িয়ে পড়েছিলো। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে শাং আমলের চীনের অধিবাসীরা পুরোপুরি কৃষিনির্ভর ছিলো; একমাত্র শুয়োর ছাড়া পশুপালনের তেমন কোনো প্রত্যক্ষ নজির চোখে পড়ে না। স্মরণাতীত কাল থেকে চীনের মানুষের খাবারের মধ্যে দুধ এবং দুধের তৈরী খাবারের অনুপস্থিতি থেকে কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্তও করেন যে চীনের মানুষকে সমাজের অগ্রগতির পথে পশুপালনের অবস্থায় কখনো অতিবাহিত করতে হয়নি।

শাং আমলে চীনের মানুষের সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা পূর্বাভাস বেশ সুস্পষ্টভাবেই দেখা দিয়েছিলো। পরের যুগে পুরোপুরি ওই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাই হয়ে উঠেছিলো সমগ্র চীনের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। শাং রাজবংশের রাজ্যসীমানার আয়তন তেমন বিরাট ছিলো না; রাজধানী আনিয়াংকে কেন্দ্র করে চারদিকে একশো দুশো মাইল পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলেই এদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসাবে কড়ি ব্যবহার করা হতো।

শাং রাজবংশের শেষ দিকের রাজাদের জীবন খুব সম্ভব বিলাস-ব্যসনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো; আর এই ক্রমবর্ধমান বিলাস-ব্যসনের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রচণ্ড অত্যাচার উৎপীড়নও শুরু হয়েছিলো। কারণ এই বংশের শেষ রাজা চু-শিন্-এর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চু-এর সামন্তাধিপতি উ-ওয়াং খ্রীষ্টপূর্ব ১০৩০ সালে চু-শিন্-কে হত্যা করে শাং রাজবংশের অবসান ঘটান। এর পর

প্রায় নশো বছর ধরে চীনের ইতিহাসে চু-রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো। উ-ওয়াং-ই ছিলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম রাজা।

চু-রাজবংশ

চু-রাজবংশের আদি উৎপত্তির বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। তবে এরা যে পশ্চিমদিক থেকেই চীনে এসেছিলো সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এরা শাং রাজবংশের চেয়ে অনুন্নত ছিলো, এবং সম্ভবত চাষবাস শিখে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার আগে পর্যন্ত এরা ছিলো যাযাবর পশুপালক। অবশ্য স্থায়ীভাবে থিতিয়ে বসবার পর এরা চীনের কৃষিনির্ভর সভ্যতার সমস্ত অবদানগুলোকে গ্রহণ করে খুব তাড়াতাড়ি সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছিলো। এবং এর ফলে এদের শক্তি সামর্থ ক্রমশ এমন তীব্রভাবে বেড়ে গিয়েছিলো যে শেষ পর্যন্ত শাং রাজবংশের অবসান ঘটিয়ে এরা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলো।

চু-রাজবংশ যে শুধু শাং অঞ্চলের উপরেই নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলো তাই নয়, নতুন নতুন বিজয়-অভিযান চালিয়ে এরা রীতিমতো একটি সাম্রাজ্যও গড়ে তুলেছিলো। হোয়াং-হো নদীর গোটা উপত্যকা, এবং হোয়াং-হো ও হুয়াই নদীর মধ্যেকার গোটা অঞ্চলটিই এরা এদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলো। অর্থাৎ পুবদিকে সমুদ্র পর্যন্ত এবং দক্ষিণে ইয়াংসি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো এই সাম্রাজ্য।

শাং রাজবংশের আমলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সূচনা হয়েছিলো, চু-রাজবংশের আমলে সেই ব্যবস্থাটিকেই আরো পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পুরো ওই সাম্রাজ্যটি কয়েকটি

সামন্তে বিভক্ত করা হয়েছিলো। রাজবংশের আত্মীয়স্বজনরাই এই সামন্তগুলোর অধিপতি ছিলেন। শুরুর দিকে এই সমস্ত সামন্তের উপর কেন্দ্রীয় শাসন ও কর্তৃত্ব ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো : কারণ মাঝে মাঝে এই সমস্ত সামন্তাধিপতিদের রাজধানীতে আসতে হতো, এবং সেখানে নির্দিষ্ট একটি সময় অতিবাহিত করতে হতো। সামন্তাধিপতিদের কাছ থেকে খাজনার বিনিময়ে জমি নিয়ে চাষীরা চাষবাসের কাজ করতো। সামন্তাধিপতির খাস জমিতে বেগার খাটুনির রেওয়াজও বিশেষভাবে প্রচলিত ছিলো।

শুরুর দিকে চু-রাজবংশের রাজারা শক্তিশালী ছিলেন বলে গোটা এই সাম্রাজ্যের উপর কঠোরভাবে কেন্দ্রীয় শাসন চালানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো ; কিন্তু পরের দিকে দুর্বল এবং অক্ষম রাজাদের আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্তাধিপতিরা ক্রমশই প্রায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিলো। এই সময়ে দুর্ধর্ষ বর্বর জাতিদের আক্রমণেও চু-রাজবংশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭১ সালে চু-সম্রাট উ এইকরম একজন শক্তিশালী সামন্তাধিপতির হাতে নিহত হন। অবশ্য এর ফলে চু-রাজবংশের একেবারে অবসান ঘটে নি বটে, কিন্তু এর পর চীনদেশের প্রায় চারশো বছরের ইতিহাসই হলো এই সমস্ত সামন্তাধিপতিদের পরস্পরের মধ্যে একটানা যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস। খ্রীষ্টপূর্ব ২২১ সালে চিন্ রাজবংশের আমলেই আবার সমগ্র চীনদেশ ঐক্যবদ্ধ সুসংগঠিত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছিলো।

উজ্জ্বলতম যুগ

চু-রাজবংশের আমল চীনের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বলতম যুগ। এই রাজবংশের আমলেই চীনে শিল্প ও সাহিত্যে, ভাস্কর্য ও ললিতকলায়,

ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় যে নিদারুণ অগ্রগতি হয়েছিলো, সমগ্র চীনের ইতিহাসেই তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুত, এই যুগে চীনের চিন্তাজগতে যে একটি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিলো, হাজার হাজার বছর পরে এখনো পর্যন্ত সেই চিন্তাধারাই চীনের মানুষের জীবনকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে। এই যুগেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে কনফুসিয়াস্, লাও-সে, মো-টি, মেন্‌সিয়াস্—প্রভৃতি চীনের দিকপাল চিন্তানায়করা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা পরে বিস্তারিতভাবে এঁদের জীবন ও ধ্যানধারণা এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

চু-রাজবংশের আমলে চীনের ইতিহাসে আরেকটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিলো। এই যুগেই চীনে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিলো। কোন সময়ে লোহার ব্যবহার প্রথম চালু হয়েছিলো, তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতেই চীনে লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিলো ; কিন্তু বেশির ভাগ পণ্ডিতের মত হলো যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই চীনে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিলো ; কারণ খ্রীঃ পূঃ ৫২৩ সালেই প্রথম লোহা ব্যবহারের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে চু-রাজবংশের মাঝামাঝি সময়েই চীনে প্রথম লোহার ব্যবহার চালু হয়েছিলো, এবং দেখতে দেখতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর ব্যবহার সমগ্র চীনে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। লোহার ব্যবহার প্রাচীন চীনের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ওলটপালটের সৃষ্টি করেছিলো।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

প্রথম খণ্ডের উপসংহার

ঠিক কী ভাবে, ঠিক কতোদিন আগে, পৃথিবীর জন্ম হয়েছিলো? এ বিষয়ে আজো গবেষণার অবসান হয় নি। কিন্তু গবেষণা হয়েছে। তাই আজ আর আমাদের জ্ঞানের অভাবকে পৌরাণিক কল্পনা দিয়ে পূরণ করতে হয় না। আমাদের ধারণা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে আসছে—আগামীকালের বিজ্ঞান আরো নির্ভুল আরো নিশ্চিত জ্ঞানের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ঠিক কী ভাবে, কতোদিন আগে পৃথিবীর বুকে প্রাণের প্রথম স্পন্দন জেগেছিলো? কী ভাবে, কতো পরিবর্তন উত্তীর্ণ হয়ে সেই আদিম জীববিন্দু থেকে আজকের এতো বিচিত্র উদ্ভিদ আর বিচিত্র প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে? এই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা আজ আর অস্পষ্ট নয়, যদিও আগামীকাল আমরা এগুলিরই আরো নিশ্চিত আরো স্পষ্ট উত্তরের দিকে এগুতে পারবো। কেননা গবেষণা হয়েছে, গবেষণা চলছে, গবেষণার এখনো অবসান হয় নি।

সময়ের দিক থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাণের ইতিহাসটুকু বোঝবার চেষ্টা করা যাক। এমন একটা ঘড়ির কথা কল্পনা করবো যার বড়ো কাঁটাটা ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার বছরে একটি করে মিনিটের ঘর পার হয় আর যার ছোটো কাঁটাটা ১০ কোটি বছরে একটি করে ঘণ্টার ঘর পার হয়। পৃথিবীর বুকে প্রাণের ইতিহাসের দিক থেকে এই ঘড়িতে এখন বারোটা বেজেছে—তার

ড়িতে

বির্ভাব

মিনিটে

সরীসৃপের। ওই ঘড়িতে যখন ১০টা বেজে ১০ মিনিট পৃথিবীতে তখন অতিকায় ডাইনোসারদের যুগ চলেছে! ১০টা বেজে ১৫ মিনিটের সময় স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব, পাখিদের আবির্ভাব ১০টা ৪০ মিনিটে।

আর মানুষ? ওই ঘড়ির হিসেব অনুসারে প্রায়-আধুনিক মানুষের আবির্ভাব মাত্র সেকেণ্ড নয়েক আগেকার ঘটনা যদিও কিনা প্রায় মিনিট দেড়েক আগে থাকতেই পৃথিবীতে মানুষের মতো একরকমের জীব দেখা দিয়েছে। (অর্থাৎ কিনা, পৃথিবীতে মানুষ ধরনের জীবের আবির্ভাব হয়েছে আনুমানিক পঁচিশ লক্ষ বছর আগে; প্রায়-আধুনিক মানুষের আবির্ভাব হয়েছে আড়াই লক্ষ বছর আগে। অবশ্যই এ-হিসেব নিয়েও বিভিন্ন মত আছে, সে-সব তর্কের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না)।

এই ঘড়ির কল্পনাটিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই ভুল করবো। কেননা, বছরের হিসেবগুলো এখানে অনেকাংশেই আনুমানিক। আর তাছাড়া এ-হলো এমনই সুদীর্ঘ যুগের কথা যে তার হিসেব দেবার সময় এমনকি দু-চার কোটি বছরের এদিক-ওদিক হলেও খুব কিছু যায়-আসে না। তাছাড়া এ-সব সময়ের হিসেব নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে।

কিন্তু একদিক থেকে এই ঘড়ির কল্পনাটি ভারি মূল্যবান। কেননা এর থেকে আন্দাজ করা যায় পৃথিবীর পুরো ইতিহাসের তুলনায় মানুষের আবির্ভাব কতো সাম্প্রতিক ঘটনা!

অথচ, এই মানুষের আবির্ভাব থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ হয়েছে আদিপর্ব, শুরু হয়েছে •তুন পর্ব। কেননা এর পর থেকে পৃথিবীর ইতিহাস বলতে প্রধানতই মানুষের কথা। তার কারণ কী?

বাকি সমস্ত প্রাণীর মতোই মানুষও অবশ্যই পৃথিবীরই অংশমাত্র, পৃথিবীরই কয়েক রকম উপাদান দিয়ে গড়া। তবুও, পৃথিবীর উপাদান দিয়ে গড়া হলেও, এই মানুষই আবার যুগের পর যুগ ধরে নিত্য নতুন ভাবে পৃথিবীকে গড়ে তুলেছে। আর ঠিক এই কারণেই আমাদের ওই কাল্পনিক ঘড়িটির হিসেব অনুসারে গত ৯ সেকেণ্ডের কাহিনী যতো নিটোল ও বিচিত্র, তার তুলনায় অতীতের অসম্ভব দীর্ঘ যুগটাও যেন সত্যিই তুচ্ছ!

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

মুখবন্ধে বলেছেন—

"পৃথিবীর ইতিহাস" মানব-সভ্যতার ইতিহাস। সে-ইতিহাস এমন সমগ্রতায় অথচ এত সংক্ষেপে এবং সহজ সরলতায় বাংলা ভাষায় বলবার চেষ্টা এর আগে কখনও হয় নি। টুকরো টুকরো ভাবে হয়েছে, এবং তা উনিশ শতকে, যখন বিজ্ঞান আজকের মত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি; সমাজ-পরিবর্তনের ইতিহাস এতটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে দেবীপ্রসাদ ও রমাকৃষ্ণ পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস দেখছেন। এ-দেখা এবং উনিশ শতকের দেখায় পার্থক্য গভীর। সে-পার্থক্য কত গভীর তা দুর্গাদাস লাহিড়ী মশায়ের "পৃথিবীর ইতিহাস" পাশাপাশি রাখলেই ধরা পড়বে। বলবার ধরনের, ভাষা ব্যবহারের পার্থক্যটাও তাহলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই দুই গ্রন্থের মাঝখানে একটি যুগ বিস্তৃত।

এই গ্রন্থ আমাদের যুগের পরিচয় বহন করছে, এবং সে-পরিচয় বুদ্ধির মুক্তির সহায়ক।